pathfinder

ওয়েস্টার্ন

স্বর্ণতৃষা
কুহকিনী

দুটি বই একত্রে

রওশন জামিল



সেবা প্রকাশনী

ANIK

ওয়েস্টার্ন
দুটি বই একত্রে
রওশন জামিল

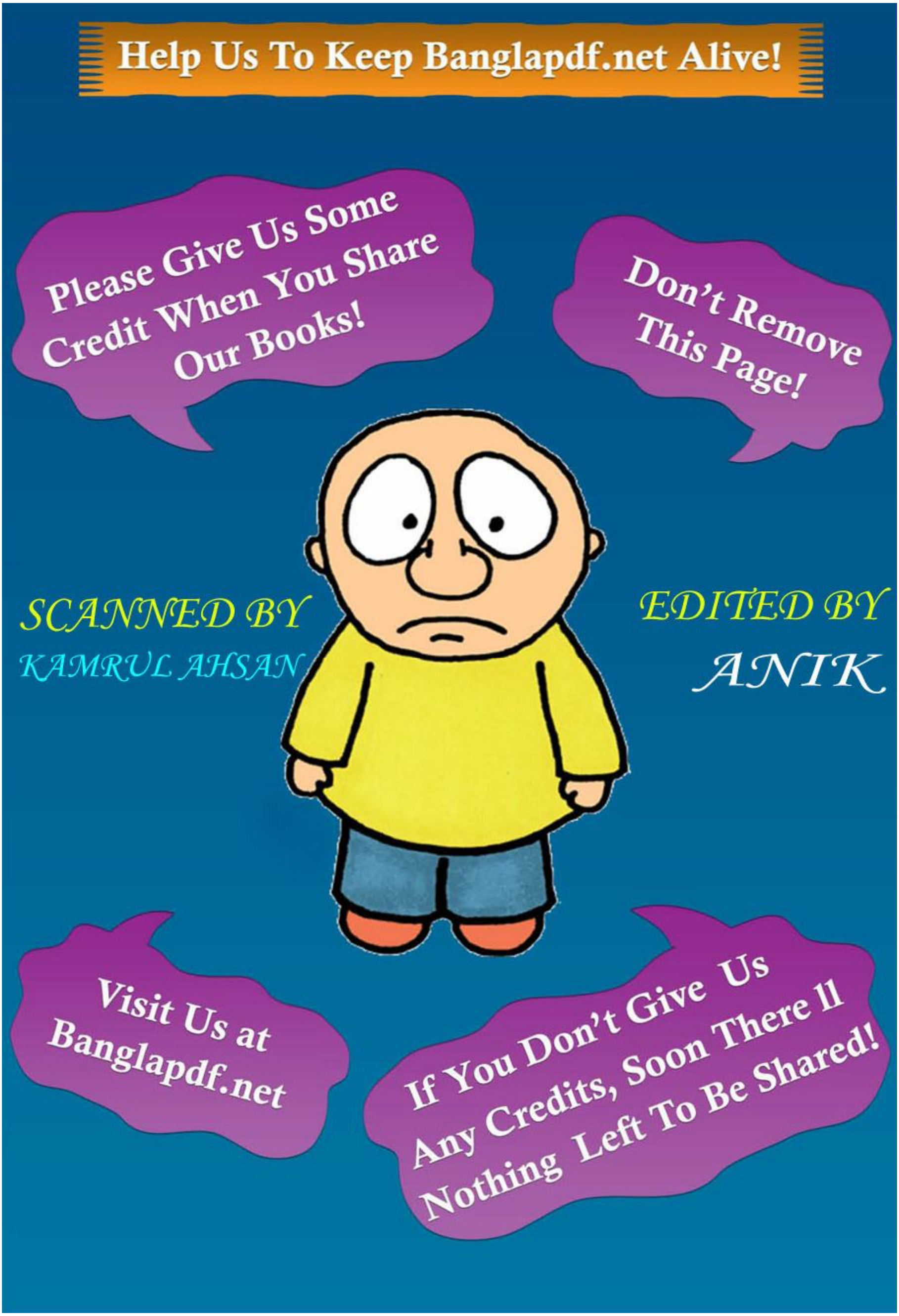
স্বর্ণতৃষা

বাড়ি ফিরছিল ওরিন ওসমান, হঠাৎ পেয়ে গেল সোনার খনি। কিন্তু সোনার গন্ধে হন্যে হয়ে উঠেছে একদল হায়েনা। ওদিকে ভ্রাতৃহত্যার বদলা নিতে ছুটে আসছে রক্তপিপাসু আরেক দল।

কুহকিনী

তিরিশ পাউন্ড সোনা নিয়ে ওরিন ওসমান যাচ্ছিল লস এঞ্জেলেসে। কলর‍্যাডো নদীর ফেরিতে কৃষ্ণ-নয়না এক মেয়ে সাহায্য চাইল ওর কাছে। রাজি হয়ে গেল ওরিন এবং বিপদে পড়ল। একদল সশস্ত্র আউট-ল তাড়া করল ওদের। আমেরিকার ভয়ঙ্কর মরুভূমি মোজাভে ক্রসিংয়ে মুখোমুখি হলো ওরা।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED BY
KAMRUL AHSAN
EDITED BY
ANIK
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়েস্টার্ন

স্বর্ণতৃষা

কুহকিনী

রওশন জামিল

স্বর্ণতৃষা

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৬

এক

এমন নয় যে লোকটাকে সাবধান করা হয়নি; হয়েছিল এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না কোনও।

'মিস্টার,' ওকে বলেছিলাম, 'চুরি করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনছ কেন?'

কিন্তু সংসারে থাকে এমন বেয়াড়া ধরনের কিছু লোক। একটা ভুলে তাদের শিক্ষা হয় না – দুটো করা চাই। ওয়েস বিগলো সেই জাতের লোক। ফলে যা হবার তাই হলো, শহরের পশ্চিমে একটা গোরস্থান আছে, সেখানে ওকে কবর দিল ওরা। এই শহরে যারা গান ফাইটে নিহত হয়, তাদের ওখানেই কবর দেবার রেওয়াজ।

আর ওই এক ঘটনাতেই আমার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। মন্দ লোক হিসেবে ওরিন ওসমানকে এখন উভালদে শহরের সবাই চেনে। মন্দ-লোক, অর্থাৎ যাদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালে বিপদ হয়। ন্যায়ের পক্ষ নেয়ায় অমন অনেক ভাল ভাল লোক 'মন্দ' বলে পরিচিত। তবে ওই খেতাবের জন্যে আমি একটুও লালায়িত ছিলাম না, তাই ঠিক করলাম চলে যাব উভালদে ছেড়ে।

আসলে বিগলো ছিল গোঁয়ার। আমার লিকলিকে স্বাস্থ্য দেখে ভেবেছিল তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু ও কীভাবে জানবে, অস্ত্রচালনায় আমার হাতেখড়ি শৈশবে। আমাদের বংশে এটাই রীতি – শরীরে এর ভার সইবার শক্তিটুকু হলেই রাইফেল দেয়া হয়। আমার জীবনের পয়লা শিকার একটা কুগার। আমার বয়েস তখন পুরো নবছরও পোরেনি। কুগারটা আমাদের শুয়োরের খোঁয়াড়ে হানা দিয়েছিল। তেরোতে মারি একজন হিগিনসকে। বাবার দিকে সে রাইফেল তাক করেছিল। হিগিনসদের সাথে আমাদের তখন ঘোর লড়াই চলছে।

আমরা মোট পাঁচ ভাই। আমি-ই সবার বড়। এরপর অ্যানজেল, ও'নীল, জো, এবং সবার ছোট বব। ছেলেবেলায় আমাদের যত আবদার ছিল বাবার কাছে। সব ধরনের অস্ত্রচালনা শিখিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছেই কর্নিশ-স্টাইল কুস্তি শিখেছি। বাবা এক-আধটু মুষ্ঠিযুদ্ধ জানতেন, তাও তালিম দিয়েছিলেন আমাদের। এত যে আবদার, তবু সময়ে সময়ে ভীষণ কঠোর হতেন বাবা। গোলাবারুদের অপচয় একদম পছন্দ করতেন না। শিকারে গিয়ে কোনও গুলি ফসকালে আর রক্ষে ছিল না, কৈফিয়ত দিতে হত কেন ফসকাল।

অস্ত্র নিয়ে তামাশা সইতে পারতেন না তিনি। যদি কখনও দেখতেন, আমরা কোনও অস্ত্র নিয়ে খেলা করছি, শরীরের হাড়মাংস সব একজায়গায়

করতেন। তবে আমাদের কারও কপালেই তেমন দুর্ভোগ হয়নি। বাবা বলতেন 'অস্ত্র খেলার জিনিস নয়। তুই একে সম্মান করলে এও রক্ষা করবে তোকে কোনও কারণ ছাড়া কক্ষনো হাত দিবি না অস্ত্রে।'

আমি বরাবর একলাটি। নতুন নতুন জায়গা দেখতে আমার ভাল লাগে। কৈশোরে ন্যাটশেষ ট্রেস ধরে চলে গিয়েছিলাম নিউ অরলিন্সে। এর কিছু দিন পর শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। এবং আমি তাতে যোগ দেই।

ইউনিয়ন আর্মির হয়ে আমাকে লড়তে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিলেন জেনারেল গ্র্যান্ট। হবারই কথা। আমার বাড়ি টেনেসি। কনফেডারেটদের পক্ষে ওই রাজ্যটিও যোগ দিয়েছিল। অন্যগুলো: অ্যালাবামা, আরকান-স, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, লুইসিয়ানা, মিসিসিপি, নর্থ ক্যারোলাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা, টেক্সাস আর ভার্জিনিয়া।

জেনারেলকে কী জবাব দিয়েছিলাম, আমার তা আজও মনে আছে। 'এই দেশ গড়তে গিয়ে আমার বাপ-দাদারা জান পানি করেছেন – আমি সেটা নষ্ট হতে দিতে পারি না, জেনারেল।'

কথাটা এখনও সমান সত্য। দেশের ডাকে ওসমান পরিবারের প্রতিটা লোক লড়বে। প্রয়োজনে মরতেও কুণ্ঠিত হবে না। আমরা এমনিতে নিরীহ, কিন্তু কেউ সেধে লাগতে এলে পিছিয়ে যাই না।

উভালদের বাইরে এক কাউ আউটফিটে যোগ দিলাম আমি। টেক্সাসের উত্তর থেকে গরুর পাল নিয়ে যাত্রা করলাম মন্ট্যানার চারণভূমির দিকে। আমরা যাচ্ছি বোযম্যান ট্রেইল ধরে, প্রতিপদে শঙ্কার হাতছানি।

বিপদকে জয় করে আমি আনন্দ পাই। তবু এই ভবঘুরে জীবন আর ভাল লাগছিল না, মাথা গোঁজবার মত ঠাঁই খুঁজছিলাম একটা। কাউ আউটফিটে যোগ দেবার পেছনে এটাও একটা কারণ: এখান থেকে যে-আয় হবে, ইচ্ছে আছে তা দিয়ে একটা কিছু গড়ব নিজের জন্যে।

ক্রেযি উওম্যান পর্বতের উত্তরে তিনজন লোক এল আমাদের ক্যাম্পে গরু কিনতে। বস বেচতে রাজি হলেন না, তবু রয়ে গেল ওরা। আমার নাম শুনে একজন কাছে এল।

'বিগলোকে তুমি মেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওর দুভাই বদলা নিতে এসেছে। মন্ট্যানায় আছে – তুমি যেও না,' পরামর্শ দিল সে।

'আমি কারও সঙ্গে লাগতে চাই না,' বললাম, 'তবে বাধ্য করলে–'

'আচ্ছা, মোরার পিস্তলবাজ, ও'নীল ওসমান তোমার কেউ হয়?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন।

'ভাই। ও'নীল পিস্তলবাজ? কই, জানতাম না তো?'

'তা হলে আর বলছি কী,' জবাব দিল প্রশ্নকর্তা। 'ওখানে ওর দারুণ দাপট –

সব খুনে-বদমাশ তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে।'

'হ্যাঁ, পিস্তলে অবশ্যি নীলের হাত বরাবরই পাকা – আমাকেও হারিয়েছে দু-একবার।'

গ্যালাটিন উপত্যকায় পৌঁছে আমরা মন্ট্যানার ঘেসো জমিতে গরু ছেড়ে দিলাম। আমাদের মালিকের নাম নেলসন ফস্টার। শহর থেকে ডাক নিয়ে ফিরলেন তিনি। ওতে আমারও একটা চিঠি ছিল, জীবনে ওই প্রথম পেলাম।

যুদ্ধের সময় দেখতাম লোকে চিঠি পাচ্ছে, লিখছে। আমার কাছে কখনও আসত না বলে ব্যথা বাজত বুকে। তাই যখন ডাকের তলব পড়ত, বাবুর্চির সঙ্গে গিয়ে গল্প জুড়তাম। তিনকুলে কেউ ছিল না লোকটার, টেক্সাসের অদূরে এক কিওয়া ওঅর পার্টির হাতে নিহত হয়েছিল।

ওই চিঠিটা পেয়ে আমার সব কষ্ট যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল। খামের ভেতর থেকে পুরু কাগজ বেরোল একখানা। নাকের কাছে তুলে কাগজের গন্ধ শুঁকলাম। ভাঁজ খুলতেই আমার চোখ স্থির হয়ে গেল। জড়ানো হস্তাক্ষর। মনে মনে বিষম খেলাম – ছাপার অক্ষর যাও-বা পড়তে জানি, হাতের লেখা কিছুই বুঝি না।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন মি. ফস্টার। আমার অসুবিধে বোধ হয় বুঝতে পারলেন তিনি। 'দাও, পড়ে দিচ্ছি,' বললেন।

রাজ্যের লজ্জা ঘিরে ধরল আমায়। এত বড় হয়েছি, সাতাশ-আটাশ বয়েস, অথচ পড়তে জানি না। ইন্ডিয়ান ওঅর ট্রেইল আমার চোখ সহজে চিনতে পারে, কিন্তু পড়াশোনায় বলতে গেলে একরকম আনাড়ি।

অ্যানজেল আর ও'নীল প্রত্যেকেই নিজের বাথান করেছে, চিঠি পড়ে মি. ফস্টার জানালেন। মা এখন মোরায়, নিউ মেক্সিকোতে। এক বনেদি স্প্যানিশ পরিবারে বিয়ে করেছে নীল। অ্যানজেল রাজনীতি করছে – সমাজে ওর যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

আমার নিজের বলতে কী আছে? একটা জীর্ণ স্যাডল, চারটে পিস্তল, একটা উইনচেস্টার রাইফেল আর আমার পরনের এই কাপড়। হ্যাঁ, আরও একখানা জিনিস আছে বটে – আরকান-স টুথপীক। এক ধরনের ছুরি, হাতাহাতি থেকে মাংস কাটা সবই চলে।

'তোমার ভাইয়েরা মনে হচ্ছে বেশ উন্নতি করেছে,' বসের কথায় আমার চমক ভাঙল। 'এখন তোমার লেখাপড়া শেখা উচিত, ওরিন – আমার বিশ্বাস, তুমি অনেক বড় হবে।'

ওই চিঠি পেয়ে বাড়ির জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। আমি ঘোড়া কিনতে বেরোলাম। এক ইন্ডিয়ানের সাথে দেখা হলো পথে। দুটো অ্যাপালুসা ঘোড়া আছে ওর কাছে। আমার একটা .৩৬ ক্যালিবার পিস্তল পেলে ঘোড়াগুলো বেচে দেবে। শুরু হলো দরদাম। আমরা, টেনেসির লোকেরা, সেই ছেলে বয়েস থেকে ঘোড়া বেচাকেনা করে আসছি। একজন রেড ইন্ডিয়ানের সাধ্য কী আমাকে ঠকায়।

দীর্ঘ একহারা গড়ন লোকটার। বিষাদভরা চেহারা। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় ওর শিকারী কুকুরের মত একজোড়া চোখ। মর্মভেদী দৃষ্টি, মনে হয় যেন অন্তস্তল অবধি দেখে নিচ্ছে। ওই চোখই বলে দেয় এ-লোক, আর যাই হোক, কাউকে ঠকাবে না। ওকে মনে ধরল আমার, ইচ্ছে হলো সঙ্গে যা কিছু আছে বিলিয়ে দেই।

খেতে বসলাম ওকে নিয়ে। নানান কথা হলো আমাদের; পথঘাটের অবস্থা, ইন্ডিয়ান সমাজের দুর্গতি, আকাল – কিন্তু ভুলেও বিক্রির প্রসঙ্গ তুললাম না। মা বলতেন, খাওয়ার সময় কারও মনে আঘাত দিবি না, গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।

সন্দেহ নেই, বেচারা বিপাকে পড়েই অমন সুন্দর ঘোড়াদুটো বেচতে চাইছে। ও-রকম জিনিস হাতছাড়া হলে কার না মন খারাপ হয়। আহার-শেষে আপসরফায় এলাম আমরা। একটা পিস্তল, দশটা কার্তুজ, একটা পুরোনো কম্বল আর এক বোতল হুইস্কির বিনিময়ে দুটো অ্যাপালুসা কিনে নিলাম।

ইন্ডিয়ানের চাহিদা ছিল মাত্র একটা পিস্তল, এত কিছু দেবার পরও আমার মনে হলো জিত আমারই হয়েছে।

এরপর আমি বাড়ির পথ ধরলাম। মাকে একটিবার দেখবার জন্যে আনচান করছে মন। এই পশ্চিমে, মেয়েছেলের ধূমপান অনেকেই পছন্দ করে না। তবু মায়ের মুখের সেই পুরোনো পাইপ, তামাকের কটু গন্ধ এ-সবের জন্যে হু-হু করে উঠছে আমার অন্তর। নড়বড়ে দোলনা চেয়ারটার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ কত দিন শুনি না! বাড়ের বয়েসে ওই শব্দ ছিল আমাদের কাছে পরম নির্ভরতার প্রতীক। বুঝতাম, বাড়িতে আছি।

মা যেন আমাদের শতহাতে আগলাতেন। তাঁর ভাঁড়ার ছিল যেন সাক্ষাৎ প্রকৃতির ঝাঁপি। এত যে খরা, দুর্ভিক্ষ – খাওয়ার টেবিলে বসলে সেটা বোঝবার উপায় ছিল না। কী এক অদ্ভুত কায়দায় মুখরোচক সব খাবার আমাদের সামনে তুলে ধরতেন মা।

নিউ মেক্সিকোর উদ্দেশে রওনা হলাম আমি। মন্ট্যানা থেকে ঘোড়ার পিঠে নিউ মেক্সিকো বেশ দূরপথ। তাই বলে দমলাম না। বাসায় সকলের সঙ্গে দেখা করে আবার বেরোব। সাতাশ প্লাস এমন কিছু বয়েস নয় – চেষ্টা করলে এখনও গড়তে পারব নিজের ভবিষ্যৎ।

শান্ত মনে যাচ্ছিলাম আমি, সোনা খোঁজা বা কোনও ঝঞ্ঝাটে জড়াবার অভিলাষ আমার একটুও ছিল না। আমি জানি, এরা জোড় বেঁধে থাকে। সোনা দুষ্প্রাপ্য বস্তু, কেউ পেলে সেটা নিজের কাছে রাখতে গিয়ে তাকে বহু ঝামেলা পোয়াতে হয়।

বুনো রুক্ষ ট্রেইলে এগোচ্ছি। চারিদিকে যোজনবিস্তৃত মরুভূমি, মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপ আর জংলা ঘাস। ইন্ডিয়ান ট্র্যাক চোখে পড়ছে, কিন্তু সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছি।

আর্মিতে থাকতেই আমার কানে এসেছিল, ভীষণ দুর্দিন যাচ্ছে

ইন্ডিয়ানদের। ওদের কেউ কেউ, যেমন চেরোকীরা, ব্যবসায় নেমেও সুবিধে করতে পারছে না। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত, লড়াইয়ের সুযোগ কিংবা ঘোড়া চুরির মওকা পেলে ওরা আজও সেটা হাতছাড়া করবে না – দরকার হলে কয়েক ক্রোশ পথ অনায়াসে পাড়ি দেবে।

গৃহযুদ্ধের পরপর ডাকোটায় স্যু আর শাইয়েন গোত্রের বিরুদ্ধে লড়েছি আমি। এটা মিনেসোটায় লিটল ক্রো গণহত্যার পরের ঘটনা। তখন কয়েকবার ইন্ডিয়ানদের মোকাবেলা করেছিলাম। ওদেরকে আমি সমীহ করি।

শামুকের গতিতে এগোচ্ছি। ভোরের বাতাসে হিমের পরশ, পাহাড়ে তুষারপাতের আভাস দিচ্ছে। তবে দিনের বেলাটা মোটামুটি ওম জড়ানো। রাতে আকাশ চলে যায় নক্ষত্রের দখলে।

দুর্গম পাহাড়ী ট্রেইলে চলার আমেজই আলাদা। কদিনেই বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠেছে আমার শরীর। রকি মাউন্টিনস পেরিয়ে, টিটন্স আর সাউথ পাসের দক্ষিণ হয়ে ব্রাউন্স হোলে পৌঁছুলাম।

দূর্বা-মোড়া ঢাল। চারপাশে অ্যাসপেনের সারি। ঝরনার ধারে ক্যাম্প করলাম আমি। ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না – সামনেই বিপদ।

দুই

পরদিন সকালে স্যাডলে চাপতেই ভৌতিক ট্রেইলটা চোখে পড়ল। অদূরে একটা লাল বেলে পাথরের দেয়াল। তাতে অসংখ্য ফাটল। ওরই একটায় রুপোলি স্ফটিক বসানো।

বিপদসঙ্কুল এলাকায় যাদের চলাফেরা, সব সময় তারা সতর্ক থাকে। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে সন্দিহান হয়ে ওঠে। নুয়ে-পড়া ঘাস, ভাঙা ডাল, ঝরনার কাদা-ঘোলা পানি অনায়াসে তার নজরে আসে।

প্রকৃতির একটা সহজ স্বাভাবিক আটপৌরে ভঙ্গি আছে। জন্তু-জানোয়ার নিজেদের স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নেয় এর সাথে। তারা বাসা বানায়, কিন্তু আশপাশের পরিবেশ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বীবর একমাত্র ব্যতিক্রম। তার বাসা জলে, সে গর্ত খুঁড়ে বাঁধ দেয়। এ ছাড়া আর কোনওরকম বিশৃঙ্খলা দেখা গেলে ধরে নেয়া চলে, ওটা কোনও মানুষের কাজ।

এই বিজন প্রান্তে স্ফটিকটা যে আপনাআপনি ওখানে উঠে যায়নি তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। নিশ্চয় বসিয়ে দিয়েছে কেউ। অথচ কাছেপিঠে লোকালয় তো দূরের কথা, গেল কদিনে একটা মানুষ চোখে পড়েনি আমার। সাউথ পাস সিটি বহুদূরে, ঘোড়ার পিঠে উত্তরে হপ্তাখানেকের পথ।

পাথরটা হাতে নিয়ে পরখ করে, আবার আগের জায়গায় রেখে দিলাম।

চারপাশে একটা গোল দাগ – অনেকদিন একভাবে থাকার ফল। এ-রকম পাথরের সাহায্যে পথের হদিস দেয়া হয়, আমি জানি। ফিল্ড গ্লাস লাগালাম চোখে। বেশ খানিকটা দূরে আরেকটা স্ফটিক।

কৌতূহল চাপতে পারলাম না আর, স্ফটিক নির্দেশিত ট্রেইল ধরে এগিয়ে গেলাম। কাজটা যারই হোক, লোকটা বুদ্ধিমান। রাতের আঁধারেও এই ট্রেইল চেনা যাবে – সাদা স্ফটিকগুলোই বাতলে দেবে।

চড়াই বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে এলাম আমি। আরেকটু গেলেই পাহাড়ের শেষ। বহুদূর অবধি দেখা যায় এখান থেকে। কোনও মানুষের ট্র্যাক বা পুরনো ক্যাম্পফায়ারের চিহ্ন চোখে পড়ল না।

ঘুরে সঙ্কীর্ণ একটা গিরিপথে ঢুকলাম। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। গোধূলির লালা আভায় দাঁত বের করে হাসছে ক্যানিয়নের ন্যাড়া দেয়াল। এখানে-সেখানে তুষার জমাট বেঁধে আছে।

প্রায় হাজার ফুট নীচে জঙ্গল। আসন্ন রাতের বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। থমথমে পরিবেশ। অ্যাপালুসার খুরের শব্দ আর জিনের মৃদু খসখসই কেবল একটুখানি আভাস দিচ্ছে প্রাণের। ধীর গতিতে এগাচ্ছে ঘোড়াটা, কান খাড়া।

সামনে, বাঁয়ে ছোট্ট একটা ডোবা। আধো-অন্ধকারে রুপোলি জল ভৌতিক মায়া বিস্তার করেছে। ছোট ছোট ঢেউ জেগেছে হাওয়ায়। গা ছমছম করে উঠল আমার, পাহাড়চূড়ায় এইধরনের ডোবায় অপদেবতারা বাস করে বলে শুনেছি।

ইচ্ছে করছে নিজের কপাল চাপড়াই, কোন দুঃখে এলাম এই পথে। এটা বোধ হয় প্রাচীন কোনও ট্রেইল হবে। আমার বাবা একবার ডোলোরেস নদীর ধারে কাটিয়েছিলেন কিছু কাল। সেটা এখান থেকে আরেকটু দক্ষিণে। ফাদার এসকালেনতে সান্তা ফে থেকে ক্যালিফোর্নিয়া যান মিশন খুলতে। তিনিও এ-অঞ্চল পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু এত উচ্চতায় তাঁর আসবার প্রশ্নই ওঠে না।

নেহাত দায়ে ঠেকেছিল, নইলে এমন জনমানবহীন এলাকায় বেড়াতে আসে না কেউ। নিশ্চয় কোনও অমূল্য রত্নের খোঁজ পেয়েছিল লোকটা, সোনাই হবে সম্ভবত। এতটা এসে শেষ না দেখেই চলে যেতে সায় দিচ্ছে না আমার মন। আবার সেই সঙ্গে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে, আর এগিও না।

সহসা ক্ষীণ শব্দে চমকে উঠল আমার ঘোড়া। নির্জন পথে চলতে গেলে ঘোড়ার ওপর আস্থা রাখতে হয়। মানুষের চেয়ে ওদের শ্রবণক্ষমতা প্রখর, সামান্যতম আওয়াজও কান এড়ায় না। তা ছাড়া এটা জাত অ্যাপালুসা, দুর্গম অঞ্চল পাড়ি দিতে এর জুড়ি নেই।

বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। নিবিড় বনে ঝড়ের শব্দের মতন। কাছে এগোতে আরও জোরাল হলো। বুঝতে পারলাম, ঝরনার জল গড়িয়ে পড়ছে।

আরেকটা গিরিপথে ঢুকলাম আমরা। এটা আগেরটার চেয়েও সরু। গিরিপথের এক পাশে সেই ভূতুড়ে ডোবার পানি গড়িয়ে পড়ছে। জলকণায়

আচ্ছন্ন পরিবেশ। একটা অস্পষ্ট ট্রেইল চলে গেছে ঝরনার ধার ঘেঁষে। ওই ট্রেইল যে অধিকাংশ সময় পানির তলায় থাকে সেটা বুঝতে কল্পনাশক্তি লাগে না।

সাবধানে তাকালাম নীচের দিকে। জলপ্রপাতের গর্জনে কান পাতা দুষ্কর। ওই স্বল্প আলোতেও দেখলাম, দেয়ালের গায়ে জ্বল জ্বল করছে একটা স্ফটিক। এ-বার আর কোনও ভ্রূকুটি মানল না মন, ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলাম ঢাল বেয়ে। একবার পা হড়কালে রক্ষে নেই, সোজা হাজার ফুট নীচে কঠিন পাথরের ওপর গিয়ে পড়ব। পিছু হটার পথ বন্ধ, কোনও মাসটাংয়ের পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

যত নীচে নামছি, ততই পানির ছিটায় ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ। ট্রেইলটা প্রায় মাইল তিনেক অনুসরণ করে একটা উপত্যকায় নেমে এলাম আমি। গাছপালার ঘনত্ব দেখে বুঝলাম হাজার ফুট পাড়ি দিয়েছি। সেই ঝরনাটা আমার ডানে একটা সঙ্কীর্ণ অথচ গভীর ক্যানিয়নে হারিয়ে গেছে। ক্যানিয়নের দেয়াল আগাছা আর ফার্নে পরিপূর্ণ। তবে ট্রেইলটা বাঁক নিয়েছে উপত্যকার দিকে।

এখানে উপত্যকার প্রস্থ বড়জোর বিশ গজ, দুধারে খাড়া দেয়াল। কায়দা জানা থাকলে পায়ে হেঁটে একজন মানুষের পক্ষে ওঠা সম্ভব; কিন্তু কোনও ঘোড়া দুফুটও যেতে পারবে কি না সন্দেহ। পুবদিকে, ক্যানিয়নের দেয়ালে শেষ-সূর্যের আলো সামান্য ফুটে আছে এখনও।

প্রায় দেড়শো গজ যাবার পর চওড়া হয়ে গেল উপত্যকাটা। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে মাইল তিনেক হবে। ঝরনা আছে একটা, পথে যেটার পাশ কাটিয়ে এসেছি তার সাথে এর যোগ আছে।

সচরাচর পাহাড়ী এলাকায় যেমন থাকে, তেমনি চমৎকার ঘেসো জমি। ঝরনার কিনারে সার সার অ্যাসপেন, গুটিকতক বামনাকৃতি উইলোও রয়েছে। কয়েকটা হরিণ চরছে অদূরে। মানুষের সাড়া পেয়ে তাকাল। আমার মনে হলো, এখানে আসার আরও কোনও পথ আছে, তবে সেটা ঠিক কোথায় ধরতে পারলাম না। আমি এগিয়ে যেতে টুক করে পালিয়ে গেল হরিণগুলো।

পেছনের দড়িতে টান পড়ছে, আর এগোতে চাইছে না আমার প্যাক হর্স। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া, তবু ঘামছি আমি। মন খুঁতখুঁত করছে। স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার তুলে নিলাম।

রাশ আলগা করে চলার নির্দেশ দিলাম অ্যাপালুসাকে। সন্তর্পণে, হিসেব কষে পা ফেলছে ও। ময়াল সাপের মত এখানকার সব কিছু টানছে আমাকে। ছায়ার দীর্ঘ থাবা আরও প্রসারিত হয়েছে, পাহাড়ের মাথায় ম্লান আলোয় দূরের আকাশকে দেখাচ্ছে খুব কাছের।

এ-বার গুহাটা চোখে পড়ল আমার।

আসলে ঝড়বাদলে পাথুরে দেয়াল ক্ষয়ে ওই গর্তের সৃষ্টি। তবু, কম করে হলেও আট-দশ ফুট গভীর। সামনে ঝোপঝাড়, বেশির ভাগ অ্যাসপেন,

প্রবেশমুখ ঢেকে রেখেছে।

নেমে একটা গাছের সাথে ঘোড়াদুটো বাঁধলাম আমি। পায়ে হেঁটেই যাব, ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। কোনও ট্র্যাক নেই, দীর্ঘকাল কেউ মাড়ায়নি এ-পথ। সাধারণত পাহাড়ী কেবিন যেমন হয়, এটাও তেমনি। পাথর সাজিয়ে দেয়াল তোলা হয়েছে। ভেতরটা আগুনের ধোঁয়ায় কালো, বুঝলাম ওগুলো বহুদিনের পুরনো দাগ।

একদিকের দেয়াল ধসা, ইতস্তত-ছড়ানো পাথর। শেষ-প্রান্তে একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। মসৃণ, কুঠার দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে।

বসার জন্যে ব্যবহৃত হত গুঁড়িটা, অনুমান করলাম। উলটোদিকে খাঁজ কাটা, কয়েক সারি। গুনে দেখলাম মোট একত্রিশটা সারি। দিনে একটা করে হলে অতগুলো খাঁজ কাটতে পাঁচমাস লাগবে। এ-রকম বিরান দেশে সময়টা একেবারে কম নয়।

গুহার মেঝেতে বালুর স্তর। হোঁচট খেলাম একটা কিছুর সাথে। সামান্য হাতড়াতে একটা মরচে-পড়া বর্ম বেরিয়ে পড়ল। এককালে স্প্যানিশ যোদ্ধারা ব্যবহার করত এ-ধরনের বর্ম।

স্প্যানিশদের সম্পর্কে আমার যা জ্ঞান, তার প্রায় সবটাই বাবার কাছে জেনেছি। মাঝে-মধ্যে বাবা তাঁর যৌবনের কাহিনি শোনাতেন আমাদের। আমরা সান্তা ফের গল্প শুনেছি। বাবা কিছু দিন ছিলেন ওখানে। সান্তা ফে আবিস্কৃত হবার বছর দশেক পর স্প্যানিশ ধর্মযাজকেরা প্লিমা উথরকে অবতরণ করেছিল।

খনিজ পদার্থের লোভে বহু জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়েছিল ওরা। আজ আর সে-সবের নথিপত্র নেই। এটাও হয়তো তেমনি একটা কিছু হবে।

যে-ট্রেইল ধরে মোরায় যাচ্ছিলাম আমি, ছেলেবেলায় সেটার কথাও শুনেছি বাবার মুখে। মনট্যানার খনিশ্রমিকদের কাছে পরে আরও জেনেছি এ-ব্যাপারে। ওই পথে উতেদের সঙ্গে স্প্যানিশরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ফাদার এসকালেনতে, এমনকী ক্যাপটেন জন স্মিথ যখন ভার্জিনিয়া উপকূল আবিষ্কার করেন, তারও বহু আগে থেকে ওই ট্রেইল ধরে উত্তরে গেছে বণিকেরা। কিন্তু তারা বিশেষ রেকর্ড রেখে যায়নি। সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে রিভেরা এসেছিলেন, এ-দিকে, অবশ্যি ততদিনে এই অঞ্চলের খবর সবাই জেনে গিয়েছিল।

গুহা থেকে বেরিয়ে আবার উপত্যকার ওপরে উঠতে লাগলাম আমি। ঘোড়াগুলো সঙ্গে আছে। আধ-মাইল যাবার পর পাহাড়ের ঢালে একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেলাম। আশপাশে পাথর ছড়ানো।

সুড়ঙ্গের দেয়াল ঘেঁষে পাথরের পাঁজা। একটা তুলে নিলাম হাতে – বেশ ওজন। ঠুকে ঠুকে মাটি ঝেড়ে ফেলতেই চকচক করে উঠল সোনা।

প্রথমে বিস্ময়ে, তারপর আনন্দে-উত্তেজনায় শিউরে উঠলাম আমি। এগুলো এখন আমার, অথচ মাত্র কদিন আগেও আমি ছিলাম নিঃসম্বল।

তিন

সোনাহাতে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে এমন ঘটনা ঘটবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমরা বিত্তশালী নই। মূলত আমাদের চাহিদা জমি। আবাদী জমি। পারিবারিক বন্ধনকে আমরা অত্যন্ত মূল্য দেই। আপদে-বিপদে এক সঙ্গে রুখে দাঁড়াই সবাই।

হিগিনসদের সাথে আমাদের দীর্ঘকাল লড়াই চলেছে। এতে আমাদের অনেকেই মারা গেছে। হিগিনস পরিবারের শেষ-সদস্য লং হিগিনসের মৃত্যুতে অবসান ঘটেছে এই শত্রুতার। ওকে মেরেছে আমার ছোট ভাই, ও'নীল ওসমান। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না।

তবে এ-মুহূর্তে আমার মাথায় অন্য চিন্তা চলছে। যে-কোনও কাজের আগে চিন্তাভাবনা করবার পরামর্শ দিতেন বাবা। এখন আমি তাই করছি।

ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, সে-ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। আগে খনিতে আমার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তারপর সোনার খবর জানাব লোককে।

সোনার আরেক নাম বিপদ। অনেকেই এর স্বপ্ন দেখে; কিন্তু যখন পায়, নিজের অজান্তেই বিপদে জড়িয়ে পড়ে। সোনা মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধ নষ্ট করে। লোভে উন্মত্ত হয়ে ওঠে সে, খুন করতেও দ্বিধা করে না। কাজেই, সাবধান থাকতে হবে আমায়। এখন আমি এমন এক জায়গায় আছি যেখানে আইনের শাসন বলতে কিছু নেই।

সোনা ভারি জিনিস। ইচ্ছে করলেই লুকিয়ে রাখা যায় না। এর যেন দুর্গন্ধ আছে, বাতাসে ছড়ায়।

তা ছাড়া, খনি থেকে বের করবার ঝক্কি প্রচুর। আমার সাথে সরঞ্জাম নেই। ঠিক করলাম, অল্প কিছু সোনা সঙ্গে নিয়ে যাব। ওগুলো বিক্রি করে সরঞ্জাম কিনব। আমার স্যাডলব্যাগেই নেব। ঝুঁকি আছে, কিন্তু আমি নিরুপায়। ক্যাটল ড্রাইভে সামান্য যা আয় হয়েছিল খাবার এবং টুকিটাকি জিনিস কিনতে খরচ হয়ে গেছে।

ওই খনিতে আমার চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি সোনা আছে। ছোটখাটো একটা বাথান আর কিছু বই কেনার সামর্থ্য হলেই আমি খুশি। অশিক্ষা একটা অভিশাপের মত। পাহাড়ে সুযোগ-সুবিধার অভাবে আমার লেখাপড়া হয়ে ওঠেনি। কেবল কোনমতে নিজের নাম সই করতে পারি। তাও বাড়িতে এক বাবা আর নীল ছাড়া কারও সাধ্য ছিল না সেটা পড়ে। সেনাবাহিনীতে আমার

অফিসারদের ভেতরে মাত্র একজন এক-আধটু বুঝতেন। এ-নিয়ে আমাকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছিলেন তিনি।

'রাইফেলে তোমার যা টিপ' অফিসারটি বলেছিলেন, 'তাতে তোমার হাতের লেখা যত খারাপই হোক, কেউ কোনও প্রশ্ন করার সাহস পাবে না।'

কিন্তু আমি নিজেকে প্রবোধ দিতে পারি না। আমার ভাবী বংশধরদের কাছে মুখ দেখাবে কী করে? তারা যখন জানবে তাদের বাবা মূর্খ, তখন কি শ্রদ্ধা থাকবে আমার প্রতি?

বীর্যবান পুরুষ বলে ওসমানদের খ্যাতি আছে। ভাই আর আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে আমাদের পরিবারে পুরুষ মোট ঊনচল্লিশজন। বাবার দুবোন-পাঁচ ভাই এখনও বেঁচে। দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে তারা। অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। ওদের সামনে আমি নেহাত নগণ্য। তবে সোনা পাওয়ায়, আমার বিশ্বাস, এখন অবস্থার হেরফের ঘটবে।

শোবার আয়োজন করলাম। খসিয়ে নিলাম ঘোড়াদুটোর জিন। সুন্দর আবহাওয়া। বসন্তের মাঝামাঝি, গ্রীষ্ম সমাগত প্রায়। পাহাড় থেকে বরফের দল বিদায় নিয়েছে, তবে মিলিয়ে যায়নি। এই রাজ্যে সেটা আশা করাও বোকামি, আবার কখন শুরু হবে – কেউ এ-কথা বলতে পারে না আগাম।

শহর থেকে সরঞ্জাম নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে, হয়তো কিছু সোনা উদ্ধার করে তুষারপাতের আগেই চলে যেতে পারব। এখন আমি যেখানে আছি, বছরের নয় মাস সেখানে বরফ থাকা বিচিত্র নয়। সুতরাং, এখানে আটকা পড়লে ভয়ঙ্কর শীত পাড়ি দিতে হবে।

আরও একটা চিন্তা কাঁটার মত বিঁধছে আমার মাথায়।

বর্ষায় ওই গিরিপথ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। ফলে, শীত-বর্ষা বাদ দিলে, হাতে থাকছে আর পঞ্চাশ-ষাটদিন। বড়-জোর ওই কটা দিন এখানে ঢোকা বা এখান থেকে বেরোনো যাবে। অবশ্যি আর কোনও রাস্তা যদি ঠেকে থাকে, সেটা ভিন্ন কথা।

নিজেকে আমার ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত মনে হচ্ছে। আগুনের কফির পাত্র চড়িয়ে পরিস্থিতি বিচার করতে বসলাম।

ওয়েস বিগলোর ভাইয়েরা হয়তো ভাবছে, আমি তাদের ফাঁকি দিয়েছি। সে-ক্ষেত্রে ওরা পিছু নেবে. ফেরার পথে নিজের ট্রেইল লুকোবার চেষ্টা করিনি। কথাটা মনে হতেই চমকে উঠলাম। বিগলোরা আমাকে খুঁজতে গিয়ে অ্যানজেল আর নীলের কাছে গিয়ে হাজির হোক, এটা আমি চাই না। এমনিতেই জাতিমামলায় আমাদের অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। ওদেরকে বিপদে জড়াবার অধিকার আমার নেই।

তবে বিগলোরা এই উপত্যকায় আসবে বলে মনে হয় না। ভূতুড়ে ট্রেইলে ওঠার পর থেকেই নিজের ট্র্যাক ঢাকার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছি আমি।

দমকা বাতাসে অগ্নিশিখা কাঁপছে। মেঝেতে ছায়া পড়েছে স্প্যানিশ

বর্মটার। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছি ওটা। আচ্ছা, অশরীরী আত্মারা কি এইরকম রাতে দেখা দেয়?

কেন জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে আড়াল থেকে সারাক্ষণ কেউ নজর রাখছে আমার ওপর। ঘোড়াগুলো ছটফট করছে। ঘুমোবার আগে ওদেরকে ভেতরে এনে আগুনের কাছাকাছি বেঁধে রাখলাম। সময় বিশেষে, পাহারাদার হিসেবে ঘোড়ার জুড়ি নেই। তা ছাড়া এ-মুহূর্তে এরাই আমার একমাত্র সহায়।

ভোরে ঝরনায় মাছ ধরতে গেলাম আমি। বড়শি ফেলে কয়েকটা ট্রাউট ধরলাম। নাস্তা সারলাম আগুনে সেঁকে।

একটা মোটা গাছের ডাল ভেঙে সেটার এক প্রান্ত চিরলাম। এ-বার ওই ফাঁকে একটা গোলাকার নুড়িপাথর বসিয়ে দিতেই তৈরি হয়ে গেল একটা চলনসই কুঠার। এরপর সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় গিয়ে কাজে হাত দিলাম। সন্ধ্যে নাগাদ একটা বিরাট আকরিক খসে এল দেয়াল থেকে। প্রায় তিনশো ভরি ওজন হবে।

এখন গভীর রাত, কিন্তু আমার বিশ্রাম নেই। সাবধানে স্ফটিকটা ভেঙে কিছু সোনা বের করলাম। উঁচুমানের জিনিস, জুয়েলারি দোকানে পাওয়া যায় এমনটা।

নির্জন পাইন সুরভিত রাত। ফটফট শব্দে পুড়ছে লাকড়ি। হিমেল বাতাসে জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। অন্ধকারে ঝরনার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলাম আমি. তারপর গুহায় ফিরে একটা ধনুক বানাতে বসলাম।

চেরোকী ইন্ডিয়ানদের মাঝে বড় হয়েছি আমরা, তীর-ধনুকের সাহায্যে শিকার করতে জানি। অবশ্যি এ ছাড়া আমাদের কোনও উপায়ও ছিল না পাহাড়ের গোলাবারুদের অভাব প্রচণ্ড।

সুন্দর গন্ধ ছড়িয়েছে ধোঁয়ার, থেকে থেকে সশব্দে লাকড়ি ফাটছে, তখন লকলক করে উঠছে শিখা। সহসা ঘোড়াদুটো পেছনের পায়ে ভর রেখে সোজা হলো। চট করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলাম আমি, হাতে উইনচেস্টার প্রস্তুত।

অনেকক্ষণ বসে রইলাম অনড়, কান সজাগ। ঘোড়াগুলোর শরীরে প্রতিফলিত হচ্ছে আগুন। বোধ হয় ভালুক কিংবা সিংহটিংহ হবে. অথচ ঘোড়ার আচরণ দেখে সেটা বিশ্বাস করতেও বাধছে

খানিকবাদে ফের আহারে মন দিল দুই অ্যাপালুসা। একটা কঞ্চির সাহায্যে কফির কেতলি কাছে টেনে নিলাম আমি. গরুর জার্কি মুখে পুরে চুষতে লাগলাম।

ভীষণ পরিশ্রান্ত লাগছে, ভারি হয়ে আসছে দুচোখের পাতা। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল আমার পুব আকাশে ভোরের পাণ্ডুর আলো ফুটেছে। অ্যাসপেন শাখায় বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ ঝুপ... আতঙ্কে কাঁটা দিল আমার গায়ে – ওই গিরিপথ পানিতে তলিয়ে গেলে হপ্তাখানেকের ভেতর বেরোতে পারব না এখান থেকে।

মালপত্র গুছাতে শুরু করলাম তাড়াতাড়ি। আবার রওনা দেব টের পেয়ে

ঘোড়াদুটো হ্রেষারবে আনন্দ প্রকাশ করল। আমার কাছে এখন তিন পাউণ্ডের মত সোনা আছে, সরঞ্জাম কিনেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে হাতে।

বাইরে এসে যা দেখলাম তাতে আমার চোখ কপালে উঠল। সকালে নাস্তা করব বলে যে-মাছখানা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেটা নেই। কোনও ভোঁতা ব্লেড বা দাঁত দিয়ে ঝোলাবার দড়িটা কেটে ফেলেছে কেউ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম মাটির দিকে। গাছের তলায় কয়েকটা ক্ষুদে ট্র্যাক নজরে পড়ল। বেড়ালের নয়, মানুষের পায়ের ছাপ। মনে হয় কোনও শিশু বা কিশোরীর।

ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল আমার। এ-রকম জায়গায় মানুষ থাকে কী করে – অথচ নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারছি না। অপদেবতারা মাছ খায়, এমন কথা আমি কস্মিনকালেও শুনিনি।

যাত্রার মুখে বাধা পড়ায় খিঁচড়ে গেল আমার মেজাজ। খিদেয় পেট জ্বলছে, মাংস দরকার। কিন্তু গুলি ছুঁড়তে ভরসা পেলাম না। তীর মেরে একটা কচি হরিণ বধ করলাম, ছাল ছাড়িয়ে গুহায় নিয়ে এলাম মাংস। খানিকটা ফালি করে কেটে আগুনের ওপর শুকোতে দিলাম। তারপর নাস্তা সারলাম বড় এক টুকরো মাংস ঝলসে নিয়ে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, বাতাসের তোড়ে হঠাৎ জেগে গেলাম। আগুন নিভু নিভু, লাল হয়ে আছে কয়লাগুলো। গুটিসুটি মেরে আবার শোবার উদযোগ করছি, এমন সময় আমার মাসটাং ডেকে উঠল।

কম্বলের ভেতর থেকে পাকাল মাছের মত বেরিয়ে এলাম আমি, রাইফেল কক করে লুকোলাম অন্ধকারে।

'শান্ত হ, বেটা, কোনও ভয় নেই,' ফিসফিসিয়ে বললাম ঘোড়াকে।

বাইরে বাতাসের টানা শোঁ-শোঁ গর্জন, আর কোনও শব্দ নেই। একটুবাদে আরেকটা নড়াচড়ার আওয়াজ ভেসে এল। দুনিয়ার কোনও ভালুক বা হরিণ ওভাবে হাঁটে, আমি বিশ্বাস করি না।

ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল আমার ঘোড়াটা, চিঁ হিঁ রব করল প্যাক হর্স। কয়লার ম্লান আলোয় ওদের পা দেখতে পাচ্ছি, কাছেপিঠে কিছুই নড়ছে না। অথচ আমার বদ্ধমূল ধারণা, আঁধারে রয়েছে কেউ।

ধীর লয়ে বয়ে চলে সময়। মিটিমিটি জ্বলছে কয়লা। দেয়ালে হেলান দিয়ে আমি ঝিমোচ্ছি, তবে সমস্ত পেশী টানটান।

আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

অনেক আশার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোর হলো। ঝড় থেমে গেছে। পাইন বনের শেষ-প্রান্তে, পাহাড়চুড়োয় হেসে উঠেছে সূর্য। একটু একটু করে আবীর ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা আকাশে। বাতাসে হাত-পা খেলিয়ে শরীরের খিল ছাড়ালাম আমি। প্রথমেই চোখে পড়ল, গতরাতের শুকোতে-দেয়া মাংস গায়েব। আজ আর বিরক্ত হলাম না: লোকটা যেই হোক, অনাহারে আছে – নইলে একটা অচেনা

ক্যাম্পে হানা দেবার ঝুঁকি নিত না।

বাইরে গিয়ে আরেকটা হরিণ মারলাম। ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়ে দিলাম গাছের ডালে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে ফিরতি পথ ধরলাম। আমি বেঁচে থাকতে অন্য কেউ কষ্ট পাবে অনাহারে – এটা আমার কাম্য নয়।

বর্ষণের ফলে রাস্তা পিচ্ছিল, বারকয়েক পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলাম। অতিকষ্টে উঠে এলাম বেসিনে, নামতে শুরু করলাম ভূতুড়ে ডোবাটাকে পাশ কাটিয়ে। তবে এ-বার আগের ট্রেইল ধরে যাচ্ছি না, একটা খাড়া ঢাল বেছে নিয়েছি – কেবল-মাত্র পাহাড়ী ভেড়ার পক্ষেই অমন পথে চলাফেরা সম্ভব।

বাঁকের মাথায় এসে, পেছন ফিরে চুড়োর দিকে তাকালাম আমি। 'তোমার জন্যে মাংস রেখে গেলাম – খেও,' বললাম চেঁচিয়ে। 'আমি আবার আসব – সোনা নিতে।'

চার

মেসার কিনারে এসে থামলাম আমি। অদূরে, নীচে শান্তভাবে বইছে মোরা নদী। পাশেই বাথান। আলো জ্বলছে একটা ঘরে। পরম স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। ওই বাথানে আমার হৃদয় আছে, কারণ ওখানে আছে আমার মা, ছোট ভাইয়েরা।

পেছনের ট্রেইল আরেকদফা দেখে শুরু করলাম নামতে। উইলো বন থেকে হিমের গন্ধ উঠে আসছে। দূরে লা কুয়েভা উপত্যকা, ফসলের মাঠ কুয়াশায় মোড়া।

হ্রেষারব করে উঠল একটা ঘোড়া, ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে একটা কুকুর, তারপর আরও একটা। তবু কোনও দরজা খুলল না; যেমন জ্বলছিল বাতি, তেমনি জ্বলতে লাগল। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মনে এগিয়ে যাচ্ছি আমি, দৃষ্টি সজাগ। অন্ধকারে নিশ্চয়ই কেউ আমার ওপর নজর রাখছে। আমার মতবল না বুঝে বলবে না কিছু।

স্যাডল থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলাম। বিনা সাড়াশব্দে ভেতরে ঢুকলাম দরজা ঠেলে।

রেড়ির বাতি জ্বলছে একটা টেবিলে। ও'নীল বসে আছে। মা এবং আরও এক রমণী রয়েছে। ওই মেয়েটি বোধ হয় নীলের স্ত্রী, ভাবলাম।

চারজনের টেবিল, একটা আসন ফাঁকা। নীরবে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি আমি, মাথা ওপরের চৌকাঠ ছুঁই-ছুঁই। আনন্দে জিভ সরছে না আমার, মনে হচ্ছে গলার কাছে একটা পুঁটুলি দলা পাকিয়ে আছে, চোখে জল। কেমন যেন অপ্রতিভ লাগছে, বাধো বাধো ঠেকছে এই ধূলিমলিন পোশাকে পরিপাটি ঘরে ঢুকতে।

'কেমন আছ, মা? নীল, আমার পেছনের লোকটাকে বন্দুক সরাতে বললি না?'

ও'নীল উঠে দাঁড়াল। 'কে...ওরিন!'

'হ্যাঁ রে – তোরা সবাই ভাল আছিস?' বললাম আমি। তারপর ঘুরে নীলের স্ত্রীকে নড করলাম। 'হাউডি, ম্যাম? আমি উইলিয়ম ওরিন ওসমান। তুমি নিশ্চয়ই রোসাবেলা – নীলের বউ।'

আমার হাতে ওর করতল রাখল রোসাবেলা, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে চুমু খেলো গালে। লজ্জায় আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। ঘর-কাঁপানো হাসিতে ফেটে পড়ল নীল, তারপর আমার পেছন দিকে অন্ধকারে তাকিয়ে বলল, 'চলে এসো, ক্যাপ। ও আমার বড় ভাই ওরিন।'

আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ক্যাপ সয়্যার। কৃশকায়, মাঝবয়েসী লোক। পোড়-খাওয়া ধূসর একজোড়া চোখ। গোঁফগুলো পেকে সাদা। স্থির চোখে আমার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল সে। নীল বাড়িয়ে লেখেনি, স্বীকার করলাম মনে মনে, এই লোক শক্তপাল্লা – এতটুকু বেচাল দেখলে এতক্ষণে আমার লাশ ফেলে দিত।

ক্যাপ এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে হাত মেলাল।

রান্নাঘরের দিকে ঘাড় ফেরালেন মা। 'হুয়ানা, আমার ছেলেকে খেতে দে।'

আবার আমার চমক খাওয়ার পালা। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার মা চিরকাল স্বাবলম্বী, সেই তিনি কিনা ঝি রেখেছেন।

হুয়ানা দোআঁশলা মেয়ে। বাবা মেক্সিক্যান, মা ইন্ডিয়ান। দামী থালায় করে খাবার নিয়ে এল সে। আমাকে আড়ষ্টতা গ্রাস করল, বহুদিন হলো কোনও মেয়েছেলের সামনে খাইনি। ধুকপুক করছে বুক, পাছে শিষ্টতায় হানি ঘটে। ট্রেইল ক্যাম্পে খিদে পেলে মানুষ খায় – আচার-আচরণ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

'আমি বারান্দায় বসে খেলে আপত্তি আছে?' বললাম। 'কেমন যেন লাগছে এখানে।'

হাত ধরে আমাকে চেয়ারের কাছে নিয়ে গেল রোসাবেলা। 'বসো, ওরিন – খেতে খেতে তোমার গল্প শুনব।'

রোসাবেলার অকপটতায় মুগ্ধ হলাম। চকিতে সোনার কথা মনে পড়ল। বাইরে থেকে থলেগুলো নিয়ে এসে রাখলাম টেবিলে। এক টুকরো স্বর্ণপিণ্ড বের করলাম ভেতর থেকে, স্ফটিকের গুঁড়ো লেগে আছে এখনও।

বিস্ময়ে সবার চোখ কপালে উঠে গেল। নীলকে আমার কোনও ব্যাপারে ঘাবড়াবার পাত্র বলে মনে হয়নি, অথচ সেও স্পষ্টত তাজ্জব হয়েছে।

রান্নাঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসলাম আমি। সংক্ষেপে সব কিছু জানালাম ওদের।

এ-বাড়ির চাকচিক্যে আমার বিস্ময় বাড়ছে ক্রমশ। তকতকে নিকানো মেঝে, মিসিসিপির স্টিমারে এমনটা দেখেছি। পারলারের অনেকটা দেখতে

পাচ্ছি খোলা দরজা দিয়ে। মেহগনি কাঠের ভারি আসবাব, দেয়াল-জোড়া শেলফ, থরেথরে বই।

মায়ের জন্যে এমন একটা বাড়ির স্বপ্ন সারাজীবন আমি কেবল দেখেই এসেছি। অ্যানজেল আর ও'নীলের জন্যে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল।

সবাই খাওয়ায় মগ্ন, আমি উঠে পারলারে গেলাম। এ-ঘরেও একটা টিমটিমে রেড়ির বাতি জ্বলছে। উস্কে দিলাম সলতেটা। উবু হয়ে তৃষিত চোখে দেখছি বইগুলো। নামালাম একটা, আলতোভাবে উল্টালাম মলাট যাতে ময়লা লেগে না যায়। হাত দিয়ে বইটার ওজন বুঝতে চেষ্টা করলাম। বেশ ভারি, নিশ্চয়ই বহু মূল্যবান কথা লেখা আছে।

একটা লাইনের ওপর হাত রাখলাম আমি। পড়তে চাইলাম, পারলাম না। অপরিচিত শব্দ সব। এক বাইবেল ছাড়া জীবনে আর কিছু পড়িনি আমি। এইবার হেঁটে হেঁটে বইগুলোর নাম পড়তে শুরু করলাম। প্রায় সবই আইনের বই। সাহিত্য ও দর্শনের ওপরেও কিছু আছে। ওগুলো পড়তে ইচ্ছে করছে আমার। একের পর এক বই ঘাঁটছি। মাঝে-মধ্যে পরিচিত শব্দ পাচ্ছি একটা-দুটো।

চকিতে এইসব জায়গা ধরা পড়ছে আমার চোখে, রাইফেলের নলে সূর্যের প্রতিফলনের মত। হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে গেলাম, ব্ল্যাকস্টোনের ওই বিশেষ অংশটি কেন আমার পছন্দ হলো বলতে পারব না।

'...সমাজে সকলের অধিকার সমান। প্রত্যেকেরই উচিত অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মূল্য দেয়া, তেমনি সমাজের সমষ্টিগত চাহিদার দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। অর্থাৎ, সমাজ যেমন ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করবে; তেমনি ব্যক্তিও সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলবে। এ ছাড়া দেশে আইনের শাসন আসবে না।'

বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সম্পূর্ণ অর্থ ধরতে না পারলেও কথাগুলো দারুণভাবে ঝাঁকুনি দিল আমার ভেতরটাকে। ঠিক করলাম, যেভাবে হোক এর অর্থ উদ্ধার করব।

বইগুলো যথাস্থানে রেখে উঠে দাঁড়ালাম আমি, জরিপের দৃষ্টিতে তাকালাম চারপাশে। এই বাড়ির মালিক আমার মা, এবং ও'নীল আর অ্যানজেল। এখানে আমার কোনও অধিকার নেই। এটা ওদের পরিশ্রমের ফসল – এবং মাকে সেটা দান করেছে ওরা।

ও'নীল সেই রোগা পেটুক বালকটি আর নেই। এখন দীর্ঘকায় একহারা গড়ন। হাবভাবে স্বকীয়তার ছাপ। কালো বনাতের কোট আর সাদা শার্টে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। মনে হচ্ছে পোশাকটি যেন ওর জন্যেই সৃষ্টি। এমনকী, অ্যানজেলের চাইতেও সুদর্শন দেখাচ্ছে।

আমি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওদের তুলনায় নিজেকে আমার কদাকার বলে মনে হলো। অসম্ভব লম্বা, লিকলিকে স্বাস্থ্য, হাড্ডিসার মুখ। অনেকটা কুঠারের মত। গালের এক পাশে একটা পুরোনো ক্ষতচিহ্ন। আমার

সমস্ত শরীরের মধ্যে একমাত্র কাঁধেই যা একটু মাংস – তাও ঈষৎ ঝুলে-পড়া। পরনের এই জীর্ণ আর্মি শার্ট আর বিবর্ণ জিন্সে আমাকে নির্ঘাত কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে।

ছোট ভাইয়েরা আমার, সে-তুলনায়, অনেক বেশি স্মার্ট, বুদ্ধিমান এবং সম্ভাবনাময়। আমার সম্বল শুধু দুখানি হাত, আর আমার কষ্টসহিষ্ণু মেরুদণ্ড। এই দুহাতে অবলীলায় প্রায় সব কাজ করতে পারি। ঘোড়ায় চড়া, গরুর দেখাশোনা জানি। কিন্তু তাতে কি লাভ হয়েছে কোনও?

আবার বইয়ের সেই কথাটা মনে পড়ল। মানুষের জীবন ওই ছকে বাঁধা, ওভাবেই তার উন্নতি। বইতে এ-সব কথা লেখা থাকে, আগে জানতাম না আমি।

অ্যানজেল এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। গিটার বাজিয়ে গান ধরেছে। অতীতের মত সরব হয়ে উঠেছে আমাদের বাসা। তবে সময় থেমে নেই, আমি জানি, ছোট ভাইয়েরা আমাকে ফেলে বহু, বহুদূর এগিয়ে গেছে। আর কদিন পর আমার আটাশ পুরবে – এর সবটুকুই প্রায় রুক্ষ রূঢ় অভিজ্ঞতা – তবে আমার এই মনোবলটুকু অন্তত রয়েছে যে, অ্যানজেল আর ও'নীল যখন পেরেছে – আমিও পারব।

সকাল হলেই খনিতে যাবার তোড়জোর শুরু করব। সোনা বেচে সরঞ্জাম কিনব প্রথমে। তারপর বেরিয়ে পড়ব। ঝটপট সারতে হবে সব কিছু, কারণ বিগলোরা চলে এলে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে, বলা মুশকিল। কিন্তু আমি যেমনটি ভেবেছিলাম, প্রথম পর্ব তার চেয়ে অনেক সহজে সমাধা হয়ে গেল।

মোরার নিকটতম বিপণিকেন্দ্র লাস ভেগাস। আমি রওনা হলাম সেখানে। সঙ্গে ও'নীল আর ক্যাপ সয়্যার।

'আমিও আসছি,' বলল ক্যাপ। 'সাথে লোক থাকলে তোমার সুবিধে হবে। ওই সোনা যেখানেই দেখাবে, তোমার শত্রু বাড়বে। সুযোগ পেলে মেরেও ফেলতে পারে।'

লাস ভেগাসের পথে নতুন একটা আইডিয়া খেলল আমার মাথায়। সেই ঝরনাটার উল্টোদিকে, কোনও এক উপত্যকায় ক্লেইম স্টেক করব। লোকে এর ফলে ভাববে সোনা ওখানেই পেয়েছি – আসল জায়গায় তাদের চোখ পড়বে না।

'বেশ তো,' বারকয়েক চোখ পিটপিট করল ক্যাপ। 'তুমি ফাইল করো, আমি নামকরণ করব। ওটার নাম হবে রেড হেরিং।'

লাস ভেগাস ব্যাঙ্কে আমি যখন সোনা দেখালাম, ব্যাঙ্কারের চেহারা ঈষৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ক্যাপের কথা সত্যি: লোকটার চোখে লোভের ছায়া স্পষ্ট।

'কোথায় পেয়েছ?' প্রশ্ন করল ব্যাঙ্কার।

'মিস্টার,' বললাম আমি, 'কেনার ইচ্ছে থাকলে দাম বলো – নইলে আমি

আর কোথাও যাব।'

ব্যাঙ্কার লোকটা ঢ্যাঙা; গায়ে-গতরে মাংস নেই বললেই চলে। কালো কুঁতকুঁতে চোখজোড়ায় বাজপাখির দৃষ্টি। শুকনো রোগাটে মুখ, ঝাঁটার মত গোঁফ।

নিজের ঠোঁট চাটল সে, সরাসরি তাকাল আমার দিকে। 'চুরিও তো–'

আমার দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠছে দেখে ব্যাঙ্কারের গলায় কাঁটা ফুটল। ঠিক সেই মুহূর্তে ও'নীল আর অ্যানজেল দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল। অ্যানজেল দরকারী কাজে আগেই শহরে এসেছিল, ব্যাঙ্কে আসবার পথে ওকে তুলে এনেছে ও'নীল।

'প্রবলেম, ওরিন?'

'না।'

'ওহ্, অ্যানজেল!' ব্যাঙ্কার একবার ও'নীলকে আরেকবার আমাকে দেখছে। চেহারার মিল চোখে পড়বার মত।

'সোনা কিনছিলাম। তোমার ভাই?' ঘাম দেখা দিয়েছে ব্যাঙ্কারের কপালে।

'ওরিন, এর নাম জন টুথহিল।'

'কী সৌভাগ্য!' মুখে শুকনো হাসি ফুটাবার প্রয়াস পেল ঝাঁটা-গোঁফ ওরফে টুথহিল। কিন্তু আমাদের চোখ যখন পরস্পর মিলিত হলো, আমার বুঝতে বাকি রইল না যে আমার কপালে ভোগান্তি আছে।

'মন্ট্যানা থেকে কালই এসেছে আমার ভাই,' অমায়িক সুরে বলল অ্যানজেল। 'ওখানে ওর একটা খনি আছে।'

'ওকে দেখে কিন্তু মনে হয় কাউহ্যান্ড।'

'একসময় তাই ছিলাম – ইচ্ছে আছে আগামীতে নিজেই একটা র‍্যাঞ্চ দেব

এরপর আমরা ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করলাম। মাইনিংয়ের জন্যে যা যা লাগবে, শাবল, গাঁইতি, ছেনি সব কিনলাম। এমনিতে আমার সন্দেহবাতিক নেই, কিন্তু জানি সাবধান থাকা ভাল। তাই, সারাক্ষণ পেছনের দিকে খোলা রাখলাম একটা চোখ।

একটুবাদে নিজেদের কাজে চলে গেল অ্যানজেল আর ও'নীল। আমারও বাজার সারা। ক্যাপ সয়্যারকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। অবশ্যি ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলে। যৌবনে ক্যাপ অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। কেউ তার লেজ মাড়ালে নিজের বিপদই ডেকে আনবে শুধু।

বেলা ডুবে গেছে। আস্তাবলে মালপত্র রেখে আমি রাস্তায় নামলাম। থেমে এক ঝলক তাকালাম পাহাড়ের দিকে, তারপর পেছনে। যা ভেবেছি, ফেউ লেগেছে।

লোকটা বিগলোদের কেউ হবে, সন্দেহ হলো আমার। ঝটিতি বাঁক নিলাম একটা অন্ধকার গলিতে, হাঁটতে লাগলাম ধীরে ধীরে।

পেছন থেকে ধুপধাপ শব্দ ভেসে আসছে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল আমার মুখে – লোকটা কোনওক্রমেই আমাকে হারাতে রাজি নয়। ছায়ায় মিশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আচমকা সামনে আমাকে না দেখে হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। ঝট করে থমকে গেল, আর ঠিক তক্ষুণি ওকে আঘাত করলাম আমি।

আমার মুঠি বিরাট, মজুরের মত শক্ত হাত। লোকটার চোয়ালে থ্যাচ করে জমে গেল। কুড়োল দিয়ে গাছের গুঁড়ি কাটার মত শোনাল।

আড়াল থেকে আমাকে কেউ নজরে রাখবে এটা আমার মোটেও পছন্দ নয়। বাঁ-হাতে ওর কলার চেপে ধরে, টানতে টানতে স্যালুনে নিয়ে গেলাম। ওখানেই আমাদের সবার মিলিত হবার কথা।

খদ্দেররা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে। পশ্চিমের যে-কোনও শহরে এইরকম দৃশ্য দেখলে লোকে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বারের সামনে একটা টুলে জোর করে বসিয়ে দিলাম ফেউকে।

'কেউ চেন একে?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আমার পিছু নিয়েছিল। অন্ধকারে হামলা করেছিল আমাকে।'

'ওর নাম উইল বয়েড – জুয়াড়ি।'

'ভুল তাসে বাজি ধরেছিল,' বললাম আমি।

বয়েডের বোধশক্তি ফিরে আসছিল, যখন টের পেল কোথায় আছে, সরে পড়বার চেষ্টা করল বার থেকে। কিন্তু আমি ওকে বজ্রমুঠিতে ধরে রইলাম। আরকান-স টুথপীকটা বের করলাম কোমরের বেল্ট থেকে, এইসব ক্ষেত্রে বেশ সুফল দেয় ওটা।

'আমার পেছনে লাগা তোমার উচিত হয়নি,' বললাম, 'মনে হচ্ছে তোমার ওই গোঁফই যত নষ্টের গোড়া।'

কঠিন দৃষ্টিতে বয়েড তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মওকা পেলে আমাকে খুন করতে দ্বিধা করবে না। এরা খুব বিপজ্জনক হয়, টাকার লোভে যে-কোনও কাজ করতে পারে। মনে করে, ওদের চেয়ে চালাক বুঝি পৃথিবীতে আর কেউ নেই। অথচ ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। লোকটাকে টাইট দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বাড়িয়ে ধরলাম ধারাল ছুরিটা। 'নাও, তোমার গোঁফ কামিয়ে ফেল।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকাল উইল বয়েড। বোধ হয় ভাবছে, আমি ঠাট্টা করছি।

'আমার পিছু নিয়ে মারাত্মক ভুল করেছ তুমি,' খেই ধরলাম আবার। 'সুতরাং, বুঝতেই পারছ–' ভীষণ হয়ে উঠল আমার চেহারা।

কম্পিত হাতে ছুরিটা নিল বয়েড। একটু দোনোমনো করল, পরমুহূর্তে আমার কথা কানে যেতে গোঁফে ঠেকাল।

'মিস্টার, পাঁয়তারা করো না – ভাল হবে না ফল,' বললাম আমি।

থরথরিয়ে কাঁপছে বয়েডের হাত, বিনা সাবান-পানিতে কামাতে শুরু করল গোঁফ। ঘরসুদ্ধ লোক ক্ষুর চালাবার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

দড়াম করে খুলে গেল স্যালুনের দরজা। বয়েডের চোখজোড়া জ্বলে উঠল ক্ষণিকের জন্যে। মুখ খুলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। স্যালুনের নবাগত মেহমান টুথহিল।

'এই যে!' কর্তৃত্বের সুর ফুটল তার গলায়। 'হচ্ছে কী এখানে?'

'গোঁফ কামাচ্ছে একজন,' হালকা সুরে বললাম আমি। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরিয়ে যোগ করলাম, 'তুমিও কামাবে নাকি, টুথহিল?'

ঝাঁটা-গোঁথের চেহারা লাল হলো সামান্য। দম নিয়ে বলল, 'লোকটা দোষ করে থাকলে, সে-জন্যে আইন আছে।'

'সহকর্মীকে জেলে পুরতে চাইছ!' মর্মাহত হবার ভান করলাম। 'তুমি তো, দেখছি, সাংঘাতিক লোক।'

নীরবে অপমান হজম করল ব্যাঙ্কার। কেউ তাকে সমবেদনা জানাল না। আমার ধারণা, এই লোকই আমার পেছনে লাগিয়েছিল বয়েডকে।

বয়েডের গোঁফ কামানো হয়ে গেছে। কলমের মত দু-একটা রয়ে গেছে এখনও। কয়েক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

'যাও, মাফ করে দিলাম,' দরাজ গলায় ঘোষণা করলাম আমি। 'ভাগো এই শহর থেকে – এক্ষুণি। ফের কখনও আমার আশপাশে দেখলে স্রেফ খুন করে ফেলব।'

সূর্য ওঠার আগেই যে গোটা শহর এ-কাহিনি জেনে যাবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে ওদের মনোভাব জানবার সৌভাগ্য আমার হবে না – কারণ আমি তখন মোরার পথে থাকব।

বাথানে পৌঁছে মালপত্র গোছাতে শুরু করলাম। দাওয়ায় বসে নিবিষ্ট মনে আমাকে লক্ষ করছিল ক্যাপ, হঠাৎ নীরবতা ভাঙল সে।

'আপত্তি না থাকলে আমি যাব তোমার সঙ্গে। বাসায় চুপচাপ বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না।'

জবাব দেবার অবকাশ পেলাম না, উঠোনে একটা বাকবোর্ড ঢুকল।

লাফিয়ে নীচে নামল অ্যানজেল। মুখে মেঘ জমেছে। সোজা আমার কাছে হেঁটে এসে বলল, 'লাস ভেগাসে এক লোক তোমার খোঁজ করছিল, ওরিন। ওর নাম বিগলো।'

পাঁচ

আঁধার থাকতে রওনা হয়েছি আমরা। আকাশে দু-একটা তারা তখনও জ্বলছিল মিটমিট করে। আমরা কয়ৌট ক্রীকের উজানে যাচ্ছি। পুরোভাগে ক্যাপ সয়্যার, তারপর ছটা প্যাক হর্স, এবং সবশেষে আমি। স্যাংগর দ্য ক্রিসটোস পাহাড় থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, নীচে কোথাও ডাকছে একটা কোয়েল।

আমরা ইচ্ছে করেই ঘুরপথে যাচ্ছি। যাতে কারও চোখে পড়তে না হয়।

বাথানের লাগায়ো মোরা নদী. একটা সঙ্কীর্ণ গ্যাপের ভেতর দিয়ে সমভূমিতে গিয়ে পড়েছে। মোরার পাড় ধরে আমরা কয়োট ক্রীকের সঙ্গমে পৌঁছুলাম, তারপর ঘুরে লা কুয়েভা উপত্যকায় উঠলাম।

গোলনড্রিনোস গ্রাম ঘুরে অচেতন। পাশ কাটিয়ে উত্তরে যাত্রা করলাম আমরা। ভোরের কনকনে হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নির্মেঘ আকাশ, আলো ফুটছে সবে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভয়াল পাহাড়ী খাঁজগুলো, ভেংচি কাটছে। আমাদের খুরের চাপে নুয়ে পড়ছে ঘাস। জিনের খসখস শব্দে ছমছমে ভাব। গোলনড্রিনোস গাঁয়ে ডাকছে একটা কৌতূহলী কুকুর।

ক্যাপের পরনে ঘরে-বোনা পশমী কোট। স্যাডলে কুঁজো হয়ে বসে আছে সে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সেই কোন সকালে, এ-পর্যন্ত একটিবারও পেছন ফিরে তাকায়নি।

আমার মন ঘুরে-ফিরে বাড়িতে চলে যাচ্ছে। ভোর তিনটেয় বিছানা ছেড়েছি আমি। এখন গরমকাল, তবু পাহাড়ে ঠাণ্ডার প্রকোপ কমেনি এতটুকু। অথচ বাসার সবাই আমাকে এগিয়ে দিতে দোরগোড়া অবধি এসেছিল। অত ভোরেও নাস্তা খাইয়ে তবে ছেড়েছে রোসাবেলা। এই একটা ক্ষেত্রে ও'নীলের ভাগ্যে আমার হিংসে হচ্ছে – রোসাবেলার মত মেয়েকে ও বউ হিসেবে পেয়েছে।

নীল ঘুম থেকে উঠেই শেভ করে নিয়েছিল। মানুষ রোজ দাড়ি কামাবার মত ফুরসত পায় কোত্থেকে আমি ভেবে পাই না। তবে দাড়ি কামালে চেহারার জোলুস বাড়ে, এটা স্বীকার করতেই হয়। বুঝতে পারছি, কোনও মেয়ের সাথে গাঁটছড়া বাঁধার আগে আমাকে ভব্যতা শিখতে হবে।

মায়ের বয়েস হয়েছে। তার ওপর বাতে একটা পা প্রায় পঙ্গু। তবু ছেলেকে বিদায় জানাতে উঠে পড়েছিলেন বিছানা থেকে।

চলে আসবার আগমুহূর্তে মায়ের কপালে চুমু খেয়েছি আমি। তারপর তাকিয়েছি ঘরের চারদিকে। বেদনায় টনটন করে উঠেছে আমার বুক: মায়ের কোল ছেড়ে আবার বিপদের মুখে পা বাড়াচ্ছি। মা আমার জীবনে সুখের মুখ দেখেননি; আজ যা পেয়েছেন, তাও যে একটা বিরাট কিছু তা নয়, আবার একেবারে ফেলনাও নয়। সবচেয়ে বড় কথা – মা এতে খুশি। ছেলেরা তাঁকে চোখে হারায়, তাঁর আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা করেছে। এবং সেই সঙ্গে ওরা নিজেরাও উন্নতি করেছে।

কিন্তু আমি, ওরিন ওসমান? বংশের বড় ছেলে, এটুকুই যা আমার সম্মান – এ ছাড়া আপনার বলতে আমার কিছু নেই...কিচ্ছু না।

আমরা যেখানে যাব, তার মূল রুট স্প্যানিশ ট্রেইল। কিন্তু ক্যাপের পরামর্শে উত্তরে স্যান লুই এবং পুরোনো ফোর্ট ম্যাসাচুসেটস হয়ে যাচ্ছি। এখন পথে যদি কেউ ওত পেতে থাকে, বসে থাকাই সার হবে বেচারার। সে-রাতে আমরা ব্ল্যাক লেক থেকে আধ-মাইল ভাটিতে একটা পাইন বনে ক্যাম্প করলাম।

নিথর রাত। একঘেয়ে সুরে জাল বুনে চলেছে ঝিঁঝি পোকার দল। দূরে ডাকছে কয়েকটা কয়োট। খোলা প্রান্তরে তারই প্রতিধ্বনি। কাছেই, ঢালের ওপর দিকে কোনও এক ঝোপে পিঠ চুলকাচ্ছে একটা গ্রিজলি। তবে এই দুই অধম আদম সন্তানের প্রতি ওর একটুও মনোযোগ নেই – বুড়ো মানুষের মত বিড়বিড় করছে আপনমনে।

শুক্লপক্ষে একাদশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে হলুদ জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। সশব্দে লাকড়ি পুড়ছে। আমার চোখে ঘুম আসছে না, অপলক চেয়ে আছি সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে।

এ-জীবনে আমি কি নীড় বাঁধতে পারব?

সোনার খোঁজ গোপন রাখা কঠিন।

ভাল-মন্দ, সবল-দুর্বল – সোনার গন্ধ পেলে সবাই মৌমাছির মত ভনভন শুরু করে।

পরদিন সকালে ফের রওনা হলাম আমরা। অল্পক্ষণের মধ্যে অ্যানজেল ফায়ার মাউন্টিনের গোড়ায় পৌঁছুলাম। আমাদের বাঁয়ে ওল্ড টাওস পাস, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে সামনে চলে গেছে। আজ যাত্রার শুরু থেকেই ছটফট করছে ক্যাপ। উদ্বিগ্ন, বারবার তাকাচ্ছে পেছন দিকে।

আমরা যখন ঈগল নেস্ট উপত্যকায় এলাম, তখন বেলা বেশ চড়ে গেছে। দীর্ঘ ঢালে পাইনের সারি। পাতায় পাতায় বাতাসের কানাকানি। কাইমারনে যাবার ট্রেইলটা আমাদের পুবে। দল ছেড়ে ও-দিকটা জরিপ করতে এগিয়ে গেলাম আমি। জনাকয়েক অশ্বারোহীর ট্র্যাক রয়েছে। ওদের গন্তব্য উত্তরে – এলিযাবেথ টাউন।

ঘোড়ার রাশ টেনে পরিস্থিতি বিচার করতে বসলাম আমরা। দুভাবে ওখানে যাওয়া যায়: মোরেনো ক্রীক ধরে সোজাসুজি; অথবা কোম্যাঞ্চে ক্রীক অনুসরণ করে, একটা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে সামান্য ঘোরা পথে।

আমি ঠিক করলাম সোজা পথেই যাব। কারণ, এতে করে আমাদের পেছনে সত্যি সত্যি কেউ যদি লেগেও থাকে, সে টের পাবে না যে আমরা বিপদের আঁচ পেয়েছি। ক্যাপ সয়্যারও সায় জানাল। ঠিক হলো, আমরা শহরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব, আইডাহোতে আমাদের ক্লেইম আছে – সেখানেই যাচ্ছি।

এলিযাবেথ টাউন এখনও একটা সাপ্লাই পয়েন্ট। আশপাশের পাহাড় থেকে মাইনাররা মাল কিনতে আসে। কিছু দাঙ্গাবাজ লোক আছে। কিছু দিন আগে খাসমহাল বরাদ্দকে কেন্দ্র করে যে-লড়াই হয়েছিল, এরা যোগ দিয়েছিল তাতে। মামলা মিটে গেছে, ওরা যায়নি।

একটা পরিত্যক্ত কোরালে নিজেদের জিনিসপত্র উঠিয়ে রাখলাম আমরা। রাস্তায় অলসভাবে ঘুরঘুর করছিল এক মেক্সিক্যান ছোকরা। ওকে ডাকলাম

আমি। ছোকরার বেশভূষা দীন-হীন – একনজরেই বোঝা যায় গৃহযুদ্ধে এদের কপাল পুড়েছে।

ওর হাতে কয়েকটা মুদ্রা গুঁজে দিয়ে বললাম, 'দানাপানি আর মালিশের ব্যবস্থা করো – আমরা খেয়ে আসছি।'

সবচেয়ে কাছের পানশালায় ঢুকলাম আমরা। ফিসফিস করে ক্যাপ জানাল, এখানকার বারে এ-যাবৎ আট-দশজন লোক খুন হয়েছে। বিচিত্র নয়, চল্লিশ ফুট ঘরে বিশ ফুট বার। এই স্বল্প রেঞ্জে গুলি ফসকালে সেটা ভাগ্য বলতে হবে।

'তবে রান্নাটা ভাল,' বলল ক্যাপ। 'পুবের এক বিখ্যাত হোটেলে এই বাবুর্চি একসময় রাঁধত। একজন লোককে খুন করায় পালাতে বাধ্য হয়েছে।'

বারে চার-পাঁচজন খদ্দের বসে। কঠিন চেহারা সব। একজনের মুখে জেনারেল গ্র্যান্ট-মার্কা দাড়ি।

'ওর নাম বেন হবস,' নিচু গলায় জানাল ক্যাপ। 'টেক্সাসে ওর নামে হুলিয়া আছে।'

আমাদের টেবিলে এল বারটেন্ডার। 'কী দেব?' ক্যাপ সয়্যারের দিকে এক ঝলক তাকাল সে। 'দেখি না যে বড়?'

'ব্যস্ত,' বলল ক্যাপ। মাথা ঝাঁকিয়ে দেখাল আমাকে। 'আইডাহোতে আমাদের একটা ক্লেইম আছে – ওখানেই থাকতে হয় আজকাল।' বারের দিকে ইশারা করল ক্যাপ। 'বেনের সঙ্গে ওই সাদা চুলের ছেলেটা কে, স্যাম?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম। 'কিড নিউটন, ভবঘুরে...বোধ হয় মরার শখ হয়েছে।'

'সেই ঝিনুকের সুপ বানাও এখনও? থাকলে আমাকে দাও এক কাপ।'

'আমাকেও,' বললাম আমি, 'তবে দুকাপ। এবং সম্ভব হলে, খানিকটা মাংস।'

'একটু সবুর করতে হবে...মাংস চুলোয়।'

বারটেন্ডার চলে যেতে ক্যাপ মুখ খুলল। 'স্যাম গোলমাল করবে না। কারও সাতে-পাঁচে নেই – পাক্কা ব্যবসায়ী। ঝামেলা চায় না।'

কিড নিউটন কনুইয়ের ভর রাখল বারে। এক পা ব্রাস রেইলের ওপর তোলা, আংটার মত করে আঁকড়ে আছে গোড়ালি দিয়ে। দুটো পিস্তল কোমরে। পিস্তলবাজদের ঢঙে গানবেল্ট নামিয়ে পরা, হোলস্টারদুটো সেঁটে আছে দুই উরুর সাথে। বাজপাখির ঠোঁটের মত লম্বাটে চেহারা। তোবড়ানো চোয়াল। চোখজোড়া কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে, যেন এখুনি ছিটকে পড়বে। একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব কম। ঈষৎ বাঁকা ঠোঁট, যেন ভেংচি কাটছে সর্বক্ষণ।

বেন হবসকে নিচু স্বরে কিছু বলল নিউটন। 'ফরগেট ইট,' জবাব দিল হবস। নীরবে ক্যাপের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমি। ওর চোখে হুঁশিয়ারি, চেহারা নির্লিপ্ত।

খানিক পর খাবার দিয়ে গেল বারটেন্ডার। ক্যাপের কথা যথার্থ, মুখে দিয়েই

বুঝলাম। 'লোকটার রান্না তো ভালই,' বললাম আমি, 'তা খুনটা করেছিল কীভাবে?'

'কেন – খাবারে বিষ মিশিয়ে।' ক্যাপের গালে ভাঁজ পড়ল।

ছয়

ভীষণ খিদে পেয়েছিল আমাদের, খাবারটাও সুস্বাদু, পেট পুরে খেলাম। পশ্চিমের আর সব সস্তা স্যালুনের মত এটাও সাদা-মাঠা। একটা লম্বা বার, সামনে কয়েকটা টুল পাতা। ঘরের চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো খানকতক চেয়ার-টেবিল। বারের পেছনে, দেয়াল ঘেঁষে শেলফ। রকমারি বোতল সাজানো।

পশ্চিমে চিত্তবিনোদনের সুযোগ নিতান্তই কম। দিনান্তে কাজ সেরে মানুষ তাই পানশালায় ভিড় জমায়। নানা ধরনের, নানান পেশার লোক আসে এখানে। খায়, গল্প করে, অবসর সময় কাটায়। এরা প্রত্যেকেই স্বাধীনচেতা লোক, ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল। এমনিতে নিরীহ, কিন্তু আঁতে ঘা দিলে আর রক্ষে নেই।

কিছু মন্দ-লোকও আছে এদের মাঝে। নিজেদের এরা কেউকেটা, কঠিন লোক বলে ভাবে। মনে করে, তারা তাদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী চলবে, এবং অন্যেরা নির্বিবাদে মেনে নেবে তা। কিন্তু একটিবারও তলিয়ে দেখে না, এইরকম আচরণ করতে গেলে যে-সব গুণ থাকা দরকার তাদের সেটা নেই।

যেমন কিড নিউটন। ওর বয়েস এমন কিছু নয়, বড়জোর কুড়ি-একুশ হবে। এখানে ঢোকার পর থেকেই আমি দেখছি, ও বার-বার আড়চোখে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। দৃষ্টি দেখলেই এ-সব লোককে চিনতে পারি আমি, বুঝতে পারছি কিডের মাথায় দুর্বুদ্ধি চেপেছে। তবে বেন হবস সেটা পছন্দ করছে না।

বেন হবস কঠিন লোক। কাউকে তা বলে দেবার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু সঙ্গী নির্বাচনে ওর আরও সতর্ক হওয়া উচিত। ঝগড়ুটে লোকের সঙ্গে চললে, অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হয়।

নিউটন চাইছে একটা রক্তারক্তি ঘটাতে। হয়তো ভেবেছে, কাউকে খুন করতে পারলে লোকে তাকে সমীহ করবে। আর এ-জন্যে সে আমাদের বেছে নিয়েছে। কারণ বারে আমরাই নবাগত – আগন্তুক।

কিন্তু এর বিপত্তির দিকটা ও জানে না। আমরা ওর অচেনা, সুতরাং আমাদের শক্তি সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা নেই। ক্যাপ সয়্যার বৃদ্ধ হলেও সিংহের তেজ রাখে বাহুতে। দুঁদে মোষ শিকারী, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে অসংখ্য লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে। কিড নিউটনের মত বহু ছেলেকে মারা যেতে দেখেছে সে।

সম্ভবত আমিও দাগ কাটতে পারিনি ওর মনে। আমার হালকা-পাতলা গড়ন দেখে ভেবেছে সহজেই সামলানো যাবে। অথচ একটু খেয়াল করলেই দেখতে

পেত, আমার পিস্তলের বাঁট বহু-ব্যবহারে চকচকে।

কোনও ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়া আমার ইচ্ছে নয়। এমনিতেই বিগলোকে খুন করে একটা বিপদ ঘাড়ে নিয়েছি।

ক্যাপের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল নিউটন। 'ফরগেট ইট,' আবার বলল হবস।

'তোমার হয়েছেটা কী?' বিরক্তি প্রকাশ করল কিড। 'আমি খালি একটু মজা করব।' বেন ওর কানে কানে বলল কিছু, কিন্তু কিড আমল দিল না।

'এই যে, বুড়ো মিয়া! অমন হাভাতের মত খেও না – বদ-হজম হবে।'

ক্যাপ তার খাওয়া চালিয়ে গেল, মুখের পেশীতে সামান্য টান পড়ল কেবল। ধীরে ধীরে বাঁ-হাত নামালাম আমি, একটা পিস্তল বের করে রাখলাম টেবিলের ওপর।

এ-বার আমার দিকে তাকাল কিড, বেন হবসের চোখজোড়া ঈষৎ ছোট হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে আমাকে।

'ওটা দিয়ে কী হবে?' জিজ্ঞেস করল কিড।

অবাক হবার ভান করলাম আমি। 'আমাকে বলছ?'

'হ্যাঁ, পিস্তল বের করলে যে বড়?'

'অ। বিপদ-আপদে কাজ দেয় – সাপখোপের তো অভাব নেই।'

'কথাটা কি আমাকে বলছ?' কিডের স্বরে ঝাঁঝ।

'ছি-ছি, খোকা। তোমাকে কেন বলব।' জিভ কাটলাম আমি। ইচ্ছে করেই খোকা শব্দটার ওপর একটু চাপ দিয়েছি। জানি, উঠতি বয়েসের তরুণদের খোকা বললে তারা চটে যায়।

কিড নিউটন এই আচমকা খোকা সম্বোধনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঠাওর করতে পারছে না, আমি তাকে ঠাট্টা করছি কিনা।

'বাড়িতে তোমার মা আছেন নিশ্চয়ই,' আবার বললাম আমি। ওর দিকে তাকালাম অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে, তারপর এক টুকরো রুটি মুখে পুরে চিবুতে লাগলাম।

ওকে চিন্তাভাবনা করবার সুযোগ দিচ্ছি আমি, যখন বুঝলাম কিড কিছু বলতে চাইছে, হাত নেড়ে থামিয়ে দিলাম।

'তোমার খাওয়া হয়েছে, বাছা? না হয়ে থাকলে এসো – আমাদের সঙ্গে খাবে। গায়ে গরম জামা-কাপড় নেই দেখছি – শীতে কষ্ট পাবে তো।'

কিডের দিশেহারা অবস্থা, আবার লজ্জাও পাচ্ছে একটু একটু। সবাই মুখ টিপে হাসছে। নিশ্চয়ই ওর মন বলছে পিস্তল ওঠাও, অথচ একজন শুভাকাঙ্ক্ষীকে মারাটা শোভন দেখায় না। তাতে বরং ওরই ফেঁসে যাবার আশঙ্কা, একজন নিরীহ লোককে হত্যা করলে আইন ছাড়বে না তাকে। এ-ক্ষেত্রে পশ্চিমের লোকেরা নির্মম। তারা সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারে: কিন্তু বিনা কারণে কেউ কাউকে খুন করলে – হত্যাকারীকে দয়া দেখায় না। সকলে

তার বিপক্ষে চলে যায়।

'কই, বসো।' আমি চেয়ার এগিয়ে দিলাম। 'মনে হচ্ছে তুমি অনেকদিন বাড়ি ছাড়া, তোমার মা চিন্তা করছেন তোমার জন্যে।'

কিছু বলবার ইচ্ছে থাকলেও, কিডের মুখে কথা জোগাল না। আঁতিপাঁতি করে লাগসই জবাব খুঁজছে সে, অবশেষে অতিকষ্টে বলল, 'আমার খিদে নেই।'

'লজ্জা পাবার কী আছে, বাছা?' সস্নেহে বললাম আমি। 'আমাদের প্রচুর আছে। তা ছাড়া এই ক্যাপের কথাই ধরো,' মাথা ঝাঁকিয়ে দেখালাম সয়্যারকে, 'বহু দেশ ঘুরেছে ও। কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই তোমার মত ছেলে আছে ওর। তুমি খেলে ক্যাপেরও মন ভাল হবে।'

শব্দ করে হেসে উঠল কেউ, কিডের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'মানে?' চেঁচাতে গিয়ে ফাটা বাঁশির মত চিরে গেল ওর গলা, মুখ সাদা, শরীরের সমস্ত রক্ত চোখে এসে জমা হয়েছে।

'বারটেন্ডার,' নির্লিপ্ত গলায় বললাম আমি, 'এই ছেলেটিকে এক কাপ গরম সুপ দাও।' উঠে পড়লাম চেয়ার ঠেলে, হোলস্টারে রাখলাম পিস্তলটা। ক্যাপও উঠে দাঁড়িয়েছিল, দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। আমি বারটেন্ডারের হাতে আমাদের পাওনা ছাড়াও একটা বাড়তি সিকি দিলাম। 'এটা ওর সুপের দাম।'

তারপর ঘুরে কিডের দিকে নরম চোখে তাকালাম, করমর্দনের ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিলাম একটা হাত। 'চলি, বাছা। ন্যায়ের পথে থেকো সব সময়, তোমার মায়ের শিক্ষা ভুলো না।'

প্রায় যন্ত্রচালিতের মত আমার হাতটা ধরল কিড, পরমুহূর্তে ছিটকে সরে গেল যেন বিছায় কামড়েছে।

দরজার কাছে গিয়ে আমি আবার তাকালাম ওর দিকে। আমার চোখ এমনিতেই বড়, এ-বার সেগুলো ভীষণ হয়ে উঠল। 'বাছা, বেশি ঘোরাঘুরি কোরো না – ঠাণ্ডা লাগবে।' বলে পেছন ফিরে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

রাস্তায় নেমে আমরা আস্তাবলের উদ্দেশে রওনা হলাম। 'ক্লান্ত?' প্রশ্ন করলাম ক্যাপকে।

'নাহ,' বলল সে। তারপর যোগ করল, 'ওই ছেলেটিকে তুমি কিন্তু প্রকারান্তে বেজন্মা বলেছ।'

'ম্...তোমার ভাষাটা একটু কড়া হয়ে গেল, ক্যাপ। আমি পারতে কাউকে গাল দেই না।'

'তবু ব্যাপারটা আসলে তাই দাঁড়াচ্ছে একঘর লোকের সামনে ওকে তুমি বোকা বানিয়েছ।'

'নরম ব্যবহারে অনেক সময় কাজ দেয় – রাগ পানি হয়ে যায়,' হেসে জবাব দিলাম আমি

সে-রাতটা আমরা কোম্যাঞ্চে ক্রীকের জঙ্গলে অতিবাহিত করলাম। পরদিন সকালে অনেক বেলা করে উঠলাম ঘুম থেকে।

ক্রীকের পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে, গরুর জার্কি আর পাউরুটি সহযোগে নাস্তা সেরে ব্যাক ট্রেইল জরিপ করতে বসলাম।

একঘেয়ে প্রথম ঘণ্টা কাটল, তারপর দেখলাম ছজন ঘোড়সওয়ার যাচ্ছে উত্তরে। অবশ্যি এতে আমাদের ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই, ওরা আমাদের পিছু নিয়ে থাকলেও ট্র্যাক দেখতে পাবে না। এখানে আসবার পথে আমরা ক্রীক পাড়ি দিয়েছি। এতক্ষণে পানির স্রোতে ট্র্যাক ধুয়ে-মুছে গেছে।

দুপুর নাগাদ ফের স্যাডলে চাপলাম আমরা। উপত্যকার পুব ধার ঘেঁষে এগোলাম। এর ফলে গাছপালা, পাথরের পটভূমিতে সহজে আমাদের চেনা যাবে না। এই উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় নহাজার ফুট ওপরে। দিনে বাতাস এখানে শীতল, রাতে কনকনে।

ওই অচেনা অশ্বারোহীদের ট্র্যাক মাড়িয়ে আমরা কসটিয়া ক্রীকের ট্রেইল ধরলাম। এখান থেকে ক্যানিয়নের চড়াই শুরু। কসটিয়া ক্রীকে অশ্বারোহীরা ডানে মোড় নিয়েছে। ক্যাপের পরামর্শে বাঁয়ে একটা প্রাচীন ইন্ডিয়ান ট্রেইল বেছে নিলাম আমি।

আমরা যখন স্যান লুই শহরে পৌছুলাম তখন শেষ-বিকেল। সূর্য পাটে বসেছে। অস্তরাগে পশ্চিম আকাশ লাল। সেখানে দৈত্যাকার মেঘের বাড়ি-ঘর। পাখির কাকলিতে পরিবেশ মুখরিত, ওদের মাঝে ঘরে ফেরার তাড়া।

স্যান লুই ছোট্ট সাজানো শহর। অধিবাসীরা সবাই স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত। সহিসের কাছে মালপত্র রেখে মুদিখানার পানে এগিয়ে গেলাম আমি, ঠিক পেছনে ক্যাপ। মুদির নাম ডেভিড সালাযার। এই অঞ্চলের মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে আসে ওর কাছে। সংবাদের ঘাঁটিও বলা চলে দোকানটিকে। বহুকাল আগে গ্যালাওয়ে নামে এক লোক দোকানটা চালু করেছিল, পরে সালাযার কিনে নিয়েছে।

এরা বন্ধুবৎসল শান্তিপ্রিয় লোক। এখানে আছে অনেকদিন হলো। খেটে-খাওয়া মানুষ। সৎ, বিশ্বস্ত। মাল কিনছি আমরা, হঠাৎ একটা মেয়েলি গলা ভেসে এল, 'সিনর?'

ক্যাপ আর আমি একাযোগে ঘুরে দাঁড়ালাম; মেয়েটির লক্ষ্য সয়্যার। নাতিদীর্ঘ গড়ন। ঢলঢলে কমনীয় চেহারা, দীর্ঘ কালো চুল সেই শ্রী বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।

'বুয়েন্স ডায়াস, টিনা,' মেয়েটিকে চিনতে পেরে ক্যাপ বলল। 'বহুদিন পর, তাই না?' আমার দিকে ঘুরল সে। 'টিনা, এর নাম ওরিন ওসমান – নীলের বড় ভাই।'

'হাউডি, সিনর?' টিনার টানাটানা চোখে শ্রদ্ধা। 'তোমার ভাইয়ের কাছে আমি ঋণী। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

'নীল ভাল ছেলে।'

'সি...তাই।'

আমরা দাঁড়িয়ে গল্প করছি, এমন সময় এক মেক্সিক্যান যুবক এল।

চাবুকের মত স্বাস্থ্য, উঁচু কপাল, চৌকো মুখ, গভীর কালো চোখ। লম্বায় ক্যাপ সয়্যারের সমান, ওজনও প্রায় তাই হবে।

'আমার স্বামী, এসতেবান মেন্ডোযা।' স্প্যানিশ ভাষায় স্বামীর কাছে আমাদের পরিচয় দিল টিনা। সহাস্যে মেনডোযা হাত বাড়াল, দৃষ্টিতে বন্ধুসুলভ আমন্ত্রণ। তবে আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না, সময়ে এই লোক কঠোর হতেও জানে।

এসতেবান এককালে ভ্যাকুয়েরো ছিল। ভ্যাকুয়েরো মানে রক্ষী। ডাকসাইটে স্প্যানিশ জমিদারদের লাঠিয়াল। ডেল নর্তের পথে মালবাহী ওয়াগন আনা-নেয়া করেছে।

'বি কেয়ারফুল,' হুঁশিয়ার করে দিল সে। 'স্যান জুয়ানসে গোলমাল চলছে। ক্লিন্ট স্টকটন আছে ওখানে – সঙ্গে একদল আউট-ল।'

'আজকালের ভেতর অপরিচিত কাউকে দেখেছ?' ক্যাপ প্রশ্ন করল।

এসতেবানের মুখে চতুর হাসি ফুটে উঠল। 'সি। কাল রাতে। ছয়জন। একজন দাড়িওয়ালা। আরেকজন' – ঝিকিয়ে উঠল এসতেবানের মুক্তোর মত এক সারি দাঁত – 'দুটো পিস্তল ছিল লোকটার কোমরে।'

'তুমি না ছজনের কথা বললে?'

'তাই। ওদের মধ্যে দুজন তোমার চেয়ে তাগড়া, সিনর ওসমান। সোনালি চুল, ছোট ছোট চোখ। বেশ চওড়া চোয়াল। আমার ধারণা, ওদের নেতা ওই দুজনের মধ্যে কেউ হবে।'

'চেনো?' আমাকে প্রশ্ন করল ক্যাপ।

'না, ক্যাপ।' বললাম বটে, কিন্তু আমি তখন ভাবছিলাম বিগলোরা দেখতে কেমন।

এসতেবানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম-ধাম জানো কিছু?'

'না, সিনর। বেশিক্ষণ থাকেনি ওরা – নতুন কেউ এসেছিল কিনা তাই জানতে চেয়েছিল শুধু।'

লোকগুলো নির্ঘাত ভেবেছে আমরা পেছনে আছি, কিংবা আর কোনও ট্রেইল ধরেছি। কিন্তু ওরা পিছু নিয়েছে কেন? ডেল নর্তের পর পশ্চিমের ট্রেইল পাহাড়ী এলাকার ভেতর দিয়ে গেছে, উলফ ক্রীক পাস পেরিয়ে। অত্যন্ত দুর্গম পথ – খাড়া, সাপের মত আঁকাবাঁকা। ওখানে কেউ অ্যামবুশ করলে আমরা ফাঁদে আটকা পড়ব।

নেন্ডোযাদের বাসায় রাতের আহার করে আবার যাত্রা করলাম। ওদের সেবা-যত্নে আমি মুগ্ধ। প্রচুর সমাদর পেয়েছি স্বামী-স্ত্রী দুজনের কাছে। ওদের ছেলের মুখ দেখে আমি একটা গিনি উপহার দিয়েছি।

ওই ছজন ঘোড়সওয়ারের চিন্তা অহরহ পীড়ন করছে আমাকে। অনুভব করছি, ক্যাপকেও ভাবিয়ে তুলেছে ব্যাপারটা। আমরা যে-পথে যাচ্ছি, সেখানে ইন্ডিয়ান উৎপাত খুব বেশি। মূলত উতে অঞ্চল, তবে কোম্যাঞ্চেরা খানিকটা দখল করে নিয়েছে। উতেদের আদিনিবাস ব্ল্যাক হিলস। স্যু ইন্ডিয়ানদের তাড়া

খেয়ে দক্ষিণে চলে এসেছে। কিন্তু এখানেও শান্তি পায়নি, কিওয়া গোত্রের সঙ্গে লড়াইতে জড়িয়ে পড়েছে। কিওয়াদের রক্তপিপাসার খ্যাতি আছে। শ্বেতাঙ্গরা ওদের হাতেই নিহত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

উতে আর কোম্যাঞ্চে গোত্র গোড়ায় পরস্পর মিত্র ছিল। এদের শিরায় একই রক্ত বইছে – শো-শোন। পরে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। শ্বেতাঙ্গরা আসবার আগে ইন্ডিয়ানরা অন্তর্কলহে লিপ্ত ছিল। এর ব্যতিক্রম ইরাকুই গোত্র। পুবে রোমান সাম্রাজ্যের চাইতেও এক বিশাল এলাকা জয় করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল এরা। বহুদিন অক্ষুণ্ন ছিল সেই শান্তি।

আমরা রিও গ্র্যান্ডের উজানে উঠছি। চারিদিকে পাইন-সিডারের ঝোপ, সকালে সোনা-রোদে আরও সোনালি দেখায়। মৃদু হাওয়ায় যখন গাছের পাতা দোলে, আমার অন্তর হু-হু করে ওঠে। টেক্সাসে এই নদীর পাড়েই কোম্যাঞ্চে আর আউট-লদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করেছি, মনে পড়ে সে-সব স্মৃতি।

একে একে অনেকগুলো রাত পেরিয়ে গেল। আমাদের ক্যাম্পফায়ারের ধোঁয়া মিতালি পাতায় তারার সাথে। আর কোনও ট্র্যাক দেখতে পাইনি। নিঃসঙ্গ তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ অটল দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে।

ক্যাপ সয়্যার যেন আলাদা এক মানুষে পরিণত হয়েছে। আগের চেয়ে শান্ত, তবু মাঝে মাঝে রাত্রিতে ওকে এমন কথার নেশায় পেয়ে বসে যে আমি রীতিমত বিস্মিত হই। আমার মনেও পরিবর্তন এসেছে। রাতে, বাতাস যখন অ্যাসপেন পাইন ও সিডারের গন্ধে ম-ম, হিম আর আগুনের ভাপে ভারি, আমি ব্ল্যাকস্টোন খুলে বসি।

অবশেষে আমরা বিয়র ক্রীকের ভাটিতে ভ্যালেসাইটোস ক্যানিয়নে পৌঁছুলাম। আমাদের পশ্চিমে স্যান জুয়ান রেঞ্জ – গ্রেনাডিয়ার ও নিডল মাউন্টিন্সের গগনচুম্বী শৃঙ্গ। ক্যাম্প করলাম একটা ঝরনার ধারে। ওপরে, চুড়োর দিকে তাকাতে সেই ভৌতিক অনুভূতিটা আবার ফিরে এল আমার মাঝে। হরিণের মাংস ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলাম গাছের ডালে – কে খেয়েছে সেটা?

ক্যাপ ক্রীকে নামল, হাতে একটা প্যান। সন্ধ্যের একটু আগে উঠে এল, প্যানটা ধুয়ে বসল আগুনের কাছে এসে।

প্যানের গায়ে স্বর্ণকুচি লেগে রয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এ-জায়গার দখল নেব।

সাত

বিপদ মোকাবেলায় তৈরি হচ্ছি আমরা।

আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে, দুদিন আগে বা পরে ঠিকই খুঁজে পাবে। তা

ছাড়া উতেদের মতিগতি বোঝা ভার। এখানে আসবার পথে আমি চিন্তা করবার সময় পেয়েছি: সোনা যখন পাওয়া গেছে, মানুষ আসবেই। ফলে ঝামেলা একটা হবে। সাথে সাথে এও বুঝতে পারছি যে, ভাল কাজও হবে কিছু। যত ভাবছি, ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছে, সোনা অনুসন্ধানীর চেয়ে ব্যবসায়ীর লাভের অঙ্ক বেশি। স্বর্ণতৃষার ঝুঁকি আছে, এ-ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী অনেক নিরাপদ।

আমরা যে-ঝরনার পাড়ে ক্যাম্প করেছি, তার উৎস পাহাড়ে। আমার বিশ্বাস, এই ঝরনা অনুসরণ করেই খনির সন্ধান পেয়েছিলাম আমি। ক্যাম্পটা ক্যানিয়নের ওপর দিকে একটা চাতাল মত জায়গায়। পেছনে এবং পুবে, দুরারোহ পাহাড়ী ঢাল। চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো পনডেরোসা পাইন, ডগলাস ফারের ঝোপ।

প্রথমে দড়ির সাহায্যে মরা গাছের গুঁড়ি টেনে আনলাম আমরা, গাছগাছালির ফাঁকে কেবিনের দেয়াল তুললাম সেগুলো দিয়ে। তারপর পাইনের খুঁটি পুঁতে কোরাল বানালাম। খুঁটিগুলোর মাথা বেঁধে দিলাম গাছের ডালপালার সাথে। কাজটা, সন্দেহ নেই, কঠিন – তবে আমরা দুজনেই এ-ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ বলে নির্বিঘ্নে সমাধা হলো সব কিছু।

সন্ধ্যের দিকে চাতালের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। উত্তরে বিরাট খোলা প্রান্তর। ভ্যালেসাইটোস ক্যানিয়নে এতখানি ফাঁকা জায়গা ইতিপূর্বে আমাদের চোখে পড়েনি। জায়গাটা আমাদের ক্যাম্প থেকে মাইলখানেক দূরে।

'ওখানেই শহর হবে,' বললাম আমি।

মুখ থেকে পাইপ নামাল ক্যাপ। 'শহর?'

'সোনা যখন আছে, ক্যাপ, মানুষ আসবে। আর মানুষ এলে, তার চাহিদাও আসবে। আমরা দোকান খুলে ওদের চাহিদা মেটাব।'

ক্যাপ হাসল। 'আবার যেন ভেবে বসো না, দোকানটা আমি-ই খুলব।'

'আমিও না, ক্যাপ। শহরটা কোথায় হবে ঠিক করে অপেক্ষা করব আমরা – তুমি আর আমি। তারপর ভাল কোনও লোক পেলে, পাব আমি নিশ্চিত, তাকে বসিয়ে দেব কারবারে।'

'তোমরা খুব কাজের লোক,' সপ্রশংস গলায় বলল ক্যাপ। 'একবার পাহাড় ছেড়ে বেরোলে তুফান ছুটিয়ে দাও। শুধু একটা ব্যাপারে আমার খটকা রয়ে গেছে এখনও – অ্যাদ্দিন তোমরা কীসের মায়ায় ছিলে ওখানে?'

পরের কটা দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করলাম। প্রায় চারশো গজ লম্বা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তৈরি করলাম শহরের ছক। মুদিখানা, লিভারি স্ট্যাবল, হোটেল, বোর্ডিং হাউস এবং দুটো স্যালুন থাকবে। কামারশালায় একজন ধাতু পরীক্ষকের বসবার ব্যবস্থাও রইল।

মুদিখানা যেখানে হবে, তক্তা কেটে নিয়ে গেলাম সেখানে। একটা সাইনবোর্ড বসিয়ে দিলাম রাস্তায়, লোকজন এলে বুঝতে পারবে কোথায় পাওয়া যাবে আমাদের। পাশাপাশি নিজেদের ক্লেইমেও কাজ করছি। দিনে দুপ্যান করে

বালু ছাঁকছি। সোনার গুঁড়ো পেয়েছি আরও – যদিও পরিমাণ খুব অল্প।

আরও মজবুত করেছি কেল্লা। অবশ্যি বাইরে থেকে বোঝা যাবে না, আমরাও তা চাই না, তবে হামলা হলে মোটামুটি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারব।

আমাদের পড়শীদের প্রতি আমাদের কারোরই বিশেষ আস্থা নেই। শান্তির কথা পুবের লোকদের মুখে শোভা পায়। একটা সাজানো-গোছানো সমাজে বাস করে ওরা। ঝামেলা পোয়াতে হয় না, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধলে সামলাবার জন্যে পুলিস রয়েছে। পশ্চিমে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে, এ-কথা বলে ড্রইংরুমে কফির কাপে ঝড় তোলা ওদের পক্ষে সহজ। কারণ ওরা কখনও ইন্ডিয়ান হামলার শিকার হয়নি, লাল পিঁপড়ের ঢিপির সামনে পুড়িয়ে মারেনি ওদের কোনও বন্ধুকে। অন্তত আমার তাই মনে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি ইন্ডিয়ানদের শ্রদ্ধা করি। ওদের জীবনযাত্রা আমাদের মত নয়। অনেকে ইন্ডিয়ানদের কিছু কিছু গুণের কথা বলে; এগুলোর স্বপ্নই কেবল দেখে এসেছে শ্বেতাঙ্গরা, অথচ ইন্ডিয়ানদের কাছে সে-সবের তেমন কদর নেই। প্রকৃতির সহজ নিয়মে ওগুলো অর্জন করেছে ওরা – শেখার জন্যে কসরত করতে হয়নি। দয়ামায়া, অনুকম্পা বলে কিছু নেই ওদের।

মানব স্বভাবের কথা বলতে গিয়ে বড় বড় দার্শনিকেরা যা বোঝান, আসলে তা স্বভাব নয়; মানুষের জীবনপ্রণালী – তার সমাজ ব্যবস্থা। আমার ধারণা ক্রিশ্চান ভাবধারায় যারা মানুষ হয়েছে, নরহত্যাকে তারা পাপ বলে মনে করে। অথচ ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অপরিচিত লোক মানেই তার কাছে শত্রু। কেউ উপহার, উপঢৌকন দিলে মনে করে, ভয় পায় বলেই দিচ্ছে।

ওরা যোদ্ধা জাত। লড়াই ওদের পেশা, আনন্দের সেরা মাধ্যম। আমাদের সমাজে সব ধরনের ক্রীড়াবিদের সম্মান আছে, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা শ্রদ্ধা করে একমাত্র লড়াকু মানুষকে।

নিঝুম পরিবেশ। ধোঁয়া উঠছে। থেকে থেকে কাঁপছে শিখা। বহুদূরে তারস্বরে চিৎকার করছে কয়েকটা কয়োট। চুপচাপ মাটিতে শুয়ে আকাশের তারা গুনছে ক্যাপ সয়্যার। এই লোকটির নিরাভরণ অথচ অগাধ জ্ঞানের সামনে শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে আমার। পশ্চিমে ক্যাপ বহুদিন হলো আছে। এখানকার রীতি-নীতি, ভাবধারা মিশে আছে ওর অস্থিমজ্জায়। বাবার সঙ্গে ক্যাপের মিল খুঁজে পাই আমি। তেমনি সরল, সাদাসিধে অথচ সদাসতর্ক, সাহসী।

ইন্ডিয়ানরা আগে তাদের শরীরের যত্ন নিত, ক্যাপের কাছেই জানলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত, স্নান করত নিয়মিত। শ্বেতাঙ্গরা এসে ওদের নিয়মকানুন উল্টে দিয়েছে। আকণ্ঠ সুরাপানের অভ্যাস আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে তলিয়ে গেছে ওরা। তবে ওদের সম্পর্কে সভ্যজগতের যে-ধারণা, কোনও ইন্ডিয়ান যোদ্ধা তা জানলে রীতিমত লজ্জা পাবে। সে তার শক্তি নিয়ে গর্ব করে – নিজের সমস্যা মোকাবেলার ক্ষমতা তার আছে।

ক্রমে রাত গভীর হচ্ছে, ঘুমে বুজে আসছে আমার দুচোখের পাতা। শুধু

একটি ভাবনাই আলোড়িত হচ্ছে মাথায়: পাহাড়ের ওপরে কী আছে? আমার মাংস চুরি করেছিল কে?

রোববার। আমরা প্রথম গোলমালের আভাস পেলাম। ছুটির দিন, আমাদের ব্যস্ততা নেই। গুটিকতক এলক আর হরিণের চামড়া শুকোচ্ছে ক্যাপ। নাস্তা সেরে আমার অস্ত্রশস্ত্রে তেল দিয়েছি আমি; বড়শি ফেলে ঝরনায় মাছ ধরেছি কিছুক্ষণ, তারপর পড়তে বসেছি।

উষ্ণ অলস দিন, ক্রীকের পানিতে রোদ্দূর ঝিলিক মারছে, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় মাথার ওপর কাঁপছে পাইন গাছ। আমার মন আজ বিক্ষিপ্ত, বইয়ের পাতা থেকে বারেবারে উধাও হয়ে যাচ্ছে ওপরের ওই উপত্যকায়। খনি থেকে সোনা আনতে হলে, তুষারপাত শুরু হবার আগেই ওখানে ঢোকার বিকল্প রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে।

'ওরিন...'

নিচু স্বরে ডাক দিল ক্যাপ, আমি উঠে ওর কাছে গেলাম। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে ও। চারজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পাচ্ছি, টাউন সাইটে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে ঘুরল, আমি চোখে ফিল্ড গ্লাস লাগালাম। ওদের কাউকেই পরিচিত ঠেকল না। ধীরে-সুস্থে এগিয়ে আসছে এক লাইনে, সারির শেষ লোকটি তার পিস্তল পরখ করছে।

ঝরনার ভাটিতে, পঞ্চাশ গজ বা তার কিছু বেশি হবে, রাশ টানল ওরা। আমাদের কোরাল আর আগুনের ধোঁয়া চোখে পড়েছে। পরক্ষণে এগিয়ে এল।

আমার পরনে রঙ-জ্বলা নীল আর্মি শার্ট এবং জিন্স, মাথায় তোবড়ানো ইউ.এস. আর্মি ক্যাপ, কোমরে পিস্তল। ওদের আসতে দেখে উইনচেস্টারখানা তুলে নিলাম, তারপর ক্যাপকে সঙ্গে করে দাঁড়িয়ে রইলাম অভ্যর্থনা জানাতে।

'কী চাই?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এ-দিকে লোকজন বড় আসে না।'

'শহরের সাইনবোর্ডটা দেখে মনে হলো তোমরা চাও আসুক,' বলল ওদের মধ্যে একজন। 'তা এখানে শহর দিয়ে হবেটা কী?'

'স্যার,' বললাম আমি, 'এটা আমাদের সুবিধের জন্যে করেছি। কাজ কাম সারা হলে সন্ধ্যের পর ক্যাপ সয়্যার আর আমি শহরে যাব। অথচ কাছেপিঠে একটাও নেই, তাই ভাবলাম আমরা নিজেরাই কেন গড়ে নিই না। শহরের নকশা, কাঠ জোগাড় সব শেষ। ইলেকশনও করেছি।'

'ইলেকশন?'

'যেহেতু শহর, মেয়র চাই একজন। ক্যাপ মেয়র নির্বাচিত হয়েছে। ও আগে কোনও দিন মেয়র হয়নি, আর এই শহরেও মেয়র ছিল না কখনও। তাই ঠিক করলাম, একই সঙ্গে ওদের যাত্রা শুরু হোক।'

কথা বলার পাশাপাশি ওদের ওপর নজর রাখছি আমি। একটা ঘোড়ায় পিচফর্ক মার্কা লাগানো। সওয়ারির বপুখানা বিশাল, চৌকো মুখ, ঘন সোনালি

চুল। আমাকে জরিপ করছে সে, তালি-মারা ইউনিফর্মটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।
দ্বিতীয়জন একটু কুঁজো মত কালো বর্তুল চোখ। তিন নম্বর অশ্বারোহীর পেটা শরীর, অমায়িক বন্ধুসুলভ চেহারা। চতুর্থজন মোটা, কুমড়োর মত মুখ – গোমড়া চেহারা।
'যুদ্ধ শেষ, অথচ ইউনিফর্ম ছাড়োনি,' বলল বিশাল-বপু, 'ওটা বুঝি তোমার খুব পছন্দ?'
'নতুন কেনার সামর্থ্য,' বললাম আমি।
ঘোড়া চালিয়ে ক্রীকের পাড়ে গেল কুমড়ো, তারপর পেছন ফিরে ডাকল, 'কিচ, দেখে যাও!'
ওরা সবাই গেল ঝরনার ধারে, ক্যাপ আর আমি অনুসরণ করলাম।
আমাদের শ্যাফটের দিকে তাকাল কিচ, অর্থাৎ বিশাল-বপু। 'সোনা?' বিস্ময়ের সুর ফুটল ওর গলায়। 'এটা তো রূপার দেশ।'
'সামান্য কিছু গুঁড়ো পেয়েছি,' বললাম আমি। 'তবে আমরা হাল ছাড়িনি।'
আমাদের পাত্তা দিল না কুমড়ো। 'কিচ,' বলল সে, 'এখানে দামী জিনিস পেয়েছে এরা। তাই শহর বানিয়েছে। খবর পেলেই লোকজন ছুটে আসবে পাগলের মত – তখন খোদ শহরটাই একটা সোনার খনি হয়ে উঠবে।'
'কচু হবে,' বলল ক্যাপ। 'আমাদেরই খাটুনি পোষাচ্ছে না।' ঘুরল সে। 'যাই, আমি কফির জোগাড় করিগে, ওরিন।' বলে আগুনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।
নামটা কানে যেতেই ঝট করে আমার দিকে ফিরল কিচ। 'ওরিন? তুমি ওরিন ওসমান?'
'হ্যাঁ।'
খিকখিক করে হাসল সে। 'শিগগিরই তোমার কিছু সঙ্গী জুটবে সিলভারটনে দুজন লোক তোমাকে খুঁজছিল।'
'এখানে এলেই পাবে।'
'ওরা বলল তুমি নাকি দারুণ ছুটতে পার।' কিচের চোখে শয়তানি। 'ওই পোশাকে অবশ্যি অনেককে ছুটতে দেখেছি আমি।'
'সে তো এডওআর্ড লীর সারেন্ডার দেখতে,' বললাম আমি। 'তারপর থেকে সব ছোটাছুটি বন্ধ।'
মুখ খুলতে নিয়েছিল কিচ, চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, কানের লতি লাল।
'বিগলোরা বলছে ওরা যতবার তোমার পিছু নিয়েছে, তুমি ল্যাজ তুলে খরগোশের মত পালিয়েছ,' একটুবাদে বলল।
ওরিন ওসমান, আপনমনে বললাম, এ-লোক তোমায় লড়াইতে নামাতে চাইছে। সাবধান – খুব সাবধান। 'আমাকে কেউ খুন করতে চাইলে,' মুখে বললাম, 'তাকে খাটতে হবে। আমার অত সময় নেই যে নষ্ট করব।'
ক্যাপ আগুনের কাছে কাঠের গাদার আড়ালে আছে, সেখানে ও কী করছে আমি ভালই জানি।

'শোনো,' কিচ কিছু বলবার আগেই আমি শুরু করলাম, 'সিলভারটনে ফিরে গিয়ে তুমি বিগলোদের বলবে, আমি এখানে আছি। বলবে, ওদের ভাই তাস চুরি করেছিল বলে মারা গেছে। এরপরেও যদি ওদের লাগার শখ থাকে, যেন চলে আসে।'

তারপর আরও ঠাণ্ডা গলায় যোগ করলাম, 'কিচ, তুমি পালানোর কথা কী যেন বলছিলে? ওদের সঙ্গে তুমিও এসো–'

চমকে উঠল কিচ, রাগে কামড়ে ধরল ঠোঁট। কিন্তু কুমড়ো বাধা দিল। 'চলো, চলো।'

রওনা হলো ওরা। কেবল পেটা-শরীর দাঁড়িয়ে রইল। 'মি. ওসমান,' বলল সে, 'আমি আবার আসব – তোমার সাথে কথা আছে।'

'যখন খুশি,' বললাম আমি।

আমাদের ক্লেইমে কাজ করছি আমরা, কিছু সোনা উদ্ধার করেছি, দোলনা বানিয়েছি একটা। ইতিমধ্যে আমাদের ক্যাম্পের পেছনে, পাহাড়ের খাড়া ঢালে একটা গোপন ট্রেইল খুঁজে পেয়েছি আমি, বোধ হয় এককালে পাহাড়ী ছাগল চলাচল করত। ওই ট্রেইল ধরে চাতালের প্রায় দুশো ফুট ওপরে গাছের গুঁড়ি, পাথর আর ডালপালা দিয়ে একটা রাইফেল-পিট তৈরি করেছি – এখান থেকে দু-তিনজন লোক অনায়াসে আমাদের ক্যাম্পের চারদিক কভার করতে পারবে।

পরের দিন, বারকয়েক ওঠানামা করে ট্রেইলটাকে সাফ করলাম ভালমত। এই সময় পাহাড়ের আরও ওপরে ওঠার একটা রাস্তা পেয়ে গেলাম।

'ব্যাপার কী?' সাপারের পর জিজ্ঞেস করল ক্যাপ।

'একান্তই যদি পালাতে হয়,' বললাম, 'আমি চাই না পথে কোনও বাধা থাকুক।'

আগুন পোয়াতে পোয়াতে ক্যাপ তাকাল আমার দিকে। 'তা পাহাড়ে কবে যাচ্ছ?'

'তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে?'

'বাদ দাও।' বাতাসে হাত খেলাল ক্যাপ। 'বিপদ আমার জীবনে নতুন কিছু নয়। তুমি যাও – তবে বেশি দেরি কোরো না।'

ওকে বললাম, এই ক্যাম্প থেকে খনিতে কোন পথে যেতে হবে আমি জানি না। তবে বুঝতে পারছি ওটার খুব কাছাকাছি রয়েছি।

ক্যাপ বলল আমার বর্ণনা শুনে ওর মনে হয়েছে, আগের বার আমি কলামবাইন পাস পেরিয়ে, জনসন ক্রীকের পথে ভ্যালেসাইটোসে এসেছিলাম। ওটা এখন আমাদের দক্ষিণে, তাই আমি দক্ষিণে রওনা হলে হয়তো রাস্তা খুঁজে পাব।

ক্যাপকে একা রেখে যেতে সায় দিচ্ছে না মন। জানি ও একটা পোড়-খাওয়া নেকড়ে, কিন্তু চারপাশে আমার শত্রুও নেহাত কম নয়। বিগলোরা তো আছেই, তার ওপর রয়েছে বেন হবস, কিড নিউটন। লাস ভেগাসে টুথহিল আর তার সেই জুয়াড়ি বন্ধুর কথা না হয় বাদই দিলাম। মনে হচ্ছে বিপদ তার

সবগুলো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে আমাকে।

পক্ষান্তরে, ক্যাপের কাছে যথেষ্ট কার্তুজ আর মাংস আছে। ঝরনা থাকায় পানির অভাব হবে না। একেবারে বেকায়দায় না পড়লে, কয়েকজনকে ও একাই সামলাতে পারবে। তা ছাড়া, আমরা সে-রকম বিপদের আশঙ্কা করছি না।

বাড়ির কথা মনে পড়ল আমার। রোসাবেলার সাথে সুখের সংসার পেতেছে ও'নীল। বেলা ওকে সত্যিই ভালবাসে। ওই রকম মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আচ্ছা, আমার প্রেমিকা কেমন হবে? কথাটা ভাবতেই হাসি পেল। সজ্ঞানে কোনও মেয়ে আমার মত ছন্নছাড়ার প্রেমে পড়বে বলে মনে হয় না। বরং ঠিক এর উল্টোটি, সারাজীবন ব্যাচেলর রয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। খুব জোর একটা ঘোড়া হয়তো সাথী হবে।

শুকনো কাঠ পোড়ার গন্ধ আসছে, পাইন বনের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে, আকাশে তারার শামিয়ানা। সহসা বাতাসে হা-হা করে উঠল অ্যাসপেন ঝোপ। পশ্চিমে নিডল মাউন্টিনসকে দেখাচ্ছে বিশাল তুষারমানবের মত।

আচমকা উঠে বসলাম আমি। 'ক্যাপ!' বললাম ফিসফিস করে। 'শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

'কেউ কাঁদছে।' আমি উঠে বুটজোড়া গলিয়ে দিলাম পায়ে। আওয়াজটা থেমে গেছে, উজানি বাতাসের সঙ্গে কোথাও থেকে ভেসে এসেছিল।

বনের কিনারে হেঁটে গিয়ে কান পাতলাম আমরা, কিন্তু আর শুনতে পেলাম না। মুখের কাছে দুহাত চোঙের মত করে ধরলাম আমি, ঈষৎ গলা চড়িয়ে বললাম, 'ক্যাম্পে এসো! ওখানে একা থাকার দরকার নেই!'

'একা – তুমি জানলে কীভাবে?' মোলায়েম সুরে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ। 'এসো, ঘুমুবে। ভূত বিশ্বাস করো তুমি? সব বাতাসের চালাকি – হুঁ।'

আর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে অনুসরণ করলাম ক্যাপকে, আগুনের কাছে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বহুক্ষণ চোখ খোলা রইল আমার, কিন্তু রাত বয়ে চলল মৌনভাবে।

হয়তো ক্যাপের কথাই যথার্থ, সবই বাতাসের কারসাজি। তবু খুঁতখুঁতি গেল না।

আট

আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা আদৌ বাতাসের কারসাজি নয়। ওই পাহাড়গুলোতে কিছু একটা...বা কোনও মানুষ আছে...

ভোরের আগেই আমি পাহাড়ে রওনা হলাম। যেখানে যাচ্ছি সেখানে

কোনও ট্রেইল নেই। দক্ষিণে আছে, কিন্তু আমি সরে গেছি। বনের ভেতর বেশ কিছুটা গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে মোকাসিন পায়ে দিলাম। পিছিয়ে এসে মুছে ফেললাম ট্র্যাক, তারপর ফের স্যাডলে চেপে রওনা হলাম ওপর দিকে।

ঘন পাইন বন। রাস্তা প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে ডালপালার তলা দিয়ে যাবার সময় কুঁজো হচ্ছি। কখনও-বা হাঁটছি নরম পাইন পাতার ওপর দিয়ে, হাতে অ্যাপালুসার লাগাম।

যে-গিরিপথে ঢুকেছিলাম গেলবার, তার কাছাকাছি কোথাও বেরোব বলে অনুমান করেছিলাম। বাস্তবিক তাই ঘটল। একটা খাঁজের মাথায় উঠে এলাম আমি, চারদিক দেখা যায় এখান থেকে।

উত্তরে স্টর্ম কিং, বিশাল চুড়ো, বরফের ওপর উজ্জ্বল রোদের চোখ ধাঁধানো প্রতিফলন। সটান নীচে নেমে গেছে ভ্যালেসাইটোস ক্যানিয়ন। ডানে, যোজনবিস্তৃত রুক্ষ প্রান্তর। এ-রকম এবড়োখেবড়ো এলাকা জীবনে দেখিনি।

ভূতুড়ে ডোবাটার উদ্দেশে এগিয়ে গেলাম। অবিকল আগের মতই আছে। পানিতে ডুবে গেছে ট্রেইল। আমি চলে আসবার পর বৃষ্টি হয়েছিল, ডোবার আয়তন একরখানেক বেড়েছে।

নীচে যাবার ট্রেইলের অবস্থাও তথৈবচ। বরং এখানে পানি একটু বেশিই হবে, তবে ব্যবহারযোগ্য। নির্জন উপত্যকায় পৌছে মনে হলো আমি যেন নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছি।

যে-গাছে মাংস ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, সেখানে গেলাম প্রথমে। মাংস উধাও, একটা হাড়গোড় নেই, অথচ কোনও হিংস্র জন্তু নিয়ে থাকলে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। ট্র্যাক নেই। পড়ে থাকলেও বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে-মুছে গেছে।

এরপর খনিতে গিয়ে জরিপ করলাম চারদিক। যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনি আছে। ঘুরে-ফিরে দেখতে বেরোলাম উপত্যকাটা। উদ্দেশ্য, এখানে ঢোকার বিকল্প রাস্তা সন্ধান করব। দেখলাম, জলপ্রপাত থেকে যে-ঝরনার উৎপত্তি, আসলে সেটা উত্তর দিকে গেছে। তারপর পশ্চিমে একটা বাঁক নিয়ে সোজা নেমে গেছে ভ্যালেসাইটোসে। এ-বার বুঝতে পারলাম, ক্যাপ আর আমি যেখানে ক্যাম্প করেছি, সেটা আসলে অন্য একটা ঝরনা।

আবছা একটা ট্রেইল, সম্ভবত প্রাচীন ইন্ডিয়ানদের, পুবে চলে গেছে। দূরে আরও কয়েকটা ডোবা নজরে পড়ল আমার। আশপাশ ভালমত দেখতে খাঁজের মাথায় উঠে এলাম। এই উপত্যকার উল্টোদিকে পাহাড়, তার পেছনে আরেকটা বিশাল উপত্যকা – অনেক উঁচু। সেখানে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে উত্তরে।

পাহাড়ের কিনারে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অল্পস্বল্প ঘাস। উপত্যকার নীচে তৃণভূমি। গ্রীষ্মে এই জায়গাটা চমৎকার রেঞ্জ হতে পারে, ভাবলাম।

পরক্ষণে ও-সব চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করলাম মাথা থেকে। এখন আমার প্রথম দায়িত্ব ভ্যালেসাইটোসে নামার নতুন ট্রেইল খোঁজা এবং সম্ভব হলে, আমার মাংস কে চুরি করেছিল তা জানা।

উত্তরে যাবার সময় শেষ সীমানার দিকে তাকালাম। মনে হলো বেরোনোর কোনও পথ নেই, কিন্তু আরেকটু এগোতে আবিষ্কার করলাম তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে একটা জঙ্গলের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে উপত্যকাটা। বাঁক আর জঙ্গলের মধ্যবর্তী এলাকা সরু করিডরের মত।

এখানে ঝোপঝাড়ের গোড়ায় তাজা পায়ের ছাপ চোখে পড়ল।

নেমে অনুসরণ করলাম অস্পষ্ট ছাপগুলো। দু-এক জায়গায় দুমড়ে আছে ঘাস। এর অর্থ, আজ ভোরে শিশির থাকা অবস্থায় মাড়ানো হয়েছে। হঠাৎ একটা ফাঁদ চোখে পড়ল। আশপাশে অসংখ্য পায়ের ছাপ, তবে রক্তের দাগ বা লোম-টোম নেই। বোঝাই যায়, ফাঁদে আটকা পড়েনি কেউ। গোড়ালিতে ভর রেখে বসলাম আমি, দেখলাম খুঁটিয়ে। চাতুর্যের ছাপ আছে: এ-রকম ফাঁদ আগে কখনও দেখিনি।

গাছপালার পেছনে তৃণভূমিতে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম আমি। সূর্যমুখী ফুলে ছেয়ে আছে মাঠ। উজ্জ্বল হলুদ, হাওয়ায় নাচছে। ঢালের এখানে-সেখানে প্রিমরোজ। নীল দেবদারুর সংখ্যাই বেশি, অ্যাসপেন আছে দু-চারটে। ওপর দিকে, জঙ্গলের কিনারে, কাঁটাওয়ালা পাইন, দেখতে মোচার মত, বাতাসের সাথে অন্তহীন লড়াইতে বেঁটে হয়ে গেছে।

দেখলাম, আমার সেই অজ্ঞাতনামা মানুষটি এক জায়গায় থেমে ভেষজ লতাগুল্ম সংগ্রহ করেছে মাটি থেকে, অন্যত্র ঝরনায় নেমে পানি খেয়েছে। হঠাৎ একখানে এসে শেষ হয়ে গেল ট্র্যাক। লোকটা এরপর একটা বিরাট পাথর-চাঁইয়ের ওপর উঠে পড়েছে। মোকাসিনের ঘষায় পাথরের গায়ে ঘাসের দাগ লেগেছে। বুঝলাম, ওই অজ্ঞাতনামা দেখতে পেয়েছে আমাকে।

চাঁইয়ের মাথায় উঠে পেছনে তাকালাম আমি। স্পষ্ট দেখা যায় আমার ব্যাক ট্রেইল। গোটা এলাকা জরিপ করতে বসলাম ওখানে। আমার অনুমানে ভুল হয়ে না থাকলে, ওই লোক কাছে-পিঠে কোথাও আছে, নজর রাখছে আমার ওপর। আমিও তাই চাই: এতে অন্তত বোঝার সুযোগ পাবে যে আমার কোনও কুমতলব নেই।

একটুবাদে ফিরে গেলাম ঘোড়ার কাছে। কচি ঘাস চিবোচ্ছে। একটা ক্ষীণ জলধারা পেরিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে এলাম আমি। গুটিকতক ব্রিসল-কন পাইন, বাজ-পড়া গাছ আর নুড়িপাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

আমার ডানে, সামান্য আগে, একটা ঝরনা – উত্তরপুবদিকে পাহাড় বেয়ে নেমে গেছে। মনে হলো, এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার আরেকটা রাস্তা পেয়ে গেছি।

অ্যাপালুসাকে চলার নির্দেশ দিলাম ও কান খাড়া করল। ঘোড়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে নড়াচড়া চোখে পড়ল আমার। দূরবর্তী একটা ঢালে অ্যাসপেন ঝোপ, তার প্রান্তে কেউ বসেছিল, কিন্তু আমি দূরবীন তোলার আগেই পালিয়ে গেল।

পথে আরেক জায়গায় ট্র্যাক চোখে পড়ল – গলা-বরফের পাশে কেউ হাঁটু গেড়ে বসেছিল, নিঃসন্দেহে পানি খেতে। গত দুঘণ্টায় তিনবার পানি খেয়েছে ওই লোক। আমার কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকল। এটা পাহাড়ী এলাকা, বাতাসে জলীয়বাষ্প প্রচুর। তা ছাড়া, আবহাওয়া তেমন গরম নয়।

বিস্মিত মনে রওনা হলাম আবার। এবং ঠিক তখুনি পরিষ্কার চোখে পড়ল ট্র্যাকগুলো। লোকটা যেই হোক, সোজা কোনও গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে। তাড়া আছে ওর, ট্র্যাক লুকোনোর সময় পায়নি।

আরেকটু যেতে মাটিতে আছাড় খাওয়ার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

অসুস্থ...ঘন ঘন পানি খাচ্ছে তার কারণ লোকটা জ্বরে ভুগছে। এবং সম্ভবত ওর সঙ্গে কেউ নেই।

একা।

হারিয়ে গেল ট্র্যাক। কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজি করেও কোনও ছাপ চোখে পড়ল না। এ-বার অনুমানের ভিত্তিতে এগোতে হবে, লোকটা পাথুরে রাজ্যে চলে গেছে।

আঁধার ঘনিয়ে আসছে। রাতে এই পাহাড় থেকে নামা অসম্ভব। মাঝে মাঝে থামছি, কান খাড়া, ধোঁয়ার সন্ধানে তাকাচ্ছি ইতিউতি। লোকটা পাথর আর বাজ-পড়া গাছগাছালির আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে।

দূরদিগন্তে ঘনীভূত হচ্ছে কালো মেঘ। বজ্রবৃষ্টি হলে নরকে পরিণত হবে -জায়গা। যে-কোনও উপায়ে আমাকে নেমে যেতে হবে তাড়াতাড়ি। ইতিপূর্বে বারদুয়েক পাহাড়ী এলাকায় ঝড়ের মুখে পড়েছি, তবে সেগুলো এত উঁচু ছিল না। বিজলি চমকাচ্ছে, চিরে দিচ্ছে আকাশটাকে। নীল শিখা দেখা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে।

বোল্ডার তো নয় যেন একটা নরক। বড় বড় পাথরখণ্ড, ছুরির ফলার মত ছুঁচোল। যেন সারি সারি ভাঙা মাঢ়ীর দাঁত, পোকায়-খাওয়া। সামনে একটা ক্যানিয়ন ঝুপ করে নেমে গেছে প্রায় পাঁচশো ফুট। বাঁয়ে ভ্রূর মত ট্রেইল।

এই ন্যাড়া গ্রানিটের অরণ্য থেকে পালানোর জন্যে দিশেহারা হয়ে উঠলাম আমি, অন্য যে-কোনও জায়গা আমার কাছে এখন স্বর্গ। ট্রেইলের উদ্দেশে দ্রুত পা চালালাম। অ্যাপালুসার পেছনের পায়ের ধাক্কায় একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল, তবু নামা বন্ধ করলাম না আমরা – লাগাম ধরে নিয়ে যাচ্ছি ওকে।

ট্রেইলের শেষ-মাথায় ঘেসো জমিতে পৌঁছে তাকালাম ওপর দিকে। মনে হলো একটা সরু নলের ভেতর দাঁড়িয়ে আছি, ওপরে কেবল কালো আকাশ।

তৃণভূমির ও-পাশে চলে গেছে ট্রেইলটা, এখানে আবার দেখা পেলাম ট্র্যাকের। পিছু নিলাম আমি। মেঘ গুরুগুরু করছে। পাথরের ঢল নামার শব্দের মতন। হঠাৎ, সামনে একটা গুহা চোখে পড়ল। রাশ টেনে ডাকলাম চেঁচিয়ে সাড়া পেলাম না।

অ্যাপালুসাকে রেখে এগিয়ে গেলাম পিস্তলহাতে। গুহামুখের সামনে,

পাহাড়ের গায়ে একটা কারনিস – আনুমানিক ত্রিশ গজ লম্বা, বারো গজ গভীর। লোকবসতির চিহ্ন আছে। আবার হাঁক দিলাম, ক্যানিয়নের নীচে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল আমার চিৎকার।

তারপর সব কিছু নীরব নিথর। বড় বড় কয়েকফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। আমি আস্তে আস্তে গুহামুখের কাছে সরে গেলাম।

সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথ, দেয়াল তুলে খানিকটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পাথরের তৈরি, চুন-সুরকির আস্তর নেই, একটার পর একটা সাজিয়ে তোলা। গুহার ভেতরে পা রাখলাম আমি।

একটা পুরোনো লাগাম ঝুলছে দেয়ালে। খটখটে একটা স্যাডল ও রাইফেল পড়ে আছে এককোণে। ফায়ারপ্লেসে স্তূপীকৃত পোড়া কয়লা, বহু-ব্যবহারের ছাপ। দেয়াল ঘেঁষে খড়ের তোশক, কম্বল আর ভালুকের চামড়ায় ঢাকা, একটা মেয়ে শুয়ে আছে তাতে।

ম্যাচের কাঠি ধরালাম আমি, পরমুহূর্তে সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। মেয়েটা পূর্ণ যুবতী, ছোটখাটো গড়ন, অপূর্ব লাবণ্য চেহারায়। একমাথা ঘন দীর্ঘ মেহেদি রঙের চুল, ঘাড় বেয়ে জমা হয়েছে তোশকের ওপর। পরনে তালি-মারা পোশাক, পায়ে মোকাসিন। রক্ত গোলাপের মত দুই গাল।

ওকে ডাকলাম আমি, কিন্তু জবাব পেলাম না। ঝুঁকে হাত রাখলাম কপালে – জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে শুরু হলো ঝড়ের দাপাদাপি।

দৌড়ে গিয়ে বাইরে থেকে ঘোড়াটা নিয়ে এলাম ভেতরে। লাগোয়া আরেকটা গুহা রয়েছে। একসময় কোরাল ছিল।

প্রবেশমুখের পাশেই লাকড়ির গাদা, কোরালে ঘোড়া রেখে এসে তুলে নিলাম কয়েকটা, আগুন ধরিয়ে পানি গরম দিলাম।

এ-বার ভেতরটা আরও ভালমত দেখতে পাচ্ছি। আরেকটা কম্বল রয়েছে, ওটা দিয়ে ঢেকে দিলাম মেয়েটাকে। পরিষ্কার বুঝলাম দুজন লোক বাস করত এখানে, যদিও এই মুহূর্তে মাত্র একজন রয়েছে। সম্ভবত অনেকদিন ধরেই একা আছে ও।

রাইফেলটা পরিষ্কার, তবে চেম্বার ফাঁকা। অ্যামুনিশন নেই কোথাও। পাথরের ছুরি আছে একটা, বেশ ধারাল। বোধ হয় এই ছুরি দিয়েই সে-বার আমার মাংস কেটে নিয়েছিল।

মনে হলো মেয়েটা এখানে বহুদিন যাবৎ আছে। নিশ্চয়ই ভাল খাবার পায়নি, ভীষণ রোগা শরীর।

পানি ফুটছে শোঁ-শোঁ করে। একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে কফি বানালাম। জার্কি ছিল আমার কাছে, সুপ তৈরি করলাম খানিকটা।

বাইরে বিজলি চমকাচ্ছে ঘন ঘন, দু-তিন মিনিট পরপর বাজ পড়ছে। বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে, বিজলির আলোয় বৃষ্টি-ধোয়া পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছি আমি।

নীচে আমাদের ক্যাম্পে একলা রয়েছে ক্যাপ। আর কদিন পরেই এ-এলাকা ভরে উঠবে বাজে লোকে। এই বৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে যাবে জলপ্রপাতের কাছে ফেরার পথ, আর কোনও রাস্তা না থাকলে এখানে আটকা পড়ব আমি। অসুস্থ মেয়েটারও শুশ্রূষা করতে পারব না।

যখন সুপ গরম হলো, মেয়েটাকে কোলে তুলে খাওয়ালাম কিছুটা। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। বুঝতে পারছি, শরীরের শেষ শক্তিটুকু ব্যয় করে গুহায় পৌঁছেছে। অতিকষ্টে একটু একটু করে খাচ্ছে সুপ।

কিছুক্ষণ বাদে আবার ঘুমিয়ে পড়ল ও।

কামবারল্যান্ডের বাসায় থাকতে আমাদের চিকিৎসা আমরা নিজেরাই করতাম। কিন্তু এই ঝড়-বাদলে বাইরে থেকে ভেষজ লতাপাতা আনা সম্ভব নয়। আমার সামনে এখন একটাই উপায় খোলা আছে: সুপ খাইয়ে ওর শরীর চাঙা রাখা।

সর্দি-গর্মি হয়ে থাকলে বাঁচোয়া, মনে মনে প্রার্থনা করলাম নিউমোনিয়া বা ও-রকম ভয়ঙ্কর কিছু যেন না হয়। ওর শরীর ভেঙে গেছে। বারবার একটা চিন্তা বিরক্ত করছে আমাকে – এই বুনো জায়গায় মেয়েটা এল কীভাবে?

নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে ও। খুঁজতে খুঁজতে গুহার ভেতর একজোড়া বুট, আর কোট পেয়ে গেলাম আমি। দুটোই ব্যাটাছেলের। কোটটা চাপিয়ে দিলাম ওর গায়ে।

বাইরে ঝড়ের বিরাম নেই। কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ছে। প্রায় দুঘণ্টা বাদে ঘুম ভাঙল মেয়েটার, চোখ মেলে তাকাল চারপাশে, কার নাম ধরে যেন ডাকল। আরও খানিকটা সুপ দিলাম ওকে। শিশু যেভাবে মায়ের দুধ খায়, তেমনি করে খেলো।

সারারাত আগুনের ধারে বসে রইলাম আমি। পাছে নিভে যায়, এবং ও জেগে উঠে ভয় পায়। ঝড় থেমে গেল ভোরে, মেঘের গর্জন হারিয়ে গেল দূরে।

একটা বড়শি বানিয়ে আমি ঝরনায় গেলাম। মাছ পাবার সম্ভাবনা কম, ঝড়ে ঘোলা হয়ে গেছে পানি। তবু ছুঁড়ে দিলাম বড়শি। কিছুক্ষণ পর ট্রাউট পেলাম একটা, এবং আধ-ঘণ্টা বাদে আরেকটা।

লালচুলো মেয়েটা ঘুমোচ্ছে শান্তিতে। মাছগুলো ধুয়ে ভাজা করলাম আমি। তারপর আগুনে কফি চড়িয়ে বাইরে এলাম।

ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলাম একটা কবরের কাছে। খোঁড়া হয়নি, পাহাড়ের ঢালে একটা চওড়া ফাটলের ভেতরে দেয়া হয়েছে। ফাটলের দুপ্রান্তে দুটো পাথর, মাঝখানে এক ধরনের কাদামাটি লেপা। শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। কবরের ওপর নাম-তারিখ লেখা:

হুয়ান রোমেরো
১৭৯০-১৮৭৪

গতবছর মারা গেছে লোকটা। এবং মেয়েটা প্রায় একবছর হলো এখানে একা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক, এখনও বেঁচে আছে সেটাই বরং আশ্চর্য।

হুয়ান রোমেরো চুরাশি বছর বয়েসে মারা গেছে। একটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে পাহাড়ে ঘোরাঘুরির পক্ষে বয়েসটা বেমানান। নাম থেকে বুঝলাম লোকটা স্প্যানিশ ছিল। কিন্তু ওই মেয়েকে আমার সে-রকম মনে হচ্ছে না। তবে ওদের মাঝে স্বর্ণকেশী আছে বলে যখন শুনেছি, তখন লালচুলো থাকা বিচিত্র নয়।

গুহায় ফিরে গিয়ে আমি তাকালাম রোগিণীর দিকে। শুয়ে আছে, দেখছে আমাকে। 'মাংসের জন্যে ধন্যবাদ,' প্রথম চোটেই বলল।

ওর চোখজোড়া গাঢ় নীল।

'ম্যাম,' বললাম আমি, 'আমার নাম ওরিন ওসমান। বন্ধুরা ডাকে ওরিন।'

'আমি ড্রুসিলা কেরি,' বলল ও।

নয়

ফের ঘুমিয়ে পড়ল ড্রুসিলা। আগুনে আরও কিছু খড়ি গুঁজে দিয়ে আমি বাইরে, গুহামুখে এসে বসলাম। এই প্রথম সুযোগ পেলাম চারপাশে তাকাবার।

স্বর্ণ উপত্যকাটা নির্জন, তবে শান্তিপূর্ণ...এখানকার পরিবেশ ভয়াল। কালো কালো গিরিশৃঙ্গ ঘিরে আছে চারদিক, কোথাও কোথাও ভাঙাচোরা। প্রতিটা ফাটলের গোড়ায় পাথর, ছাল-বাকলহীন গাছের গুঁড়ির স্তূপ। ন্যাড়া শুকনো ডালপালা ছড়ানো-ছিটানো। এবড়োখেবড়ো পাহাড়ী খাঁজগুলোকে মনে হচ্ছে যেন আদিম কঙ্কালের বাহু।

উপত্যকা বেয়ে ঝালরের মত নেমে এসেছে ঝরনা, পথে ডোবার মত সৃষ্টি হয়েছে কয়েক জায়গায়, তারপর হারিয়ে গেছে গভীর গিরিসঙ্কটে।

ক্যানিয়নের প্রান্তবর্তী গাছগুলো ঝড়বাদলের দাপটে কুঁজো, থেমে গেছে বাড়। স্বাস্থ্য আর টিকে থাকার শক্তি ছাড়া এদেরকে কিছু দেয়নি মহাকাল। ভূমিধসে উপড়ে গেছে বহু অ্যাসপেন, গড়িয়ে চলে গেছে নীচে, সেখানে বোল্ডার-চাপা পড়েছে। পাহাড়ের গা থেকে খসে-পড়া চাঙর, নুড়িপাথর আশ্রয় নিয়েছে ক্যানিয়নের মেঝেতে। সমভূমি নেই, জমাট-বাঁধা তুষারের ওপর কিছু ঘাস আর শৈবাল জন্মেছে। পাথরগুলো সব রঙিন – লাল, কালো, সবুজ হরেক রঙের ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। শিলার ওপর সর ফেলে ফেলে উর্বর মাটি সৃষ্টি করছে ওরা। এভাবেই একদিন আরও লতাপাতা জন্ম নেবে ওই মাটিতে, শ্যামল হয়ে উঠবে প্রান্তর।

ঝরনার পাড়ে বিবর্ণ আর্কটিক উইলোর ঝাড়। রোদের অভাবে কয়েক জায়গায় বরফ রয়ে গেছে এখনও।

দুপুরের দিকে সূর্য উঁকি দিল পাহাড়ের ওপর, গরম হয়ে উঠল গুহামুখ। নতুন করে বরফ গলা শুরু হলো, গোটাকয়েক পার্বত্য মেষকে ফিতের মত সরু

একটা ট্রেইল ধরে নেমে যেতে দেখলাম আমি। উল্টোদিকের পাহাড়ে দেখা দিল একটা বিরাটাকার কালো বুড়ো ভালুক। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ভালুকটা একবার তাকাল আমার পানে, তারপর হাত-পা ছড়িয়ে রোদ পোয়াতে লাগল। আমিও বললাম না কিছু।

শান্ত পরিবেশ, তবু স্বস্তি পাচ্ছি না আমি। জায়গাটা কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে মনে। তা ছাড়া ক্যাপকে নিয়েও দুশ্চিন্তায় আছি। মাঝ-বিকেলে আবার জেগে উঠল ড্রু কেরি। আমি ভেতরে গিয়ে এক কাপ কফি দিলাম ওকে।

আমার দিকে তাকাল ও। 'দারুণ লাগছে – প্রায় এক বছরের মধ্যে এর স্বাদ পাইনি।'

'একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না,' বললাম. 'তুমি এখানে এলে কেন? তুমি কি হুয়ান রোমেরোর সাথে এসেছিলে?'

'উনি আমার দাদু। আমি দাদুবাড়িতে মানুষ। দাদিমা মারা যাবার পর থেকে ওঁর মনেও মৃত্যুভয় ঢুকে যায়। খালি ভাবতে শুরু করেন তিনি মারা গেলে আমার কী হবে। দাদুর কাছে একটা ম্যাপ ছিল, স্যান জুয়ান পাহাড়ে সোনার খনির উল্লেখ ছিল তাতে। ওই ম্যাপটা আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি – পুরুষানুক্রমে দাদুর হাতে আসে। তো উনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আমার জন্যে খুঁজে বের করবেন খনিটা। আমিও জেদ ধরলাম আসার জন্যে।

'দাদু খুব সাহসী ছিলেন, ওরিন। কাউকে পরোয়া করতেন না। কিন্তু ম্যাপের সঙ্কেত ধরতে না পারায় আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম। গোলাবারুদ কমে এসেছিল। পাহাড়-ধসে মালপত্রের সঙ্গে হারিয়ে যায় কিছু – এই সময় কাঁধে চোট পেলেন দাদু।

'আমরা এখানে এলাম। তাঁর বিশ্বাস ছিল খনিটা ধারে-কাছেই হবে। এ-রকম মনে করার কারণ আমাকে কখনও বলেননি তিনি, তবে ম্যাপে উল্লেখ ছিল দুই পাহাড়ের মাঝামাঝি কোথাও হবে। একটা উত্তরে, সামান্য পশ্চিম ঘেঁষে – অন্যটা সোজা পশ্চিমে।

'আমাকে যতটুকু বলেছিলেন, ওই ধসে দাদু আসলে তার চেয়ে বেশি আহত হয়েছিলেন। আর সেরে ওঠেননি। ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল একটা কাঁধ, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। চিন্তিত হয়ে পড়লেন আমাকে নিয়ে। সোনার আশা বাদ দিয়ে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাবেন বলে ঠিক করলেন।

'এরপর তিনি বিছানায় পড়েন...তুমি যে-বার প্রথম এসেছিলে এটা তখনকার কথা। খিদেয় কষ্ট পাচ্ছিলাম আমরা, তাই তোমার মাংস চুরি করেছিলাম আমি।'

'আমাকে জাগানো উচিত ছিল।'

'আ...আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

'তারপর যখন ফিরে এসে দেখলে তোমার জন্যে মাংস রেখে গিয়েছি – তখন নিশ্চয়ই ভুল ভেঙেছিল?'

'ওহ্, তখনকার মনের অবস্থা বলে বোঝাতে পারব না! আমি মাংস নিয়ে ফিরে আসার পরপরই দাদু মারা যান। অবশ্যি তার আগে তোমার কথা বলেছিলাম ওঁকে।'

'তারপর?'

'তোমার সাথে আমাকে চলে যেতে বলেছিলেন উনি। বলেছিলেন, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে এখান থেকে, সাধারণত পুরুষেরা মেয়েদের কোনও ক্ষতি করে না।'

'কবরটা দেখে আমি ভেবেছিলাম উনি বোধ হয় আরও আগে মারা গেছেন।'

'তারিখের ব্যাপারে আমি শ্যুওর ছিলাম না। সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা।'

অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে ওর ওপর দিয়ে, সুপ বানাতে বানাতে ভাবলাম আমি। এ-বার বড় এক টুকরো মাংস দিলাম ওতে।

'এখানে উঠলে কীভাবে?'

'উত্তরের একটা রাস্তা ধরে – বহু প্রাচীন ট্রেইল, ভীষণ খাড়া।'

আবার সেই উত্তর দিক্। আমি পশ্চিম দিকে নামবার রাস্তা চাইছি। আমার ধারণা এ-মুহূর্তে ক্যাপ সয়্যারের কাছ থেকে আমরা খুব বেশি হলে এক মাইল দূরে আছি। কিন্তু এই এক মাইল বলতে গেলে প্রায় সটান নেমে গেছে।

ড্রুসিলা কেরির পক্ষে এ-শরীরে নড়াচড়া অসম্ভব। ওকে ফেলে রেখে যাব না আমি, বিশেষ করে আমাকে যখন খুন করবে বলে অনেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওর কথা কাউকে বলবার আগেই যদি আমি মরে যাই, তখন?

সাবধানের মার নেই, আগাম সব কিছু জানিয়ে রাখলাম ওকে। 'ভ্যালেসাইটোস ক্যানিয়নে আমাদের ক্যাম্প। আমার বন্ধু ক্যাপ সয়্যার আছে ওখানে। ক্যাম্পটা এখান থেকে পশ্চিমে। আমার কিছু হয়ে গেলে সোজা ওর কাছে চলে যেও। ও তোমাকে মোরায় আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে।'

আর কদিন বিশ্রাম পেলে ড্রু চলাফেরার উপযুক্ত হয়ে উঠবে। অসুখটা এমন কিছু নয়, দীর্ঘ অনাহারে স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে।

বাইরে গিয়ে আমি ক্যানিয়নের বিপরীত দিক চলে এলাম। অনেকক্ষণ ধরে জরিপ করলাম পেছনের পাহাড়টা, ধসের ফলে মাঝামাঝি জায়গায় ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। পায়ে হেঁটে চূড়ায় ওঠা সম্ভব বলে মনে হলো।

সম্ভবত ঠিক এর ও-পাশে, নীচে, আমাদের ক্যাম্প। বহু চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, একবার দেখব চেষ্টা করে। ঝরনার ভাটিতে একটা গাছ চোখে পড়েছিল, তার ডাল ভেঙে নিয়ে পাথরে আঁচড় কেটে লিখলাম: এখুনি ফিরব।

রাইফেলটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম আমি। কেটে-ছড়ে যাচ্ছে হাত-পা, প্রতি তিনকদমে এক পা হড়কে পড়ছি, তবু নিরাশ হলাম না।

অবশেষে একসময় উঠে এলাম ঢালের মাথায়। এখান থেকে শুরু হয়েছে

ফাটল, ওপরে তাকাতে আমার চোখ স্থির হয়ে গেল। ইচ্ছে হলো ফিরে যাই, কিন্তু কোনও কাজে হাত দিয়ে সেটা শেষ না করা আমার ধাতের বাইরে। ত্রিকোণ চিমনির মত ফাটল, নীচের দিকে সরু, ওপর দিকে চওড়া। চিমনির ওপরের ঢালটা দেখলে মনে হয় যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। তবে হিসেব করে এগোলে ওঠা একেবারে অসম্ভব নয়।

রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিলাম কাঁধে, হাতদুটো এখন মুক্ত থাকবে, তারপর চিমনি বেয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে এলাম ঢালে। হাঁফিয়ে গেছি, দম নিতে থামলাম একটু, তাকালাম নীচের দিকে। মনে হলো পড়ে যাব মাথা ঘুরে, এত উঁচুতে উঠে এসেছি বুঝতেই পারিনি। ফিতের মত দেখাচ্ছে ক্রীকটাকে, গুহামুখকে মনে হচ্ছে বুঝি আঙুলের নখ। উপত্যকা থেকে দুহাজার ফুট ওপরে রয়েছি আমি। ঘাস খাচ্ছে আমার ঘোড়াটা, পিঁপড়ের মত দেখাচ্ছে ওকে।

বেছে বেছে অপেক্ষাকৃত মজবুত পাথরে ভর দিয়ে রওনা হলাম চুড়োর উদ্দেশে। যখন পৌছুলাম, আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

ওপরে নিঃসীম মহাকাশ, মেঘ। আমার চারপাশে উলঙ্গ মসৃণ গ্রানিট, বরফ গলে যাওয়ায় কোথাও কোথাও ফোকর বেরিয়ে পড়েছে। কোনও গাছ বা লতাপাতার চিহ্নমাত্র নেই। চকচক করছে চুড়োর মেঝে, ঝোড়ো হাওয়া ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে সমস্ত আবর্জনা। নির্মল পরিবেশ, ফুরফুরে হাওয়া বইছে। আমি হেঁটে কিনারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দূরে ভ্যালেসাইটোস উপত্যকা। চুড়োর সামান্য নীচে থেকে বনভূমির শুরু। প্রথমে দুটো-একটা গাছ, বাজ পড়ে কালো অঙ্গার হয়ে আছে, তারপর নিবিড় জঙ্গল। ওই বনের মাঝে আমাদের ক্যাম্প – ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠছে।

এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সমভূমির হিসেবে ক্যাম্প আধমাইল দূরে রয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের উচ্চতা এক মাইলের বেশি, ফলে প্রকৃত দূরত্ব আরও বেড়ে গেছে। দু-এক জায়গায় কোনও পথ নেই, একদম খাড়া, কীট-পতঙ্গ ছাড়া কারও পক্ষে নামা সম্ভব নয়। কেবল উত্তরের ঢাল ধরে মাইলখানেক যাওয়া যাবে।

আমাদের টাউন সাইটে কর্মচাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কয়েক সারি ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, দালানকোঠাও তৈরি হচ্ছে বলে মনে হলো। তবে এত দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না সেটা।

সন্ধ্যের মুখে ফিরে এলাম গুহায়। ড্রু হাসল আমাকে দেখে।

'ভয় পাচ্ছিলে?'

টোল পড়ল ওর গালে। 'ন্-না...তুমি তো বলেই গেছ ফিরে আসবে।'

আগের চেয়ে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে ওকে। রঙ ফিরে এসেছে মুখে, কফির জোগাড় করছে। আসার পথে আমি একটা শিঙওয়ালা মেষ শিকার করেছিলাম, আগুনে ঝলসে নিলাম ওটা। ভূরিভোজন সেরে গল্প করতে বসলাম আমরা দুজন। চাঁদ না ওঠা অবধি চলল সেই গল্প।

তারপর ও যখন ঘুমোতে গেল, গুহার দরজায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসলাম আমি। চন্দ্রালোকে রুপোর চাদরের মত মনে হচ্ছে তুষারাবৃত পাহাড়ের গা। একসময় পশ্চিমে ঢলে পড়ল চাঁদ, হারিয়ে গেল অন্ধকার বনানীর আড়ালে।

পাঁচদিন পর, ভোরবেলায় রওনা হলাম আমরা।

উত্তর-উত্তরপুবদিকের ঝরনাটা পেরিয়ে একটা প্রাচীন ট্রেইল ধরলাম। এটার কথাই বলেছিল ড্রুসিলা। ওদের মোটবাহী খচ্চর কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল ও দেখাল। তারপর জানাল ক্যানিয়নের দক্ষিণে আরেকটা দুরারোহ ট্রেইল আছে, ওটা দিয়ে যাওয়া যাবে আমাদের ক্যাম্পে।

ড্রুসিলা বসে আছে স্যাডলে, আমি অ্যাপালুসার লাগাম টেনে নিয়ে যাচ্ছি। পাথর আর ঘন জঙ্গল ভেঙে অনেকক্ষণ পর নীচে পৌঁছুলাম আমরা। শহর থেকে প্রায় আধ-মাইল দূরে এসে থামলাম।

জনাচল্লিশেক লোক কাজ করছে, ব্যস্তসমস্ত ভাব, ঘরবাড়ি উঠছে। কিন্তু ক্যাপ সয়্যারের ছায়াও দেখতে পেলাম না কোথাও। ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হলো না আমার।

ড্রুকে সাহায্য করলাম ঘোড়া থেকে নামতে। 'বিশ্রাম নেব,' বললাম আমি। 'ক্যাম্পে যাব রাতে। ওই লোকগুলোকে সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।' ওদের সঙ্গে লাগতে গিয়ে একটা অসুস্থ মেয়েকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাই না আমি।

অন্ধকার নামল ধীরে ধীরে। ক্যাপের কথা চিন্তা করে আর বসে থাকতে মন সায় দিল না। কোলে করে ড্রুসিলাকে চাপিয়ে দিলাম স্যাডলে, আমার উইনচেস্টার রাইফেল বের করে নিলাম স্ক্যাবার্ড থেকে।

সামান্য পথ। ছোট্ট একফালি ঘেসো জমি আর উইলো ঝোপের পরেই আমাদের ক্যাম্প। থমথমে পরিবেশ, কেবল দু-তিনটে পেঁচা আমাদের মাথার ওপর ডানা ঝাপটাচ্ছে। একটুবাদে দূরে একটা নেকড়ে ডেকে উঠল এবং থামল। সূর্য ডুবে গেছে, রাত নামেনি পুরোপুরি

আমরা ডানে মোড় নিলাম। আমার পায়ে মোকাসিন, ঘাসে শব্দ হচ্ছে না হাঁটার। অ্যাপালুসাটা জাত ইন্ডিয়ান ঘোড়া, অবস্থা বুঝে সাবধানে এগোচ্ছে। হালকা ধোঁয়া চোখে পড়ছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে, পাহাড় থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি বাতাস।

ক্যাপের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার মন ছটফট করছে। শহরের ওই লোকগুলোকে একটুও ভাল ঠেকেনি আমার। ওদের বিরুদ্ধে একা পেরে উঠবে না ক্যাপ। হয়তো সে আহত হয়েছে, মারা পড়াও বিচিত্র নয়। কসম খেলাম আমি, ক্যাপ সয়্যারের কোনও ক্ষতি হয়ে থাকলে ওদের নাম-নিশানা মুছে দেব পৃথিবী থেকে।

হঠাৎ সামনের ঝোপ থেকে তিনজন লোক বেরিয়ে এল পুরোভাগে কিচ।

'তোমার অপেক্ষাই করছিলাম, ওসমান,' বলে আমার দিকে পিস্তল তাক

করল সে। কিচ ভেবেছিল আমাকে সে বাগে পেয়েছে।

কিন্তু আমার পায়ের সাথে সাঁটানো উইনচেস্টারখানা চোখে পড়েনি ওর। আলগোছে ডান হাতে ওটা ওপরে তুললাম আমি, বাঁ-হাতে চেপে ধরলাম ব্যারেল, গুলি করলাম মাজার কাছ থেকে। আমাকে লক্ষ্য করে পিস্তল নাচাচ্ছিল কিচ, ঠোঁটে কুৎসিত হাসি, আচমকা বুলেটের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল দুকদম, এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে পেট। একটুও না সরে দ্বিতীয়জনকে গুলি করলাম, ঘুরে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

তৃতীয়জন দাঁড়িয়ে রইল অনড়, ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেছে, মুখ ফ্যাকাসে, চোখ বিস্ফারিত। 'গানবেল্ট ফেলে দাও!' হুকুম করলাম। 'কোনও চালাকি নয়!'

সুবোধ ছেলের মত নির্দেশ পালন করল সে, পিছু হটল এক পা।

'এবার বলো দেখি, চাঁদ, তোমার নাম কী?'

'অ্যা...অ্যাব ওয়ারেন.' ভয়ে তোতলাতে লাগল লোকটা। ইতস্তত করল একটু, তারপর বলল, 'কিচ এখনও মারা যায়নি...দেখব চেষ্টা করে বাঁচে কিনা?'

'তেড়িবেড়ি করলে আবার গুলি খাবে,' জবাব দিলাম আমি। 'ওকে সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলে, মুখ খোলো। আমার পার্টনার কোথায়?'

শরীরের ভর বদল করল ওয়ারেন। 'তুমি নিজের ভাল চাও তো পালাও...অন্যরা এসে পড়ল বলে।'

'আসুক। কই – আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না?'

'দেব না। কসম–'

ইতিমধ্যে সরে গিয়েছিলাম ওর কাছে, উল্টোহাতে চড় কষালাম মুখে। বেশি জোরে মারিনি, কিন্তু আগেই বলেছি আমার থাবা বড়, কঠোর পরিশ্রমের ফলে লোহার মত শক্ত।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, কলারে চেপে ধরে টেনে তুললাম। 'জবাব দাও, নইলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

স্নায়ুর চাপ আর সইতে পারল না ওয়ারেন, হড়হড় করে বলে গেল সব। 'ওরা অ্যামবুশ করেছিল – মারতে পারেনি – আহত অবস্থায় পালিয়ে গেছে ও – তবে তার আগে আমাদের দুজনকে মেরে গেছে – এখন তোমাদের ক্যাম্পে আছে।'

'একা?'

'না...জো রাগার আছে সঙ্গে' ওয়ারেন দম নিল 'রাগার ওর পক্ষ নিয়েছে।'

কিচ গোঙাচ্ছিল, আমি ওর কাছে গেলাম। 'বলেছিলাম না, কিচ, আমি পালাব না।' ঘুরলাম ওয়ারেনের দিকে। 'নিয়ে যাও ওকে। যদি বেঁচে যায়, আর যেন পিস্তল ঝোলাতে না দেখি। তোমাকেও না। ইচ্ছে করলে থাকতে পার এখানে – কিন্তু পিস্তল ঝোলালে মারা পড়বে।'

লাগামটা হাতে নিলাম আমি, তারপর যোগ করলাম, 'ফিরে গিয়ে ওদের

বলবে, আমাদের সঙ্গে আপস করতে। আর যদি তা না চায়, তা হলে যেন চলে যায় – না গেলে আমি-ই তাড়াব।'

'ওরা চল্লিশজন!' বলল ওয়ারেন।

'হোক। তোমার কাজ বলা।'

ওদের অস্ত্রপাতি কুড়িয়ে নিয়ে ফের যাত্রা করলাম আমি। যখন ক্যাম্পে পৌঁছুলাম, ঘুটঘুটে আঁধার নেমেছে। আমাকে চ্যালেঞ্জ করল একজন। গলাটা পরিচিত ঠেকল, তবে ক্যাপ নয়।

'আমি ওসমান,' বললাম, 'সঙ্গে একজন মহিলা আছে।'

পিছিয়ে ড্রুসিলার কাছে গিয়ে বললাম, 'ম্যাম, ওই ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত – কিন্তু কী করব বলো, এ ছাড়া উপায় তো ছিল না।'

ও জবাব দিল না, ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'লেগেছে?'

'ন্-না।'

ওর স্বর কেমন যেন অচেনা শোনাল আমার কানে, তবে ওকে ঘোড়া থেকে না নামানো অবধি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলাম না ততখানি। আড়ষ্টভাবে নামল ড্রুসিলা, একটিবারও তাকাল না আমার দিকে।

আমাদের পাশে একজন লোক উদয় হলো। 'ওসমান? আমি জো রাগার। মনে পড়ে? তোমার সাথে আলাপ আছে বলেছিলাম। ক্যাপের কাছ থেকে ওদের দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছি আমি।'

চিনতে পারলাম রাগারকে। সেই পেটা-শরীর, কিচের সাথে এও এসেছিল। ওকে পাশ কাটিয়ে কেবিনে ঢুকলাম। কম্বলের ওপর শুয়ে আছে ক্যাপ। ভীষণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমি।

'রাতে আমরা বাতি বিশেষ জ্বালাই না,' বলল রাগার। ওরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ে।'

'নিভিয়ে দাও।'

চুপচাপ কয়েকমিনিট বসে রইলাম আমি, মৃত্যুভয় ছেঁকে ধরেছে। বৃদ্ধের অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের নয়, তবু ওর মায়ায় জড়িয়ে গেছি আমি। ক্যাপ সত্যিকারের খাঁটি লোক।

'ওকে অ্যামবুশ করেছিল...চার-পাঁচজনে মিলে। গুলি করে ফেলে দেয় স্যাডল থেকে, তারপর খুঁজতে শুরু করে। কিন্তু ক্যাপ বুদ্ধি হারায়নি, কাছে আসার সুযোগ দিয়েছে, তারপর যখন বুঝেছে লক্ষ্য ফসকাবে না – নিকেশ করেছে দুটোকে। বাকি সব ভয়ে বেড়ালের মত লেজ গুটিয়ে ভেগেছে।'

'চোট কোথায়?

'অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে ফুসফুস। ওপর দিকে লেগেছে, তবে প্রচুর রক্ত হারিয়েছে এখানে আসার আগে। পরদিন সকালে খবর পেয়েই আমি চলে এসেছি।

'তারপর ওরা যখন ওকে খতম করতে আসছিল, আমি বাধা দিয়েছি

এগিয়ে গিয়ে। ক্যাপের অবস্থা যে এত খারাপ, ওরা সেটা জানে না – তাই আর হামলা চালায়নি – জানের ভয় প্রত্যেকেরই আছে।'

বাইরে গিয়ে গাছতলায় দাঁড়ালাম। ওই বৃদ্ধ যদি মারা যায়, ওদের কাউকে আস্ত রাখব না আমি – দরকার হলে এ-জন্যে সারা দেশ চষব।'

এতক্ষণে নিশ্চয় কিচের হাল দেখতে পেয়েছে ওরা, জানে আমি ফিরে এসেছি। এ-সব লোকের স্বভাব আমি ভালই বুঝি। আজ রাতে মিটিং বসবে ওদের, পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবে – কিন্তু রাতে সাহস করবে না আসতে। বিশেষ করে কিচের ঘটনার পর। সুতরাং, কোনও গোলমাল যদি হয়, তো কাল।

তবে আমি তৈরি থাকব – ওরা আজ এলেও কুছপরোয়া নেই। আমি যেচে কোনও ঝামেলা বাধাইনি, কিন্তু ওরা যখন বাধ্য করছে, তখন আর কী করা? ওরা যদি পাহাড়ের গোড়ায় এক সারি কবর দিয়ে এ-শহরের উদ্বোধন করতে চায় – তাই হবে।

জো রাগার পেছনে এসে দাঁড়াল। 'অ্যানজেল, ও'নীল – ওদের খবর দেবো?'

'লাগবে না – আমি একাই পারব।'

আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় পাবে ওরা। তারপর আমি শহরে যাব।

দশ

ভোর। গুমট আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কথাটা মনে হতেই আঁতকে উঠলাম; বৃষ্টি মানেই তুষারপাতের আশঙ্কা, সে-ক্ষেত্রে খনিতে যাবার পথ অন্তত বেশ কিছু দিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের ক্যাম্পের চারদিকে জঙ্গল। তার কিনারে গিয়ে তাকালাম শহরের পানে। অনেকগুলো তাঁবু পড়েছে, একটা দালান নির্মিত হয়েছে ইতিমধ্যে, আরও দুটোর কাজ চলছে।

পাততাড়ি গুটানোর কোনও লক্ষণ দেখতে পেলাম না।

আগুনের পাশে জোড়াসনে বসে আছে জো রাগার। হাতে একটা দীর্ঘ ফর্ক, ভেনিসন স্টিক বানাচ্ছে ওটা দিয়ে। ড্রুসিলা সাহায্য করছে ওকে। আমার সাথে চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল। ওর দৃষ্টিতে স্পষ্ট ভয়।

এ-জন্যে ওকে দোষ দেই না। পাহাড়ে শান্তিতে বাস করছিল ও, আচমকা গান ফাইট দেখে স্নায়ুতে চাপ পড়েছে। আমার ভূমিকাতে বোধ হয় আঘাত পেয়েছে ড্রু। যে-সব লোক নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করে, কঠিন লোকদের মোকাবেলার ব্যাপারে তাদের কোনও ধারণা নেই। তা ছাড়া, লড়াইতেই যখন

সমস্যার ফয়সালা করতে হবে, তখন ফালতু কথা খরচ করতে যাব কেন?

শহরের ওই লোকগুলোকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, ভাবনাচিন্তার সময় দিয়েছি। ওদের ভেতর রুখে দাঁড়ানোর মত লোক অবশ্যই আছে; এরা হবে কঠিন একগুঁয়ে লোক। কিছু লোক থাকবে বাকপটু, এরা প্রথম কাতারের নেতৃত্ব মেনে নেবে। আরেক ধরনের মানুষ দেখা যায় এ-রকম আউটফিটে। এরা সুযোগসন্ধানী, সাহসী সবল লোকদের কাঁধে ভর করে আখের গুছায়। নেতা হবার মত যোগ্যতা নিশ্চয়ই এই আউটফিটে কারও না কারও আছে।

আমার হুঁশিয়ারি ওদের ঐক্যে, কিছুটা হলেও চিড় ধরাবে। সুযোগ-সন্ধানীদের অনেকেই জড়াতে চাইবে না লড়াইতে, বাকপটুদের কেউ কেউ সেই ছুতোয় কেটে পড়বে।

ক্যাপের অবস্থা সঙ্গিন। এমনিতেই ও রোগা-পাতলা মানুষ, শরীরে রক্ত কম – এখন সেই মহামূল্যবান রক্ত হারিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে। চোখ-মুখ দেবে গেছে, পাঁজরের হাড় গোনা যাচ্ছে একটা-একটা করে।

ওর দিকে তাকালে আমার ভয় করে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর একটা মানুষ, অথচ তার ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না।

'ড্রু,' বললাম আমি, 'ওর একটু সেবাযত্ন করতে পারবে?'

'পারব।'

'ড্রু, কাল রাতের ঘটনার জন্যে তুমি কিছু মনে কোরো না – 'অ্যাম সরি

'ওদেরকে তুমি না মারলেও পারতে!'

'ওরা খারাপ লোক, ড্রু – আমাকে খুন করতে এসেছিল।'

'বিশ্বাস করি না। ভয় দেখাচ্ছিল।'

'ড্রু, ভয় দেখানোর জন্যে কেউ পিস্তল নাচায় না। এমন অনেককে আমি দেখেছি, যারা এটা বিশ্বাস করেনি বলে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ দিয়ে মাশুল গুনেছে।'

আমার কথা বোধ করি মনঃপূত হলো না ওর, নীরবে সরে গেল। চিনচিনে ব্যথা অনুভব করলাম বুকে, আমাদের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। জীবনে এই প্রথম একটি মেয়ের প্রতি টান অনুভব করেছিলাম, সেও আমার হবে না। আমার কর্তব্যপালনের পর আরও অপছন্দ করবে। তবু সত্য সত্যই রয়ে যাবে: কোনও পুরুষই মেয়েলোকের ইচ্ছানুযায়ী নিজের জীবন গড়তে পারে না। মেয়েদেরও উচিত নয় এ-ব্যাপারে পুরুষদের প্রভাবিত করা। তাদের মাঝে দেয়া-নেয়া, বোঝাপড়া নিশ্চয় থাকবে, কিন্তু পুরুষ যখন জীবন-মৃত্যুর কঠিন সমস্যায় পড়ে, তখন তার নিয়মেই তাকে সেটা মোকাবেলা করতে দেয়া উচিত।

এখানে গোলমালে জড়াতে আসিনি। ক্লেইম দাখিল করেছি আমরা, শহরপত্তনের জন্যে মাপজোক করেছি একটা জায়গা, এবং দালানকোঠা কোথায় হবে তা ঠিক করেছি। কাঠ কেটে নির্মাণের জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম; এই সময় বাইরের কিছু লোক এসে জবরদখল করতে চাইছে সেটা। ক্যাপকে গুলি করেছে

ওরা, এবং আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছে।

নাস্তার সময় কথাবার্তা হলো না বিশেষ। খাওয়া সেরে আমি ব্ল্যাকস্টোনের বই নিয়ে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলাম, এখান থেকে শহরের ওপর নজর রাখতে পারব। লেখাপড়া ব্যাপারটা আমার জন্যে কঠিন, ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। অচেনা অজানা শব্দ বাদ দিয়ে পড়ছি। তবে কিছুক্ষণ পাঠের পর অধিকাংশ অর্থ মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে উঠল।

একঘণ্টা বাদে বইটা ক্যাম্পে নিয়ে রেখে দিলাম, তারপর একটা বেলচা হাতে করে পথ ধরলাম ক্রীকের।

কঠিন শিলাস্তর অবধি শ্যাফট খুঁড়ে ক্যাপ সেটা সাফ করতে শুরু করেছিল। আমি ওখানে নেমে আরেকটু চওড়া করলাম ওটা, তারপর কিছু নুড়িপাথর বের করে আনলাম। এ-বার ঝরনার কিনারে গিয়ে একটা প্যানে রাখলাম পাথরগুলো, পানিতে ডুবিয়ে কচলাতে লাগলাম। সোনার কুচি পাওয়া গেল কিছু, তবে সেটা না ধরবার মতই।

মাঝে মাঝে জঙ্গলের প্রান্তে গিয়ে দেখে আসছি চারপাশ। দুপুর হয়ে এল, তবু শহরে কোনও কাজকর্মের চিহ্ন চোখে পড়ল না। এর মানে, ওদের আলোচনা-সভা এখনও ভাঙেনি। ক্যাপের শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে আসছে। আমি যখন ক্যাম্পে ফিরে এলাম, ড্রুসিলা খাওয়াচ্ছে ওকে। আমাকে না দেখার ভান করল, আমিও খেতে বসলাম নীরবে।

লড়াই বাধলে আমরা হয়তো ওদের ঠেকাতে পারব, কিন্তু এখান থেকে পালাতে হলে পাহাড়ে ওঠাই একমাত্র পথ। সে-ক্ষেত্রে একজন রোগীকে নিয়ে যে বেশি দূর যেতে পারব না, তা বলাই বাহুল্য।

একটা কুড়াল নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে গেলাম আমি। আরও কটা গুঁড়ি যোগ করলাম, এখানে-সেখানে আগাছা সাফ করলাম কিছু। এর ফলে আমাদের জ্বালানির পরিমাণ বাড়ল।

জো রাগার চিন্তিত হয়ে পড়েছে, বুঝতে পারছি, তবে লোকটা ভিতু নয়।

'আমাদের পক্ষ নিলে কেন, জো?' জানতে চাইলাম।

'আগে ওদের স্বভাব-চরিত্র বুঝতে পারিনি। তোমাদের দুজনকে আমার মনে ধরেছে। তা ছাড়া, ওই দোকানটা লিজ নিতে চাই আমি। ওহাইওতে একসময় একটা মুদিখানায় চাকরি করতাম, কিন্তু যখন বুঝলাম এতে আমার ভাগ্য খুলবে না, চলে এলাম ছেড়ে দিয়ে। খনিতেও কাজ করেছি কিছু দিন, তবে আমার লক্ষ্য দোকান করা।'

'জো, ওটা তা হলে তুমিই পেলে। আমরা চাই শহরটা বড় হোক, ওই দোকান তুমি নিলে খুশি হব।'

'থ্যাংকস, ওরিন।'

শহরে কী ঘটছে জানতে পারছি না বলে দুশ্চিন্তা বোধ করছি। অথচ এটা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ, কখনও বেশি সিরিয়াস হতে পারি না। এ-কারণে অতীতে

আমাকে অনেক ক্ষেত্রে ভুল বুঝেছে মানুষ, ভেবেছে আমি সমস্যা দেখলেই পাশ কাটাতে চাই। এখন আমার সমস্ত মনোযোগ ওই লোকগুলোর প্রতি। নিশ্চয়ই ওরা এখানে আসার জন্যে সাহস সঞ্চয় করছে – আর সেটা জোগাচ্ছে মদ। শহরটা মাস্তানে ভরে উঠুক, এটা আমার কাম্য নয়। মানুষ যাতে খাটা-খাটুনির পর নিরাপদে সান্ধ্যভ্রমণে বেরোতে পারে, সে-ব্যবস্থাই করতে হবে আমাকে।

প্রায় একশো ফুটি একটা দড়ি পেলাম আমাদের মালপত্র ঘেঁটে। জোয়ের কাছে আরও কিছুটা মিলল, এই দুটো একত্রে গিঁট বেঁধে আমি কেবিন থেকে ফিল্ড গ্লাসখানা নিয়ে এসে শহরটা জরিপ করলাম।

চারটে তাঁবু রয়েছে – একটা বড়, রেলরাস্তা আছে এমন শহরে স্টেশনের পাশে এ-রকম তাঁবুতে স্যালুন দেখতে পাওয়া যায়। আরগুলো ছোট ছোট। জিন-চড়ানো দুটো ঘোড়া চোখে পড়ল, পেছনে লটবহর...রাস্তায় ঘুরঘুর করছে কয়েকটা লোক।

হঠাৎ একটা বিষয়ে আমার কৌতূহল জাগল। শহরে যদি চল্লিশজন লোকই থাকবে, তবে অন্যরা কোথায়?

হাত বাড়িয়ে রাইফেল তুলে নিলাম, বনের প্রান্ত ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রতিটা রাস্তা দেখলাম খুঁটিয়ে। ক্যাপ আর জো একাই হটিয়ে দিয়েছিল ওদের, এখন আমি রয়েছি – মনে হয় না এ অবস্থায় আবার হামলা চালাবে ওরা, তবু সাবধান থাকা ভাল।

কথাটা মাথায় আসতেই চমকে উঠলাম: ক্যাপ সয়্যার অসুস্থ, ড্রুসিলা কেরি মেয়েছেলে – পরিস্থিতি আমাদের জন্যে নেহাত নাজুক। সুতরাং আক্রমণ আমাকেই করতে হবে।

সন্ধ্যে নাগাদ জো রাগার পাহারার দায়িত্ব নিল, আমি ভেতরে গেলাম খেতে। ক্যাপ জেগেছিল, তাকাল আমার দিকে। 'ওরিন, তোমাকেই সব কিছু সামলাতে হবে। আমি তো বিছানায়।'

'দুঃখ করো না, ক্যাপ। আমাদের ক্লেইম বজায় রাখতে গিয়ে তোমার এই দশা।' ওর বিছানার পাশে বসলাম, হাতে ধরে সাহায্য করলাম কফি খেতে।

'আজ রাতে ওদের হিসেব চুকানোর পালা।'

'বি কেয়ারফুল।'

'আমরা না গেলে, ওরাই আসবে। তুমি অসুস্থ, ড্রু রয়েছে – এখানে গোলাগুলি করা ঠিক হবে না।'

'ড্রু মেয়েটা ভাল।'

'ওই উপত্যকাটা তুমি যদি দেখতে। ও কীভাবে ছিল, আমার ভাবতেই অবাক লাগে। খাওয়া-দাওয়া নেই, তার ওপর একা।'

বেশ তরতাজা লাগছে ক্যাপকে। বিশ্রাম আর প্রচুর খাবার দরকার ওর, তা হলেই হৃতশক্তি ফিরে পাবে। এই দুঃসময়ে ড্রু থাকায় আমাদের লাভ হয়েছে।

ঘরে ঢুকল ড্রু, একবাটি সুপ নিয়ে এসেছে ক্যাপের জন্যে, আপ্রাণ প্রয়াস

পাচ্ছে আমার দিকে না তাকাবার। ও কী আশা করে আমার কাছে? পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে মরলো? স্বীকার করছি, হামলা আমিই চালিয়েছিলাম, কিন্তু কিচের দায়ভাগও কম নয় – লুকোচুরি খেলার জন্যে ওভাবে কেউ ওত পাতে না ঝোপের ভেতর।

ড্রুসিলা যেন অবিকল পুতুলটি। ছোট্ট, কৃশকায়, ঢলঢলে। ওর পরনের কাপড় ছেঁড়া, তবু আপাতত ওটাতেই চালাতে হবে। এখানকার ঝামেলা চুকলে সিলভারটন বা ডেল নর্তে গিয়ে কিনে আনবো কয়েক প্রস্থ।

ওর চেহারাতেও ফিরে এসেছে সজীবতা, চুল আঁচড়ে চমৎকার পনিটেল বেঁধেছে। ফ্যাশন বইয়ের মলাটে এ-রকম মেয়ের ছবি দেখেছি আমি। সত্যিই, আবারও স্বীকার করলাম আপনমনে, ও সুন্দরী।

'আসি, দেখা হবে,' বলে উঠে দাঁড়ালাম। 'সাবধানে থেকো।'

ক্ষণিকের তরে একবার মনে হলো কথা বলি, কিন্তু কী বলব? আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে ও, কথা বলতে চাইছে না, একবুক জ্বালা নিয়ে সরে এলাম। বনের প্রান্তে গিয়ে আকাশ পানে তাকালাম আমি, সবে দু-তিনটে তারা ফুটেছে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম একটা, মানুষ কত বোকাই না হয়।

মেয়েটার আছেই-বা কী? রূপ-যৌবন, আর মাথাভর্তি লাল চুল...এই তুচ্ছ কারণে এত মন খারাপের কী আছে?

আমার চিন্তাভাবনা সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করছে শহরে গিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেই। তবে এতে আমার জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণ, অথচ জিততে আমাকে হবেই। জো বিশ্বস্ত লোক, কিন্তু বন্দুকবাজ নয়। এখন যদি ও'নীল আসতো!

জানি, তা হবার নয়। বহুদূরে আছে ও'নীল, কয়েকদিনের পথ। সব কিছু এখন আমার একার ওপর নির্ভর করছে। কারও সাহায্য পেলে কী হত না হত ভেবে লাভ নেই, তার চেয়ে কাজটা এককভাবে করার পরিকল্পনা আঁটাই বরং বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

দড়িটা গুটিয়ে নিয়ে আমি স্যাডলে চাপলাম। 'জো,' বললাম রাগারকে, 'তমি সতর্ক থেকো। ওরা আসতে পারে। সম্ভব হলে আমিও চলে আসব সঙ্গে সঙ্গে – তবে যতক্ষণ না আসছি, ঠেকিয়ে রেখো।'

আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ড্রুসিলা, ওর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। কেবল যাবার সময় একটা হাত তুললাম ওকে লক্ষ্য করে। 'দেখা হবে,' বলে ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে ঝরনাবক্ষে নামলাম।

হিমেল আবহাওয়া। বাতাস নেই। আনত মেঘে আকাশ কালো। পাইনের মিষ্টি সুবাস ভেসে আসছেঃ ধোঁয়া, রান্নার গন্ধে বুকের ব্যথাটা আবার মাথাচাড়া দিল।

শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে রাশ টানলাম আমি, নেমে ঝরনার ধারে অ্যাপালুসাটা বাঁধলাম উইলো ঝোপের সাথে। হাত রাখলাম ওর কাঁধে। 'অপেক্ষা কর, বেটা। দেরি করব না।'

মুখে বললাম বটে, কিন্তু কথাটা কতটুকু সত্যি তা আমি নিজেও জানি না।

ওদেরকে বাগে পেলে হয়তো কাজটা সহজ হয়ে যাবে – আবার এর উলটোটি ঘটাও অসম্ভব নয়। ড্রুসিলা আমার কোনও সাহায্যে আসছে না, কিচকে মেরেছি বলে ও আমার ওপর অসন্তুষ্ট।

আমাদের সম্পর্ক আবার জোড়া লাগবে, এটা নিশ্চয় বলা যায় না। ড্রুসিলা সুন্দরী, মনের মত জীবনসঙ্গী পেতে অসুবিধে হবে না তার। আমার চেহারা সুন্দর, এক মা ছাড়া কেউই বলেনি আজতক। তাও সেটা বলবার সময় মায়ের মুখেও সন্দেহের ছাপ ফুটে উঠত।

আমি রোগা-পটকা, তালপাতার সেপাই বলা চলে। কেবল দুটো কাজ জানি: ট্র্যাক চেনা এবং গুলি ছোঁড়া। এ ছাড়া আমার একমাত্র সম্বল আমার পেশীবহুল কাঁধ, অনায়াসে প্রচুর ভার সইতে পারি।

পড়াশুনোর কথা মনে হলে আগে আমার গায়ে জ্বর আসত। ব্ল্যাকস্টোনের বইটা তো রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল। কুকুর যেমন হাড় ভেঙে মজ্জা খাওয়ার লোভে দিশেহারা হয়ে ওঠে, তেমনি। আমার ভাবনাজগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বইটি।

ভদ্রলোক অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন, জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর বক্তব্যে। কোনমতে যদি লেখাপড়াটা শিখতে পারি...অ্যানজেলের মত উকিল হব না, তবে...

এখন ওসব স্বপ্ন দেখার সময় নয়। সন্তর্পণে এগিয়ে গেলাম শহরের দিকে। হাতে দড়ি, রাইফেল। মোকাসিন পায়ে নিঃসাড়ে চলাফেরা করছি। বড় তাঁবুর চারটে গাই রোপে দড়িটা পেঁচিয়ে, সংলগ্ন আরও দুটো ছোট তাঁবুতে জড়িয়ে ফেললাম আষ্টেপৃষ্ঠে। তারপর ফিরে এলাম ঘোড়ার কাছে, দড়ির মাথা পমেলের সাথে বেঁধে স্যাডলে চাপলাম।

শহরটা যেন ঘুমিয়ে আছে। শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসছে হালকা কথাবার্তা, গ্লাসের টুংটাং আর তাস ফেটার আওয়াজ। মনে হলো এদের ভয় না পেলেও চলবে।

দালানের পাশে ঘোড়াটা নিয়ে গেলাম আমি, স্যাডলের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে পড়লাম ছাতে। পরনের শার্ট খুলে চিমনির ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম, তারপর সাবধানে পিছিয়ে এলাম কারনিসের কাছে। আবার যখন স্যাডল স্পর্শ করলাম, নরক ভেঙে পড়েছে ভেতরে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর, চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে লোকজন, কাশছে খকখক করে।

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, দড়ি চেপে ধরলাম শক্ত করে, কোম্যাঞ্চে ঢঙে পিলে-কাঁপানো চিৎকার দিলাম একটা, তারপর অ্যাপালুসার পেটে স্পারের খোঁচা দিলাম।

চমকে উঠল ঘোড়াটা, সন্ত্রস্ত খরগোশের মত ছুটতে শুরু করল। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তাঁবুগুলো। পরমুহূর্তে আবার তেড়ে গেলাম, খুরের শব্দ পেয়ে

একদল লোক বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল তাঁবু থেকে, দড়িদড়ায় হোঁচট খেয়ে ফের লুটিয়ে পড়ল।

ছেড়ে দিলাম দড়িটা, স্যাডল থেকে ঝুঁকে একটা তাঁবুর খুঁটি তুলে নিলাম। তারপর ওটা দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করলাম ওদের মাথায়।

মুদিখানার বারান্দায় একজন লোক দাঁড়িয়েছিল, হোলস্টারে হাত বাড়াল সে। খুঁটিটা ওর মুখ বরাবর ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'ধরো।'

লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল দোকানি, চৌকাঠে বেধে পড়ে গেল – অর্ধেক ভেতরে, বাকিটা বারান্দায়

অন্ধকারে গা ঢাকা দিলাম আমি। ঢের তামাশা হয়েছে। ছোট দুটো তাঁবু ভেঙে গেছে, হুলস্থুল চলছে তলায়। বড় তাঁবুটা কাত হয়ে পড়েছে এক পাশে। ঝগড়া হচ্ছে ওখানে, একজন ধমকে উঠল, 'না, আমার দান! টাকা রাখো!' একটা গুলি হলো।

বাবার উপদেশ মনে পড়ল আমার, পরিস্থিতি বিচার করতে বসলাম। কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখছি ওদের কাণ্ডকারখানা।

তুমুল বচসা শুরু হয়েছে ওদের মাঝে, বাপ-মা তুলে গালি দিচ্ছে একে অন্যকে। কারও মধ্যে এতটুকু ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।

বেশি টানাহেঁচড়ায় একটা তাঁবু মাটিতে সমান হয়ে গেল। ভাবলাম ওদের আলো দরকার, বাইরের আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত খড়ি নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম ওই তাঁবুর দিকে।

আমাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন চকিতে ঘুরেই সরে গেলাম ওখান থেকে। পেছনে শটগানের ভোঁতা আওয়াজ উঠল একটা। তারপর দাউদাউ করে জ্বলে উঠল তাঁবু, আরেকটু পিছাতে বাধ্য হলাম আমি।

বিনা খাজনায় আমার শহরে ওরা তালুক গাড়তে চেয়েছিল। আমার বন্ধুকে গুলি করেছে, মারতে চেষ্টা করেছে আমাকে।

বালিয়াড়ির কিনারে কোরাল। দড়ি পেঁচিয়ে টান দিলাম খুঁটি ধরে, লুটিয়ে পড়ল। দুড়দাড় শব্দে ছুটে পালাল ওদের ঘোড়াগুলো।

এতক্ষণে কিছুটা শান্ত হলো আমার মন। সত্যি, মানুষের বিধ্বংসী ক্ষমতা অবহেলার মত নয়, সঙ্কল্প করলে সে একাই বহু কিছু গুঁড়িয়ে দিতে পারে – যেমন আমি দিলাম।

আংটার মত করে এক পায়ে আঁকড়ে ধরলাম স্যাডলহর্ন, অ্যাপালুসার কানের কাছে মুখ নামিয়ে সাবধান থাকতে বললাম ওকে, আদর জানালাম ঘাড়ে হাত বুলিয়ে, তারপর আকাশের দিকে তাকালাম।

গান ধরলাম আমি। 'হোয়েন আই ওঅকড আউট অন দ্য স্ট্রীটস অভ ল্যারেডো, হোয়েন আই – '

কান ঘেঁষে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। জোর কদমে ঘোড়া ছোটালাম। গানটা বোধ হয় পছন্দ হচ্ছে না কারও।

এগারো

মেঘের কোলে হালকা কমলা রঙের ছোঁয়া। কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। জো রাগার খুঁচিয়ে উসকে দিয়েছে আগুন। কফির পানি চড়িয়েছে। বুটজোড়া গলিয়ে নিলাম পায়ে, গান বেল্ট বেঁধে উঠে দাঁড়ালাম। গোলমালের আশঙ্কায় একরকম ধড়াচূড়া পরেই শুয়েছিলাম রাতে, পিস্তল ছিল শিথানের কাছে।

ভেস্ট চাপিয়ে আরেকটা পিস্তল গুঁজলাম বেল্টের পেছনে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলাম বনের কিনারে। ও, হ্যাঁ, হ্যাটও চাপিয়েছি মাথায় – ভোরে বিছানা ছাড়ার পর একজন কাউবয়ের ওটাই প্রথম কাজ।

ওরা সম্ভবত শহর থেকে তল্পিতল্পা গুটাচ্ছে।

ড্রুসিলা উঠে পড়েছে, সাত-সকালে কেশবিন্যাস সারা, ঝিকমিক করছে সূর্যকিরণে। আমাকে কফি এনে দিল।

'শান্তি হয়েছে?' বলল ও।

'থ্যাংক ইউ, ম্যাম... শান্তি? ম্, শান্তি কী এত সহজে আসে, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তবে যদি কাল রাতের কথা বলো – হ্যাঁ, হয়েছে শান্তি।'

'আমি তোমাকে ভাল জানতাম।'

'শুনে সুখী হলাম – যদিও জানি না কোন ধরনের লোককে ভাল বলে। আমার কাছে এর সংজ্ঞা আলাদা – প্রয়োজনের সময় যার ওপর নির্ভর করা যায় তাকেই ভাল বলি আমি।'

'মানুষ খুন করে সুখ পাও?'

'একটুও না, অন্তত পেশা হিসেবে। কিন্তু বিপদে জড়িয়ে পড়লে ভিন্ন কথা। এখানে শেরিফ নেই যে তার দরজায় যাব, অতএব নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হয়।

'অন্যের সুবিধে-অসুবিধের কথা যারা ভাবে না নিজের খেয়াল-খুশিমত চলে – তাদেরকে আমি একটুও পছন্দ করি না।

'যারা যুক্তি মানে, তাদের সাথে আপসের কথা বলা যায়। কিন্তু যারা গায়ের জোর ছাড়া কিছুই বোঝে না – তাদের সঙ্গে তর্ক করে কী লাভ?

'জো রাগারের কথাই ধরো – সৎ, বিবেচক। ক্যাপ সয়্যারও তাই। ওরা একটা কিছু গড়ার চেষ্টা করছে। আর অন্যেরা সেটা থেকে ফায়দা লোটার মতলবে আছে। এ-অবস্থায় আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?'

'তাই বলে তুমি নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারো না।'

'পারি, ড্রু, পারি। আমি যে-নিয়মে চলি, শত শত বছর ধরে মানুষ তা মেনে

আসছে। এ-ব্যাপারে পড়াশুনো করেছি আমি। মানুষ যখন কোনও সমাজে বাস করে, তখন কিছু সামাজিক বিধি নিষেধ মানতে হয় তাকে। ওইসব নিয়ম অমান্য করলে তার বিচার হয় – আর যদি বারবার ভঙ্গ করে, তা হলে সে আউট-ল হয়ে যায়।

'এখানে আইনকানুন বলতে কিছু নেই, নিজের শুভবুদ্ধিই মানুষের একমাত্র ভরসা। ফলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তার অস্ত্র তাকে ব্যবহার করতে হয়।

'জো রাগারকে দেখো। কিছু বাজে লোকের সঙ্গে এখানে এসেছিল সে। পরে আমাদের ঘোর দুর্দিনে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ও জানে, এ-জন্যে ওর মৃত্যুও হতে পারে।

'আমি লেখাপড়া জানি না, সে-ঘাটতি পোষানোর চেষ্টা করছি। বইপত্র পড়ছি ইদানীং। মানুষ যখন থেকে এক সাথে বাস করতে আরম্ভ করেছে, তখন থেকেই সে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়েছে।

'আমরা চাই এটা শান্তির শহর হোক। মেয়েরা যেন নিরাপদে বাজারে যেতে পারে, বাচ্চাদের নিশ্চিন্ত মনে স্কুলে পাঠাতে পারে অভিভাবকেরা। কিন্তু ওরা কী করছিল জানো? ওরা সেটা নষ্ট করতে চাইছিল।'

'এভাবে ভাবিনি আমি,' বলল ড্রুসিলা। এ-বার আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল।

'জানি, কেউই ভাবে না,' ক্ষোভের সাথে বললাম আমি। 'মানুষ একটিবার চিন্তা করে দেখে না, তারা আজ যে শান্তিপূর্ণ সমাজে বাস করছে, সেটা গড়তে গিয়ে প্রথমে যারা এসেছিল তাদের কত কষ্ট করতে হয়েছে।

'তবে এই তোমাকে স্পষ্ট বলে রাখছি, ওই শহরে স্কুল, চার্চ, হাসপাতাল হবে। আমেরিকার ফ্ল্যাগ উড়বে ওখানে। এ-জন্যে যদি আমাকে রক্তের নদীতে গোসল করতে হয় – করব।'

আমার মনোভাব বোধ হয় পছন্দ হলো না ওর। আড়ষ্টভাবে সরে গেল, বুঝলাম বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি।

কফির স্বাদ তেতো ঠেকল মুখে। কোনমতে শেষ করলাম। একটুবাদে জো বেরিয়ে এসে পাহারার দায়িত্ব নিল, ভেতরে গিয়ে আটারুটি আর ভেনিসন সহযোগে নাস্তা খেতে বসলাম আমি।

ক্যাপের অবস্থা উন্নতির দিকে। চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, পাণ্ডুর মুখে অনেকটা রঙ ফিরে এসেছে।

'হ্যালো, ক্যাপ,' বললাম আমি। 'জানতাম, এত সহজে মরবে না তুমি। যখন মরবে, সঙ্গে দু-চারটেকে নিয়েই মরবে। ঢের আরাম করেছ, এ-বার ওঠো – জো আর আমি হাঁফিয়ে উঠেছি তোমাকে ছাড়া।'

স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ক্যাপের চেহারা। 'কেমন বুঝছ অবস্থা?'

'ভালই। মনে হচ্ছে এখন সোজা আঙুলে ঘি উঠবে। আমি শহরে যাচ্ছি ওদের সাথে কথা বলতে। এই ফাঁকে আরেকটু দাওয়াই দেব।'

'হুঁশিয়ার।'

'আমি সব সময়ে হুঁশিয়ার, ক্যাপ,' বললাম, 'যখন পালানোর দরকার মনে করি – ঠিকই পালাই। এখন যাচ্ছি সামনাসামনি বোঝাপড়া করতে।'

'ইস, আমি যদি যেতে পারতাম...'

'থাক, তোমাকে আর বাহাদুরি করতে হবে না, যা করেছ এই ঢের। তা ছাড়া ওরাও যুক্তি মানবে বলে মনে হয়। আমার প্রস্তাবে রাজি হলে ভাল ' শ্রাগ করলাম, অসম্পূর্ণ রাখলাম কথা।

ক্যাপ যা বোঝার বুঝে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'কতজন?'

'বেশি না, জনাচল্লিশেক হবে।'

রাইফেলটা স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে, শহরে গেলাম। ওরা দেখতে পেয়েছিল আমি আসছি, কিন্তু কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। আমিও নির্লিপ্ত চেহারায় ওদের মুখোমুখি হলাম। মাত্র একজনকে চিনতে পারলাম – কুমড়ো, কিচের সঙ্গে এসেছিল আমাদের ক্যাম্পে। খুরের শব্দ পেয়ে অ্যাব ওয়ারেন বেরিয়ে এল। পিস্তল ঝোলায়নি।

'এই শহর আমাদের,' শুরু করলাম আমি। 'তোমরা এখানে অন্যায়ভাবে ঢুকেছ। আমাদের কাঠ চুরি করেছ, ক্যাপ এবং আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছ। কাল রাতে নিশ্চয়ই কিছুটা টের পেয়েছ এর পরিণাম কী। আমি এখন এসেছি ফয়সালা করতে।

'কিচের কাছে শুনে থাকবে, ক্যাপ এখানকার মেয়র – আমি টাউন মার্শাল। যেহেতু ক্যাপ অসুস্থ, দুটো দায়িত্বই পালন করছি আমি। এখানে থাকতে হলে তোমাদেরকে ভদ্রলোকের মত থাকতে হবে। এতে যদি কারও আপত্তি থাকে, এক্ষুণি ভাগো। পরে কিন্তু আর মুখে কথা হবে না – আমার সিক্স-শূটারই করবে সব কিছু।

'আর ওই ঘর ছেড়ে দিতে হবে,' ইঙ্গিতে দেখালাম দোকানটা, 'ওখানে মুদিখানা হবে – জো রাগার লিজ নিয়েছে ওটা।'

মুখ খুলল কুমড়ো। 'ওটা আমার, আমি বানিয়েছি।'

'কাঠ পেলে কোথায়?'

আমতা আমতা করল সে, তারপর ফাটল। 'তাতে কী? আমরা পড়ে পেয়েছি – নিয়েছি –'

'ওগুলো আমাদের,' কেড়ে নিলাম কুমড়োর মুখের কথা। 'ওর দাম একহাজার ডলার। হয় চুকিয়ে দাও, নয়তো ভাগো।'

'আমিও ছাড়ব না – পাই পাই করে শোধ তুলব!'

'দশ মিনিট সময় দিলাম তোমাকে, এর মধ্যে না গেলে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

এ-বার অন্যদের দিকে তাকালাম, এমন ভাব করলাম যেন কুমড়ো নেই ওখানে। সবাই কাঠখোট্টা কঠিন চেহারার মানুষ, তবে কিছু নিরীহ মুখ চোখে পড়ল।

'আমাদের একটা স্যালুন লাগবে এখানে – হোটেল, রেস্তোরাঁও চাই। তোমাদের কারও ইচ্ছে থাকলে বলো, আমরা সহযোগিতা করব।'

নিঃসন্দেহে কুমড়োই ওদের নেতা। রেগে টং হয়ে গেছে সে, কিন্তু নিশ্চিত বুঝতে পারছে না কজন তার পাশে এসে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে কয়েকজন সটকে পড়েছে। কিচ ও তার সঙ্গী নিহত। অ্যাব ওয়ারেনের মুখে ঘটনাটা শুনেছে ওরা।

হঠাৎ একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সামনে. মুখের দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। 'আমি আগে বাবুর্চির কাজ করেছি। রেস্তোরাঁটা আমাকে দাও।'

'বেশ, দাড়ি ছেঁটে সাফ-সুতরো হও। একমাস সময় পাবে তুমি, এর মধ্যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে ভাল, নইলে আমরা অন্য লোক দেখব।'

এরপর মুখ খুলল এক ছোকরা। কৃশকায়, ফ্যাকাসে চেহারা, দেখে মনে হয় অল্পদিন হলো পশ্চিমে এসেছে। 'আমি হোটেল ম্যানেজার ছিলাম পুবে, স্যালুনও চালাতে পারব।'

'ঠিক আছে।' বাঁ-হাতে আমার শার্টের বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলাম। 'প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব লেখা আছে এতে। তোমরা দুজন পড়ে জায়গা পছন্দ করো। তারপর কাজে হাত দেবে। লটারিতে ঠিক হবে কে আগে বানাবে। অপরজন সাহায্য করবে তাকে।'

এ-বার ফের কুমড়োর প্রতি মনোযোগ দিলাম। তাকালাম ওর দিকে। নিচু স্বরে ওর সাথে কথা বলছে একজন। শুনতে পেলাম কুমড়োকে সে বুচার বলে ডাকছে।

'বুচার,' ডাকলাম ওকে, 'আর তিন মিনিট সময় আছে তোমার হাতে।'

'দ্যাখো, ভাল হবে না বলে –'

আমার ঘোড়া সোজা এগিয়ে গেল ওর দিকে। 'একজন অসহায় বৃদ্ধকে তুমি আক্রমণ করেছিলে। তোমার লাভের জন্যে তুমি পারো না এমন কাজ নেই। তোমার মত লোকেরা সমাজের কোনও উপকারে আসে না।'

আরেক কদম আগে বাড়ালাম ঘোড়াটা, দোকানের বারান্দায় উঠে পড়ল কসাই। সিঁড়ির গোড়া অবধি ওকে ধাওয়া করল অ্যাপালুসা।

'ফিরে আসব আমি,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল বুচার। বিগলোরা এখনও সিলভারটনেই আছে।'

'এসো, তোমার জন্যেও একটা জায়গা রাখব আমরা,' বললাম, 'কিচের পাশেই।'

অ্যাব ওয়ারেন রয়ে গেল।

সকালেই বুচার চলে গেল শহর ছেড়ে, আরও পনেরোজন ওর সঙ্গী হলো।

ন্যায়ের পথে কেউ থাকলে তাকে রোখার সাধ্য নেই কারও। কথাটা এক টেক্সাস রেঞ্জারের। আমার বন্ধু ছিল সে; ছিল বলছি এই জন্যে যে, আজ আর ও নেই – এক অপারেশনে নিহত হয়েছে। জীবনে অনেক ভুল করেছি আমি, কিন্তু এ-বার ঠিক পথে আছি। আমাকে আমল না দিয়ে ওদের উপায় নেই। মারতে

চেষ্টা করবে, তবে সেটা সহজ হবে না – আমার প্রাণ খুব শক্ত।

সেই থেকে শুরু হলো লোক আসা। দ্বিতীয় হপ্তায় একজন অশ্বারোহী এল, তারপর দুটো ওয়াগন। ক্রীক-সংলগ্ন জায়গার দখল নেয়া হয়ে গেছে। প্রায় তিরিশটা ভেড়া নিয়ে এসেছে একজন, পাহাড়ের ধারে চরছে ওগুলো। জো রাগার দোকান খুলেছে, অ্যালিসন তার হোটেল। পরিত্যক্ত বড় তাঁবুটাই এখন হোটেল। এর আগে ওটা ছিল জুয়ার আড্ডা। ব্রিগসের রেস্তোরাঁ ভালই চলছে। সস্তা সাধারণ খাবার, তবে স্বাদু। গরুর মাংস আর মটরশুঁটি তো আছেই, পাশাপাশি ভালুকের মাংস, ভেনিসন আর এলক পাওয়া যায়।

এ-পর্যন্ত বিগলোদের দেখা পাইনি আমরা, তবে নানান উড়ো খবর কানে আসছে। টম ও ইরার কথাই শুনছি বেশি। সিলভারটনে একটা স্টেজ লুটের ব্যাপারে ওদের সন্দেহ করা হচ্ছে। ডেনভার সিটিতে একজনকে খুন করেছে টম। লিডভিলে দাঙ্গা হয়েছে, তাতে অংশ নিয়েছিল। ইরা জুয়াড়ি, সিলভারটন এবং আশপাশের ধনী ক্যাম্পগুলোতে তাস খেলে সময় কাটায়।

আমাকে খতম করবে বলে বড়াই করে বেড়াচ্ছে ওরা। একটু ফুরসত পেলেই নাকি ঠিকানা লাগিয়ে দেবে। আমার একটাই প্রার্থনা, সে-ফুরসত যেন ওদের জীবনে না আসে।

এর মাঝে দুবার পাহাড়ে গেছি, ফিরেছি সোনা নিয়ে...শেষযাত্রায় দুটো খচ্চরবোঝাই।

এসতেবান মেনডোযা আর টিনা এখানে চলে এসেছে। শহরে কেবিন বানিয়েছে একটা, পাহাড়ের লাগোয়া। সাপ্লাইয়ের কাজ ধরেছে এসতেবান, দুটো ওয়াগনে করে সিলভারটন রোড়ে মাল আনা-নেয়া করে।

আমাদের ক্যাম্প থেকে শহরে, নিজের বাসায় উঠে গেছে ড্রুসিলা কেরি। জো রাগারের দোকানে চাকরি করে ও। পোস্ট অফিস এবং ওয়েলস ফার্গো এক্সপ্রেসের কাজকর্ম একই সঙ্গে চলে ওখানে। কিচ আর তার সঙ্গীকে আমি খুন করার পর থেকে ড্রুসিলা সেই যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, এখনও সহজ হতে পারেনি আমার সঙ্গে।

ক্যাপ পুরোপুরি সেরে ওঠেনি, আস্তে আস্তে হাঁটাচলা করে। তাই এ-দিককার সব কিছু আমি একাই সারছি।

সন্ধ্যেয় হাতের কাছে কোনও খবরকাগজ পেলে পড়ি। ব্ল্যাকস্টোন শেষের পথে। মাঝে-মধ্যে আমাদের ক্যাম্পে মুসাফির আসে, দু-চারদিন থেকে ফের চলে যায়। ওদের অনেকের সঙ্গে বই থাকে, আমি সেগুলো চেয়ে নিয়ে পড়ি। তবে আমার অধিকাংশ সময় কাটে কাজে।

ঢালের ওপর দিকে আমাদের জন্যে তিন-কামরার বাড়ি বানিয়েছি। এর ঠিক পেছনেই পাহাড়ে ওঠার ট্রেইল, পাশে ঝরনা। শীত আসছে। আস্তাবলটা মজবুত করেছি আরও। কয়েক টন খড় কেটে এনেছি মাঠ থেকে।

কোনও কোনও চূড়ায় তুষার জমতে শুরু করেছে, ইতিমধ্যে ভোরে কুয়াশা

পড়ছে, গামলার পানিতে বরফ ভাসতে দেখলাম একদিন।

পুরোনো ব্যারিকেডটা তেমনি আছে, মেসার ঝোপঝাড় ছেঁটে ছোট করে রাখছি। চমৎকার ঘাস হচ্ছে ওখানে, আমাদের গবাদিপশু চরতে পারবে।

শহরে আমার পরিচিত লোকের সংখ্যা বেশি নয়। ক্যাপের অবর্তমানে মেয়রের দায়িত্বে আছে জো রাগার। অ্যালিসন আর ব্রিগস বিশ্বস্ত লোক। বুচার ফিরে এসেছে, ছোটখাটো জুয়ার আড্ডা খুলেছে। প্রায় দুশো লোকের বাস শহরে। আশা করছি আরও বাড়বে।

রঙ বদলাতে শুরু করেছে অ্যাসপেন, হলুদ হচ্ছে... মোটে কমাস হলো এসেছি, অথচ মনে হয় যেন কতকাল ধরে আমি আছি এখানে।

এর মাঝে সামান্য গোলমাল দেখা দিয়েছিল। বুচারের আড্ডায় দুজন জুয়াড়ি পরস্পরকে খুন করেছে। পোকার টেবিলে ওদের বচসার উৎপত্তি।

এক রাতে ক্যাপ এসে বসল আমার পাশে। 'এভাবে বই পড়লে,' বলল সে, 'তোমার চোখ যাবে।'

'কী করব, ক্যাপ, লেখাপড়া শিখতে হবে।'

'তুমি, দেখছি, তোমার ওই ভাইদের পথ ধরেছ। ওরাও বই পাগলা।'

'কেন – ওরা তো নিজেদের অবস্থা যথেষ্ট ফিরিয়েছে।'

'এবং বিয়ে করেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি, তারপর মৃদু সুরে বললাম, 'বিয়েতে দুজন মানুষ লাগে, ক্যাপ।'

'ড্রুসিলার কাছে গেছ ইদানীং?'

'জানোই তো – যাইনি।'

'মেয়েটা সুন্দরী। এভাবে একা পড়ে থাকবে না বেশি দিন। শুনছি ইরা বিগলোর নজর পড়েছে ওর ওপর।'

'বিগলো? এসেছে ও?'

'দিনকয়েক আগে – তুমি তখন পাহাড়ে। ঘণ্টাখানেক ছিল, তবে ওর মধ্যেই মোলাকাত করেছে ড্রুসিলার সঙ্গে। ইরা বেশ সুদর্শন।'

নীতিশাস্ত্র পড়ে বরফ বিশেষ কাটেনি, ভেতরে ভেতরে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে খাক হলাম। ড্রুসিলার পাশে বিগলোদের কেউ...দৃশ্যটা ভাবতেই বুড়ো ভালুকের মত নীচতা জাগল আমার মাঝে।

সন্ধ্যেয় বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আমি শহরের বাতি দেখি, তবে হরদম যাই না ওখানে। আবার পাহাড়ে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, চলতি মৌসুমে এটাই হবে শেষ যাত্রা। তুষারপাতের আগে আরও কিছু সোনা আনতে চাই। নতুন পথের হদিস মেলায় ঘোরা পথে যেতে হচ্ছে না, ফলে আমার সাফল্যের সম্ভাবনা পনেরো আনা।

'কাল খনিতে যাব,' বললাম ক্যাপকে। এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম ওখানে। 'জানো, ড্রুসিলারও একটা অংশ পাওয়া উচিত। ওই খনি খুঁজতে গিয়েই ওর

দাদুর মৃত্যু হয়েছে। একটা ম্যাপ ছিল তাঁর কাছে। আমার ধারণা, খনিতে যে-বর্মটা পেয়েছিলাম, সেটা ওদেরই কোনও পূর্বপুরুষের হবে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছিল। দেখছিলাম, তুমি নিজে থেকেই বলো কি না।'

আমার হ্যাট তুলে নিয়ে বললাম, 'যাই, ওর সাথে আলাপ করে আসি।'

'হ্যাঁ, যাও,' বলল ক্যাপ।

এমনিতেও যেতাম – আমার নতুন জামাকাপড় কেনা দরকার।

রওনা হব,' হঠাৎ থমকে গেলাম। এসতেবান মেনডোযা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

'সিনর, ওরিন? জরুরি কথা আছে।'

ঘরে ঢুকল সে। 'কাজ সেরে সন্ধ্যের পর ওয়াগনে বসে আরাম করছিলাম আমি। হঠাৎ কিছু লোকের কথাবার্তা কানে এল। ওরা বলছিল, তোমার কাছে নাকি সোনা আছে। এই পাহাড়েই কোথাও হবে খনিটা।'

'কে? তোমাকে দেখতে পেয়েছে?'

'না, অন্ধকার ছিল। একজনের নাম টুথহিল...ওরা ওকে বেশ সম্মান করছিল। আরেকজন বয়েড।'

ক্যাপ তাকাল আমার পানে। 'সুদূর লাস ভেগাস থেকে!'

'অন্যরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল এসতেবান। 'চিনি না। তবে তুমি আবার পাহাড়ে গেলে ওরা বোধ হয় পিছু নেবে।'

'থ্যাংকস, এসতেবান।'

ও বিদায় নিল, ভাবতে বসলাম আমি। আরেকবার ওখানে যাওয়া খুবই জরুরি। শুধু যে বাথান কিনব বলে যতটা সম্ভব সোনা সরিয়ে ফেলতে চাইছি, তা নয়; খনিতে আমি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি, সহজে মাল বের করবার জন্যে ট্র্যাক পেতেছি। এখন আর কেউ ওটার সন্ধান পেলে, খাটুনিটুকু যাতে পুষিয়ে যায়, সে-ব্যবস্থা অন্তত করা দরকার। বুঝতে পারছি এই যাত্রায় ঝুঁকি আছে, তবু আমাকে সেটা নিতে হবে।

ক্যাপের শরীর মোটামুটি, এসতেবান মাঝে মাঝে এসে খোঁজখবর নেবে। নিজেকে সামলাবার মত শক্তি ফিরে পেয়েছে ক্যাপ, তা ছাড়া শহরে ওর বন্ধুবান্ধব আছে।

'ড্রুসিলাকে দেখতে গেলে না?' তাড়া দিল ক্যাপ। 'রাত বাড়ছে।'

স্যাডলে চেপে রওনা হলাম শহরের উদ্দেশ্যে। ঝলমল করছে বাতিগুলো, আমার মনে শিহরণের ছোঁয়া।

ড্রুসিলা...

সহসা, ঝোপের ভেতর একটা ছায়া নড়ে উঠল, পাশ কাটানোর আগে এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম আমি। একটা লোক, নজর রাখছে আমাদের ক্যাম্পের ওপর।

এসতেবান মেনডোযার অনুমান নির্ভুল।

বারো

রাত, তবু দোকানে বেশ ভিড়। হাত নেড়ে অভিবাদন জানাল জো। আরেকটা কাউন্টারে ড্রুসিলা দাঁড়িয়ে। এক ঝলক তাকালাম সে-দিকে, নির্বিকার চেহারা, আমাকে দেখেছে কিনা বুঝলাম না।

অধিকাংশ খদ্দের নতুন, কেবল দুটো পরিচিত মুখ চোখে পড়ল।

'মি. ওসমান না?'

টুথহিল ওরফে ঝাঁটা-গোঁফ। লোকটার যেমন অন্তর, তেমনি ওর চেহারা। তবে থাকে ফিটফাট, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ।

'কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করলাম। 'এখানে যে? ব্যাংকের কী খবর?'

'ভাল।'

আড়চোখে তাকালাম ড্রুসিলার দিকে, হাত খালি, এগিয়ে গেলাম।

'ড্রুসিলা,' বললাম, 'আমার কিছু জামা কাপড় দরকার।'

ক্ষণিকের জন্যে আমাদের চারচোখ এক হলো। 'দিচ্ছি।'

ফরমাশ দিলাম ওকে, অনুভব করছি অনতিদূরে-দাঁড়ানো টুথহিলের দৃষ্টি সেঁটে আছে আমাদের ওপর। গোটাচারেক শার্ট, জিনস, মোজা, এবং একটা শীপস্কিন কোট নিয়ে এল ড্রুসিলা।

'...আর দুবাক্স .44 কার্তুজ,' বললাম আমি।

ঝট করে চোখ তুলল সে, ঈষৎ কঠিন হলো চেহারা। তারপর ঘুরে, অ্যামুনিশন শেলফ থেকে দুটো বাক্স এনে রাখল কাউনটারে।

'ড্রুসিলা,' বললাম আমি, 'তোমার সাথে কথা ছিল।'

'আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বলে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ,' বলল ও, 'এ ছাড়া আর –'

'ড্রু, ওই সোনাতে তোমার ভাগ আছে। তোমার দাদু খুঁজছিলেন ওটা, সম্ভবত তাঁর কোনও পূর্বপুরুষ প্রথম ওই খনির হদিস পেয়েছিলেন। সুতরাং, একটা ভাগ তুমি পাবে।'

'যা ভাল বোঝো তুমি। এত কথার কী দরকার।'

দাম নিয়ে আমাকে খুচরো ফেরত দিল ও।

'ড্রু,' বললাম আবার, 'ওদেরকে গুলি না করে আমার উপায় ছিল না।'

'তাই? তুমি একটা নিষ্ঠুর, অথচ আমি কত কিছুই না ভেবেছিলাম–'

মাঝপথে কথা থামিয়ে ড্রুসিলা সরে গেল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম আমি।

টুথহিল পাশে এসে দাঁড়াল। 'ড্রুসিলা কেরির সাথে তোমার আলাপ আছে

জানতাম না তো,' বলল সে।

'তোমার খুব বাজে স্বভাব তো, আড়ি পাতো?' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলাম আমি। 'দ্যাখো, টুথহিল, এই শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি, আমার পেছনে লাগতে এসো না। তুমি লোক সুবিধের নও, চোর। নিজের মঙ্গল চাও তো, মানে মানে কেটে পড়ো। আর, হ্যাঁ, ওই বয়েডকে নিয়ে যাবে। ওকে যেন আর না দেখি – বুঝেছ? দেখলে কিন্তু তোমাদের দুজনের কপালেই খারাবি আছে।'

ওকে পাশ কাটিয়ে রওনা হলাম দরজার উদ্দেশে। 'কী ব্যাপার, ওরিন?' কাউন্টার থেকে জানতে চাইল রাগার।

ড্রুসিলা সভয়ে দেখছে আমাকে। লাস ভেগাসের রাস্তায় উইল বয়েড় আমাকে অনুসরণ করেছিল, টুথহিলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক, বা আজ সন্ধ্যেয় এসতেবান কী বলেছে আমাকে সে-সব কিছুই ও জানে না। টুথহিলের হাবভাব দেখে বোঝার উপায় নেই লোকটা ভেতরে ভেতরে আস্ত শয়তান। স্বভাবতই ওর সাথে আমার দুর্ব্যবহারে ঘটনাটা ড্রুসিলা ভাল চোখে দেখবে না।

'কিচ্ছু না, জো,' গলা নামালাম আমি। 'টুথহিল আমার ক্লেইমের ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করছিল। ওর সাথে কিছু ভাড়াটে গুণ্ডা আছে। লাস ভেগাস থেকে আমার পিছু নিয়েছে।'

ফিরতি পথে মন স্থির করলাম আমি। কাল ভোরের আগেই যাত্রা করব পাহাড়ে। এর ফলে সহজে কেউ আমার নাগাল পাবে না, বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকব। তারপর সোনাসহ দক্ষিণে মোরায়, বা আর কোথাও গিয়ে বাথান কিনব। ড্রুসিলার যা খুশি করুক, আমি আর মাথা ঘামাব না ওর ব্যাপারে।

যতবার ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছি, ততবার একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটছে – দাগ পড়ছে আমার চরিত্রে। ওর চোখের সামনেই কিচকে খুন করেছিলাম।

ক্যাপ হয়তো আমার চেহারা দেখেই গোলমাল আঁচ করে থাকবে, নীরবে নতমুখে বসে রইল। মালপত্র বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেললাম আমি। তারপর দুটো প্যাক স্যাডল বের করলাম। অ্যাপালুসা এবং দুটো প্যাক হর্স নিয়ে যাব। সাজপোশাকের তেমন প্রয়োজন নেই...বড়জোর দু-তিনদিন থাকব বাইরে।

তবু সাবধান থাকা ভাল, তাই এক হপ্তা চলার মত খাবার, এবং আমার গান বেল্ট ছাড়াও আরও চার বাক্স .৪৪ কার্তুজ নিলাম সঙ্গে। যখন স্যাডলে চাপলাম, সূর্য উঠতে তখনও এক ঘণ্টা বাকি।

'বি কেয়ারফুল,' হুঁশিয়ার করল ক্যাপ।

'টুথহিলকে দেখলাম। সোনার গন্ধ পেয়েছে ব্যাটা। নির্ঘাত পিছু নেবে।'

পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে উত্তরে রওনা হলাম আমি, গাছপালার আড়ালে আড়ালে যাচ্ছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভ্যাপসা গন্ধ বাতাসে।

রক ক্রীক যেখানে ভ্যালেসাইটোসে ঢুকেছে, সেখানে পৌছে পানিতে

নামলাম, বাঁক ঘুরলাম দক্ষিণপুবদিকে। ভোরের আলো ফোটার আগেই ধুয়েমুছে যাবে ট্র্যাক।

একটুবাদে একটা ঢালের মাথায় উঠে পেছনে তাকালাম আমি। মোটা তুলি দিয়ে আকাশে রঙ লেপছে সূর্য। দূর-নীচে, কয়েক মাইল পেছনে, নড়াচড়া চোখে পড়ল। রাইফেলের নলে সূর্যের প্রতিফলন ধরা পড়ল মুহূর্তের জন্যে।

ওদেরকে সেধে খনির পথ দেখানোর কোনও অর্থ হয় না। বাঁয়ে মোড় নিয়ে একটা বিপজ্জনক খাঁজের মাথায় চড়লাম, মাঝে বারকয়েক ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে মুছে এলাম আমার ট্র্যাক, তারপর স্যাডলে চেপে পুবদিকে রওনা হলাম। প্রায় আধ-মাইল দূরে একটা ডোবা চোখে পড়ল, উপত্যকায় যেটা আছে তার চেয়ে বড়। জোরকদমে ছুটলাম ও-দিকে।

ডোবার কিনারে ক্যাম্প করলাম রাতের মত, আগুন ধরালাম না।

গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল। উঠে পড়লাম ঝটপট। দ্রুত স্যাডলে চেপে সরে গেলাম ওখান থেকে। প্রায় ডজনখানেক ছোট ছোট খানাখন্দ পেরিয়ে উঠে এলাম একটা পাহাড়চুড়োয়। মাইলের পর মাইল আজন্ম রুক্ষ বিস্তার, মর্ত্যলোকে এমন ভয়ঙ্কর সুন্দর জায়গা বোধ করি আর একটিও নেই।

তীব্র হুল ফোটাচ্ছে বৃষ্টির ছাঁট। নড়াচড়ার আভাস নেই কোথাও। স্বর্ণ-উপত্যকায় নেমে গেলাম আমি। যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনি আছে খনিটা। তবে জলপ্রপাতের প্রান্তবর্তী ট্রেইল তলিয়ে গেছে দুফুট পানির তলায়। বৃষ্টিতে শিগগিরই চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। অন্য রুটে ফিরতে হবে আমাকে।

খনিতে ঢুকলাম ঘোড়া বেঁধে, হাত দিলাম কাজে। সামান্য প্রয়াসেই খুলে আসছে পাথর; পচা স্ফটিক, বুটের চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

ঝেঁপে বৃষ্টি পড়ছে... বেশিক্ষণ এভাবে চললে বরফ জমে যাবে।

ড্রুসিলা বা আর কারও ব্যাপারে ভাবার সময় নেই এখন... সোনা উদ্ধার করেই সরে পড়তে হবে।

আবার যখন বাইরে এলাম, বৃষ্টি ছেড়ে গেছে, তবে আবহাওয়া কেমন যেন গুঙ্ক – লঘুভার। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম, ঘোড়াগুলোও ছটফট করছে।

উপত্যকার উল্টোদিকে ঘেসো জমিতে কয়েকটা হরিণ ও এলক চরছে। ঝড়ের পূর্বাভাস? সাধারণত ওরা সূর্যাস্তের সময় নেমে আসে। থমথমে গুমট পরিবেশ, চুড়োর কাছে মেঘ জমছে। ফের বৃষ্টি শুরু হলো, অনেকটা কুয়াশার মত।

খনিতে ফিরে আরও একটা ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করলাম। তারপর কফি বানালাম আগুন জ্বেলে। খিদেয় ঝিমঝিম করছে মাথা, অথচ আবহাওয়ার কারণে দুদণ্ড বিশ্রাম নেব তার জো নেই। মনে হচ্ছে ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। আমার অস্থির বোধ করার পেছনে এটাও অন্যতম কারণ।

বেলা ডুবে গেছে। আমার কাজে বিরাম নেই। খনির এই অংশটা যদি পকেট হয় তবে আশ্চর্য হব না। সে-ক্ষেত্রে তলদেশের স্ফটিক কঠিনতর হওয়াই

স্বাভাবিক। স্ফটিক ভাঙতে ঘানির প্রয়োজন পড়বে। পরিস্থিতি তেমন দাঁড়ালে বেকায়দায় পড়ে যাব – ঘানির ব্যবহার আমি জানি না। আনাড়ি।

রাতে গুহার কাছাকাছি সরিয়ে আনলাম ঘোড়াগুলো, অনেকটা ভেতরে গিয়ে আগুন ধরালাম, তারপর খানকতক যবের রুটি তৈরি করে খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে গেল মাঝ-রাতে।

ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা পড়েছে। এতটা শীত পড়বে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ঘোড়াগুলো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে, ঘাড় নামানো। গুহার বাইরে পা রাখতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম – চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ।

আকাশ ফুটো করে অবিশ্রাম তুষার পড়ছে, চিকচিক করছে চন্দ্রালোকে। গাছ-পালায়, পাহাড়-পর্বতে, ঘাসে চকচকে বরফ। উইলো শাখায় ঝুলছে ভাঙা কাচের টুকরোর মত।

মনে হলো যেন এক মায়ালোকে এসে পড়েছি আমি – অপূর্ব সুন্দর, অথচ মৃত্যু-ভয়াল।

ওই বরফ থাকা অবস্থায় প্রতিটি ট্রেইল চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। ঘোড়া তো ছার, হাঁটতে গেলেও ভয় পাবে মানুষ। ড্রুসিলা যে-পথে উপত্যকায় এসেছিল, সেটার কথা মনে পড়তেই আমার চুল দাঁড়িয়ে গেল।

রোদ উঠলে গলে যাবে দ্রুত। কিন্তু এটা মৌসুমের শেষ...যদি আগে বরফ পড়ে? সামান্যতম চাপেই তুষারধসের আশঙ্কা আছে।

ভেতরে গিয়ে বড় করে আগুন ধরালাম, তারপর একটা ছালা হাতে বাইরে এসে গা মুছতে শুরু করলাম ঘোড়াগুলোর। অসহায়ের মত অনড় দাঁড়িয়ে রইল ওরা, চোখে শঙ্কা। বুঝতে পারছে, আমি ওদের সাহায্য করতে চাইছি।

এত ভয়ানক তুষার-ঝড় আগে কখনও দেখিনি, নেভাদার পগোনিপস-এর কাছে নস্যি। বরফের ভারে অসংখ্য ডালপালা ভেঙে গেছে। সাসা সাদা বরফ ঝকঝক করছে আয়নার মত।

খাবার...এ মুহূর্তে আমার ওটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। এই ঠাণ্ডায় শরীর গরম রাখতে নিত্যকার চেয়ে বেশি খাবার লাগবে। কতদিন থাকতে হবে বলা যাচ্ছে না এখন – হয়তো সারা শীতকাল।

সময় নষ্ট করা চলবে না। প্রতিপদে, এমনকী সমান্ জায়গাতেও, পা ভাঙার ঝুঁকি আছে। সব ট্রেইল অবরুদ্ধ, সোনা আমার কোনও কাজে আসছে না। এখন থেকে শুধু বাঁচার লড়াই।

ভোর হতে ঘণ্টা দুয়েক দেরি আছে, কুঠার নিয়ে বাইরে গেলাম আমি, প্রমাণ মাপের দুটো গাছের গুঁড়ি কেটে আনলাম গুহায়। এর ফলে জ্বালানির মজুদ বাড়ল।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়াগুলো, পিচ্ছিল মাটিতে নড়াচড়া করতে ভয় পাচ্ছে। বেলচার আঘাতে ভেঙে ফেললাম ওদের আশপাশের বরফ, খনি থেকে কয়েক বেলচা পাথর নিয়ে ছড়িয়ে দিলাম ওখানে।

বনে গিয়ে বরফ খসিয়ে ফেললাম একটা গাছের গুঁড়ি থেকে, মোটা ডালপালা কেটে ফিরে এলাম গুহায়। চাঁদের আলো মুছে গেছে। আরও কিছু লাকড়ি গুঁজে দিলাম আগুনে, তারপর পরবর্তী কর্মপন্থা ভাবতে বসলাম। হাল ছাড়া চলবে না, খুঁজলে বেরোনোর রাস্তা হয়তো পেয়ে যেতে পারি একটা।

সকালে উঠেই শিকারে যেতে হবে। ঠাণ্ডায় পচবে না মাংস।

ভোর হলো। আকাশ মেঘে ঢাকা। বুঝলাম ঠাণ্ডা বাড়বে। হরিণের খোঁজে বেরোলাম। বরফের কিনারে সরে গেছে অ্যাপালুসা, ঘাসের সন্ধানে আঁচড়াচ্ছে খুর দিয়ে। এটা মনট্যানার ঘোড়া, এ-কাজে অভ্যস্ত।

দুপুরের সামান্য আগে মাদি হরিণ পেলাম একটা।

রাতে জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়ল। হরিণ কাটাকুটি হয়ে গিয়েছিল, মাংস ঝুলিয়ে দিলাম। সাবধানে ছাল ছাড়িয়েছি, চামড়া নষ্ট হতে দেইনি। এখানে যদি পুরো শীত কাটাতে হয়, এ-রকম চামড়া লাগবে আমার।

বিপদের আশঙ্কায় ঘুমানোর সাহস পেলাম না রাতে, কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে রইলাম আগুনের পাশে। গুহামুখে দেয়াল তুলতে হবে। বাতাসের সঙ্গে ঠাণ্ডা ঢুকছে ওই পথে। পরদিন সকালেও মেঘ কাটল না, ধারাল বাতাস চলছে সাঁই-সাঁই, হাড় অবধি ঢুকে যাচ্ছে, ঈষৎ দুলছে তুষারাবৃত ডালপালা, কঙ্কালের হাতের মত বাড়ি খাচ্ছে পরস্পর।

জমাট-বাঁধা ঘাসের দিকে তাকিয়ে মলিন মুখে ঘোড়াগুলো লেজ নাড়ছে। বরফের খোঁচায় ছড়ে গেছে ওদের ঠোঁট, মাথা নিচু করে ফিরে এল আমার কাছে। ঝরনার ভাটিতে ঘাসগুলো লম্বা, বরফ ভেঙে আমি কিছুটা কেটে এনে দিলাম।

এভাবে চলতে পারে না। যেভাবেই হোক নীচে নামতে হবে আমাকে। সম্ভব হলে ঘোড়াগুলো নিয়ে যাব সঙ্গে। তবে বুঝতে পারছি তা হবার নয়...আমার অভাবে এই নির্জন উঁচু উপত্যকায় মৃত্যুই লেখা আছে ওদের কপালে।

রাতে হরিণের মাংসের কাবাব বানিয়ে সাপার করলাম। বাইরে টানা তুষারপাত হচ্ছে। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখনও থামেনি। পা মচকে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে একটা ঘোড়া। আমি গুলি করে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকেই রেহাই দিলাম ওকে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল সেই আওয়াজ।

ঝিরিঝিরি তুষার পড়ছে, হাঁটতে হাঁটতে জলপ্রপাতের ধারে গেলাম। জমে গেছে ঝরনা, একটা বিশাল তুষারপিণ্ডে পরিণত হয়েছে জলপ্রপাত। পানি আরও বেড়েছে, ট্রেইলটা তলিয়ে গেছে কয়েক ফুট। ওই পথে বেরোনোর চিন্তা এককথায় অসম্ভব।

ড্রুসিলা তার দাদুর সাথে একটা শীত এখানে কাটিয়েছিল। কীভাবে?

ওদের গুহাটা আরও বড়, পুরু ছাউনি। পাথরচাঁইয়ের ভিড়ে পর্যাপ্ত জ্বালানি কাঠ আছে। ওই ট্রেইল বেয়ে ওখানে নামা কি সম্ভব হবে?

ক্যানিয়ন পর্যন্তই কি যেতে পারব? ব্রিসল-কন পাইন ঝোপটা অনেক উঁচুতে, বাতাস ওখানে পূর্ণবেগে বইছে, ঠাণ্ডাও বেশি হবে। দুরারোহ ঢালে ওই ট্রেইল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বরফের আস্তর জমে গেছে।

ওটা হবে আমার শেষ অবলম্বন। আপাতত এখানে থেকেই দুর্যোগ পাড়ি দেবার চেষ্টা করতে হবে।

কোদাল নিয়ে বাইরে গেলাম, আরও কিছুটা বরফ ভেঙে ন্যাড়া করে দিলাম ঘাস যাতে ঘোড়াগুলো লড়াইয়ের সুযোগটুকু অন্তত পায়। জমাট-বাঁধা ঘাস নিজেরে চেষ্টায় আয়ত্তে আনবার কায়দা ওরা জানে, কিন্তু বরফে ওদের ঠোঁট, জঙ্ঘাদেশ কেটে-ছড়ে গেছে।

সহসা তড়াক করে মাথা তুলল অ্যাপালুসা, কান খাড়া করেছে।

উইনচেস্টার বাগিয়ে ধরলাম আমি। বরফের চাদর ভেদ করে যতদূর দেখতে পাচ্ছি, কিছুই নড়ছে না। শোনার প্রয়াস পেলাম, চরাচর নিস্তব্ধ।

খুউব সাবধানে ক্রীকের প্রান্তে উইলো ঝোপের কাছে এগিয়ে গেলাম, একগুচ্ছ লম্বা ডাল কেটে নিয়ে এলাম গুহায়।

বাইরে গেলে আমার সাথে সর্বদা একগোছা চামড়ার ফিতে থাকে, অধিকাংশই শুয়োরের রগ, মার্কা লাগানোর সময় গবাদি পশুর পা বাঁধতে প্রয়োজন হয়। চারণভূমিতে প্রত্যেক কাউহ্যান্ডের কাছে এ-জিনিস থাকে খানিকটা। জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্যে রাখে। ওগুলো ব্যবহার করব এখন।

নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ঘোড়াদুটোর মাঝে, সারাক্ষণ গুহার সামনে রয়েছে। পুরো সকাল এবং বিকেলের কিছু সময় স্ফটিক ভেঙে যতটা সম্ভব সোনা বের করে নিলাম।

উইলো ডালগুলো যখন আবার নমনীয় হলো, ডিমের মত বাঁকালাম প্রতিটাকে। তারপর সেরা দুটো বেছে নিয়ে দুমাথা বাঁধলাম একত্রে। এ-বার কোনাকুনিভাবে চামড়ার ফিতে জড়াতেই তৈরি হয়ে গেল একজোড়া স্নো-শূ।

সন্ধ্যে ঘনাতে এখনও বাকি রয়েছে কিছুক্ষণ। জুতোজোড়া পরখ করতে বাইরে বেরোলাম, হাতে রাইফেল। আমার জীবনে স্নো-শূ প্রস্তুত এই প্রথম নয়, ভালই কাজ দিচ্ছে। জলপ্রপাতের কাছে গিয়ে দেখলাম, বরফের পরিমাণ আরও বেড়েছে ইতিমধ্যে।

ঘুরে ড্রুসিলার গুহার উদ্দেশে রওনা হলাম। মোচাকৃতি পাইন ঝোপের কাছাকাছি গিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম, অন্ধকার নামার আগেই আস্তানায় পৌঁছুতে হবে। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল।

বিস্ময়ে জমে গেলাম, বিষণ্ন পর্বতমালায় প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। একসময় মিলিয়ে গেল শব্দ, তবু দাঁড়িয়ে রইলাম, ঠাণ্ডায় কাঁপছি মৃদু, অনন্ত আকাশ আর হিমরাজ্যে আমি একা, নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

গুলি...এখানে!

আওয়াজটা নীচের ক্যানিয়ন থেকে এসেছে। কেউ আছে ওখানে। ড্রুসিলার গুহার কাছেপিঠে।

এখানে? এই জায়গায়?

তেরো

আচমকা চিড় ধরেছে বরফচাঁইয়ে...তুষারের চাপে কোনও গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে?...না। গুলিরই শব্দ – স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, সন্দেহাতীত।

ওরিন, বললাম আপনমনে, তু...তুমি একা নও।

ওই গুহার কথা কে কে জানে? আমার জানামতে একমাত্র ড্রুসিলা। ক্যাপ ভাসাভাসা শুনেছে আমার কাছে। এমনকী সঠিক পথনির্দেশ জানলেও ওর পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়, শরীর এখনও দুর্বল।

ড্রুসিলা? তাই-বা হয় কী করে? ওর আসবার কোনও কারণ নেই।

বাকি থাকছে আমার অনুসরণকারীরা। ওরা উপত্যকায় ঢোকার কোনও রাস্তা খুঁজে পেয়েছে? অসম্ভব নয়।

এখন আমি ক্যানিয়নের উদ্দেশে রওনা হলে, পৌঁছুতে পৌঁছুতে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাবে। এবং কিছুই দেখতে পাব না। অতএব, খনিতে ফিরে গিয়ে ভোরের অপেক্ষায় বসে থাকাই ভাল।

একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে; ওই লোকগুলো যদি ক্যানিয়নে এসে থাকে, আমার মত ওরাও বরফে আটকা পড়েছে। এবং সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ওদের অবস্থা আমার চেয়েও সঙ্গিন। এ-রকম পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমার সমান দক্ষ নয় ওরা।

পাহাড়ে থাকতে করবার মত আমাদের কিছুই ছিল না; কিন্তু আমরা, ওসমানেরা, আর কিছু না হোক একটা ব্যাপারে পটু: জানি, এই গোলকধাঁধা থেকে কীভাবে উদ্ধার পেতে হয়। কৈশোরেই আমরা পাহাড়ের প্রতিটি ইঞ্চি চষে ফেলেছি। প্রায় সবাই বাড়ি ছেড়েছি ষোলো বছর বয়েসে।

আমার গোটা জীবনটাই, বলতে গেলে, কঠোর পরিশ্রমের যোগফল। অধিকাংশ সময় কেটেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, লড়াইতে। ক্ষুধাতৃষ্ণার সাথে সংগ্রাম করেছি বহুবার। এ-রকম পাহাড়ী এলাকায় আটকা পড়া আজ নতুন নয়। ফলে, আমি ঠিকই টিকে যাব। কিন্তু ওরা...?

ক্যাম্পে ফিরে দেখালাম গুহার আশপাশে চরছে ঘোড়াগুলো। ভেতরে এনে দলাইমলাই করলাম ওদের। আমরা যে বিপদে পড়েছি, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি ওদের আছে। তবে যত্নআত্তি পেলে নিশ্চিন্ত বোধ করবে অনেকটা।

আগুন ধরিয়ে পরনের শীপস্কিন কোট খুলে ফেললাম। তারপর ভেস্ট

খসিয়ে ফের গায়ে দিলাম ওটা। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বাইরে গেলে বাড়তি কাপড় পরা আমার অভ্যেস। তবে এ-সব ক্ষেত্রে সবর্দা লক্ষ রাখতে হয় শরীর যেন না ঘামে। চলাফেরা বন্ধ করলে কাপড়ের তলায় ওই ঘাম জমে বরফে পরিণত হবার আশঙ্কা থাকে।

রান্না সেরে আগুনের পাশে ব্ল্যাকস্টোন খুলে বসলাম। মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে উসকে দিচ্ছি শিখা।

গত কমাস যাবৎ গভীর রাত অবধি বিছানায় জেগে কাটাচ্ছি আমি। নতুন যা পড়েছি তা নিয়ে ভাবি, চেষ্টা করি বইয়ের ভাষায় কথা বলতে। আসছে বসন্তের আগেই আমার বাচনভঙ্গি উন্নত হবে বলে আশা করছি।

আবার তেমনি, অনেক সময় ড্রুসিলা সম্পর্কে চিন্তা করি। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ওকে ফিরিয়ে এনেছি আমি। ভেবেছিলাম ও-ই হবে আমার জীবনসঙ্গিনী। বহু দিবাস্বপ্ন দেখেছি ওকে ঘিরে।

কিন্তু এখন আর ভাবার মত অবশিষ্ট নেই কিছু। সে-দিন রাতে দোকানে ও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে সেটা। কিচকে গুলি করবার সুযোগ দিলেই বোধ হয় ড্রুসিলা খুশি হত। তবে এ-নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। প্রেমঘটিত ব্যাপারে অনেক পুরুষের আত্মাহুতি দেবার কথা শুনেছি – কিন্তু এটা আমার বিবেচনায় চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।

মেয়েরা বাস্তববাদী। ওরা সরাসরি আঁটি ভেঙে শাঁসটি খেতে পছন্দ করে, কোনও মেয়েই তার পূর্বপ্রেমিককে মনে রাখে না। এটা তাদের কাছে বাজে কাজের শামিল। আসলে ভালবাসার জন্যে বাঁচতে হয়, মরতে নয়।

মেয়েদের এ এক অদ্ভুত স্বভাব। প্রত্যাখ্যান করতে বাধে না, সহজে ভুলে যায়, অথচ তার প্রেমিক আর কাউকে নিয়ে নীড় বাঁধুক এটাও সে চায় না। বরং প্রেমের অনলে আত্মবলি দিলেই ওরা বেশি খুশি হয়।

হু-হু হাওয়া আসছে গুহামুখ দিয়ে। শীত শীত করছে আমার। যতবার প্রতিজ্ঞা করছি ড্রুসিলার কথা আর ভাবব না, ততই যেন পেয়ে বসছে ওর চিন্তা – আগের চেয়ে বেশি করে মনে পড়ছে। মানসপটে ভাসছে ওর মুখ, মেহেদি রঙের চুল। অনুভব করছি আমার গলার ভেতরে একটা কান্না দলা পাকিয়ে আছে। ছি, নিজেকে আবার চোখ রাঙালাম আমি, ব্যাটাছেলের কাঁদতে নেই।

খেতে বসলাম, ঢুকল না গলা দিয়ে। উঠে পড়লাম একটা নাড়াচাড়া করে। সকালের জন্যে তুলে রাখলাম খানিকটা। তারপর স্যাডলব্যাগে বইটা রেখে শুয়ে পড়লাম।

সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক আগে শয্যা ত্যাগ করলাম। নাস্তা খেয়ে ঘোড়াদুটোকে নিয়ে গেলাম ক্রীকের ধারে। কুঠারের সাহায্যে গর্ত খুঁড়ে পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম ওদের জন্যে। বরফ ভেঙে ঘাস ছড়িয়ে দিলাম, অবশ্যি চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য।

এরপর বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে স্নো-শূ; পিঠে বোঝা, দড়ি; হাতে

রাইফেল। ক্যানিয়নের ট্রেইলে যখন পৌঁছুলাম, তখন ভোরের আলো ফুটছে সবে।

তুষারে ঢাকা ট্রেইল। এক জায়গায় ময়লা লেগে আছে, আছাড় খেয়েছিল কিছু।

দেয়ালের সাথে সেঁটে সাবধানে নামতে শুরু করলাম আমি। যেখানে পারছি দেয়ালের ফাটল বা এবড়োখেবড়ো পাথর ধরে নজের ভারসাম্য রক্ষা করছি। ময়লা দাগটার কাছে পৌঁছে দেখলাম ইতিমধ্যে তুষারে ঢাকা পড়েছে অনেকটা। অর্থাৎ, গেল রাতের ঘটনা; এবং জিনিসটা যাই হোক না কেন – গড়িয়ে ক্যানিয়নের ও-পাশে চলে গেছে। বুকে হেঁটে সরে গেলাম কিনারের দিকে। এখানে-সেখানে তুষারের স্তূপ জমা করেছে বাতাস, একটা সরু কারনিস সৃষ্টি হয়েছে। কোনও লোক ওখানে দাঁড়ালে নির্ঘাত ভেঙে পড়ে যাবে। সন্তর্পণে ঝুঁকে আমি নীচে উঁকি দিলাম।

ড্রুসিলা।

প্রায় বিশ ফুট নীচে একটা সঙ্কীর্ণ শৈলশিরার ওপর পড়ে আছে। সারা শরীর তুষারে মাখামাখি। মেঘ চিরে ক্ষীণ সূর্যালোক এসে পড়েছে। সেই আলোয় বরফের পটভূমিতে জ্বলজ্বল করছে ওর মেহেদি রঙের চুল।

রাইফেলটা নামিয়ে রেখে তাকালাম আশপাশে। ব্রিসল-কন পাইনের একগোছা শেকড় চোখে পড়ল, পাহাড়ের গা ফেটে বেরিয়ে আছে। শেকড়ের সাথে দড়ি বেঁধে নেমে গেলাম ওর কাছে। পুরু বরফ জমেছে কারনিসে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বড়জোর দশ ফুট।

দুআঙুলে ওর পালস দেখলাম আমি, কান পাতলাম বুকে। না, এখনও বেঁচে আছে।

পাঁজাকোলা করে জড়িয়ে ধরলাম ওকে, গালে কানে আমার মুখ ঘষে শরীর গরম করতে চেষ্টা করলাম।

ওর দুবগলের নীচ দিয়ে শক্ত করে বোলাইন নট বাঁধলাম একটা। তারপর দড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ওপরে। যখন আমার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলো, টেনে তুললাম।

বেলা চড়ে গেছে। দিনের আলোয় এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারদিক। বোলাইন খুলে গুটিয়ে নিলাম দড়ি, ফিতে বাঁধলাম স্নো-শূর, তারপর ড্রুসিলাকে কোলে করলাম। সুপুরির মত ফুলে আছে ওর কপাল, তবে, অনুমান করলাম, ঘন চুল আর তুষারের কারণে মারাত্মক চোট পায়নি।

দুকদমও যাইনি, হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। পরক্ষণে একটা রাইফেলের গুলি হলো। পাঁই করে ঘুরলাম আমি। দূর নীচে ক্যানিয়নের ভেতর নড়াচড়া চোখে পড়ল, বরফের পটভূমিতে কয়েকটা কালো ফুটকির মত।

কেঁপে উঠল ড্রুসিলা, চোখ মেলল। চকিতে যতটা সম্ভব পিছিয়ে গেলাম আমি, হেলান দিলাম দেয়ালের গায়ে। ড্রুসিলা নেমে পড়ল কোল থেকে।

'ওরিন? ওরিন...আমি ভেবেছিলাম –'

'কেমন বোধ করছ এখন?'

'ভাল!' ম্লানভাবে হাসল ড্রুসিলা। 'আ...আমি পড়ে গিয়েছিলাম।'

'তাই।' দেয়ালের সাথে সেঁটে রওনা হলাম আমরা। আমার এক হাতে রাইফেল, অন্য হাতে ড্রুসিলাকে ধরে আছি। আবার গুলি ছুঁড়ল, আমার কাছাকাছি একটা পাথরে বাড়ি খেল বুলেটটা। দেখলাম, লোকগুলো ট্রেইলের গোড়া লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছে। একজন পড়ে গেল, কিন্তু অন্যরা থামল না।

'ওরা?' ইঙ্গিতে দেখালাম ট্রেইলটা।

'মি. টুথহিল। সঙ্গে ইরা বিগলো, টম, উইল বয়েড। আরও দুজন আছে। সবাইকে চিনি না আমি – তবে একজনের নাম বোধ হয় বেন।'

বেন হবস?

'ওরা আমাকে আসতে বাধ্য করেছে, ওরিন। জানের হুমকি দিয়েছে। তা ছাড়া...তুমি ফিরে আসোনি, আমি ভয় পাচ্ছিলাম।'

তীরের ফলার মত কনকনে হাওয়া বিঁধছে হাড়ে। মেঘ কেটে যাচ্ছে, বাতাসের তোড় বাড়ছে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছি আমরা, বরফে দেবে যাচ্ছে পা। ট্রেইলের মাথায় পৌঁছে ড্রুসিলাকে পরিয়ে দিলাম স্নো-শূ।

পেছনের লোকগুলো উঠে আসতে শুরু করেছে। ওরা ছয়জন, সোনা চায়; তবে ওদের মূল লক্ষ্য আমি: খুন করবে আমাকে। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ড্রুসিলাকেও মেরে ফেলবে।

'তুমি এসেছ কেউ জানে?'

'না। আমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিল টুথহিল। সোনার খবরও বোধ হয় জানত। অনুমান করেছে খনিটা কোথায় হয়তো আমি জানি। আমার কেবিনে এসে পার্টনারশিপের প্রস্তাব দেয় সে, আমি নাকচ করে দেই।

'রাতে আবার এল, সাথে ওই লোকগুলো। এসেই বলল আমি ওদের সঙ্গী না হলে খুন করবে আমাকে।

'প্রথমে ওর মতলব টের পাইনি। পরে বুঝলাম, তোমার পেছনে লোক লাগিয়েছিল, কিন্তু তুমি চোখে ধুলো দেয়ায় আমাকে ধরেছে।' থামল ড্রুসিলা।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলাম।

'পাহাড়ে ওঠার একটা রাস্তাই আমার চেনা, তাও ভালমত নয়। আমরা যখন ক্যানিয়নে পৌঁছুলাম, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, জোর ঠাণ্ডা পড়ছে। গুহায় আসতে আসতে প্রায় জমে গেল ওরা, তর্ক বাধাল নিজেদের মধ্যে।

'বয়েড পাহারায় ছিল, ও ঘুমিয়ে পড়তেই আমি পালিয়ে এসেছি – জানতাম তুমি এখানেই কোথাও আছ।'

বরফের সাথে লড়াই করে এগোচ্ছি আমরা। ভয়ে, আতঙ্কে, শীতে হি-হি করে কাঁপছে ড্রুসিলা। 'ওরিন, ওরা সত্যি সত্যি খুন করতে চায় আমাকে। আমারই ভুল, আমি ওদের চরিত্র বুঝতে পারিনি!'

অবশেষে গুহায় পৌঁছুলাম আমরা। আগুন নিভে এসেছিল, মিটমিট করে জ্বলছিল কয়লা। নতুন করে ধরালাম আমি, তারপর কফির পানির জন্যে খানিকটা বরফ গলাতে শুরু করলাম একটা পাত্রে।

আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে শরীর গরম করছিল ড্রুসিলা। আমি মাথা তুলতে চোখাচোখি হলো। 'ওরিন, সব দোষ আমার, মাফ করে দাও।'

শূন্যে হাত খেলিয়ে ওকে আশ্বস্ত করবার প্রয়াস পেলাম। 'ভাগ্যটা আমারই খারাপ – তোমার সামনে মারতে হয়েছিল। অথচ আর কোনও উপায়ও ছিল না – আমাকে খুন করতেই এসেছিল ওরা।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, দৃষ্টি বাইরে নিবদ্ধ। উজ্জ্বল আকাশ, আবহাওয়া কনকনে ঠাণ্ডা। টুথহিলদের টিকিটি দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'পুবের লোকেরা,' শুরু করলাম আবার, 'এখনও ডুয়েল লড়ে। তবে তার আগে সব নিয়মকানুন ঠিক করে নেয় ওরা। একটা অনুষ্ঠানের মত হয়ে ওঠে ব্যাপারটা। এখানে সে-সবের বালাই নেই। পরিচিত লোকের মাঝে ওগুলো করা সাজে, কিন্তু পশ্চিমে অধিকাংশই ভবঘুরে – কেউ কাউকে চেনে না। ফলে কারও সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ হলে বোঝার উপায় থাকে না তার বিপক্ষ মানুষ হিসেবে কেমন – ভাল না মন্দ। তাই ঝটপট পিস্তল চালাতে হয়।'

'জো আমাকে এ-কথাই বলছিল। আ...আমি কান দেইনি প্রথমে। ব্যাপারটাকে ভীষণ নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল।'

'আসলেও যে নিষ্ঠুর। কিন্তু কী করা? আমি চাই না যে কেউ আমার কবরে দাঁড়িয়ে বলুক: "লোকটা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করত না, ভাল ছিল, তাই মারা গেছে।" '

দম নিতে থামলাম আমি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি সামনে। 'না, ড্রু, আইন-শৃঙ্খলার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলেই আমাকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে, মুখ বুজে অন্যায় সইব, এতটা ভাল মানুষ আমি নই। কাজেই দরকার হলে আমি পিস্তল ব্যবহার করব।'

বিপক্ষ দলের পাত্তা নেই এখনও। হয়তো ট্রেইলে বাধার সম্মুখীন হয়েছে, অনভ্যাসের দরুন চলতে কষ্ট হচ্ছে। আবার এর উল্টোটিও হতে পারে। কাছেপিঠেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে, অপেক্ষা করছে ইন্ডিয়ানদের মত, ঝোপ বুঝে কোপ মারবে। প্রতিকূল আবহাওয়া আমার জন্যে শাপে বর হয়েছে। খনির সামনে যে-সব ভাঙা স্ফটিক পড়েছিল, সেগুলো ঢাকা পড়ে গেছে বরফে, বোঝার জো নেই, এটাই স্বর্ণ-উপত্যকা।

ব্ল্যাকস্টোনের বইখানা চোখে পড়তে ড্রুসিলা তুলে নিল ওটা। 'পড়ছ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

'হ্যাঁ। এই বইটা পড়লে মনে হয় মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে আমাদের গর্ব করা উচিত। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি একদম বদলে দেয়।'

'তুমি ওকালতি করবে?'

'না। মূর্খতাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি। স্কুলে যাবার সুযোগ হয়নি, এগুলোর সাহায্যে এক-আধটু যা পারি শিখছি। একদিন' – অনুভব করলাম আমার কান আরক্ত হয়ে উঠেছে – 'আমার ছেলেপুলে হবে, স্কুলে যাবে ওরা। তাই চেষ্টা করছি, ওদের বাবার কারণে ওদেরকে কোথাও যেন অপ্রস্তুত হতে না হয়।'

'হবেই-বা কেন?' দৃঢ় সুরে বললড্রু। 'তুমি ভাল লোক, সাহসী, তা ছাড়া–'

'ওই যে আসছে ওরা?' বলে কাঠের গাদার আড়ালে বসলাম আমি।

বরফের ওপর ওদের বুটের মচমচ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। পাঁচজন। টুথহিলকে প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলাম, পাশের দুজন সম্ভবত ইরা ও টম বিগলো। উইল বয়েডকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওর পেছনে বেন হবস। অনুপস্থিত একমাত্র কিড নিউটন, সেই সাদাচুলো তরুণ পিস্তলবাজ।

আমার জিভে একটা ভাঙা ডাল, একদৃষ্টে দেখছি ওদের এগিয়ে আসা, হাতে উইনচেস্টার প্রস্তুত। বোকামির পরিচয় দিচ্ছে ওরা, এত কম দূরত্বে...

'বাইরে এসো, ওসমান! কথা আছে!'

'আমি শুনতে পাচ্ছি।'

'এখানে এসো।'

'এত আরাম ছেড়ে?'

নিজেদের মাঝে তর্ক জুড়ল ওরা। তারপর টুথহিল গুহার উদ্দেশে রওনা হলো, ওর পায়ের কাছে বরফে গুলি করলাম আমি। সভয়ে থমকে দাঁড়াল ঝাঁটা-গোঁফ, তাড়াহুড়োতে আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল।

'আমার চাইতে তোমাদের অসুবিধেই বরং বেশি,' কথোপকথনের ভঙ্গিতে শুরু করলাম। 'বরফে সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখান থেকে বেরোবে কীভাবে?'

'শোনো, ওসমান,' বলল ঝাঁটা-গোঁফ, 'আমরা জানি তুমি একটা সোনার খনির ওপর বসে আছ। এর একটা অংশ পেলেই আমরা খুশি। বোকামি করছ কেন? আমাদের সবার জন্যেই যথেষ্ট আছে।'

'কোন্ দুঃখে? তোমরা এই ঠাণ্ডায় শিগগিরই মারা পড়বে – কেন ভাগাভাগি করব আমি?'

একটু নড়েচড়ে বসলাম। 'শোনো, টুথহিল, ব্যাপারটা আসলে তোমার মগজে এখনও ঢোকেনি। তোমরা ফাঁদে আটকা পড়েছ। পালানোর রাস্তা বন্ধ। গোটা শীত কাটাতে হবে এখানে। তা পাঁচ-ছমাসের খাবার এনেছ তো?'

'ওসমান, তুমি না বেরোলে,' হুমকি দিল ঝাঁটা-গোঁফ, 'আমরাই আসছি।'

'তখন আমি খুন করার জন্যেই গুলি চালাব, টুথহিল।'

ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যাবে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, বাতাসের বেগ বেড়েছে। তাপমাত্রা এখন কমপক্ষে হিমাঙ্কের দশ ডিগ্রি নীচে হবে। ঘণ্টাকয়েক পরে পঞ্চাশে নেমে যাওয়া অসম্ভব নয়।

'বেন,' চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'তুমি তো নতুন লোক নও। ওদের বলো দশ-এগারো হাজার ফুট ওপরে রাতে কেমন ঠাণ্ডা পড়ে। গোটা শীত পাড়ি দিতে হবে আমাদের – তুমিও নিশ্চয় বুঝতে পারছ সেটা।

'তোমাদের আশ্রয় লাগবে, জ্বালানি লাগবে, খাবার লাগবে। এত উচ্চতায় শিকার বেশি দিন মিলবে না, পশু-পাখি সব নীচে নেমে যাবে। চেষ্টা করলে এখনও হয়তো পারবে – তাড়াতাড়ি পালাও।'

জ্বালানি কাঠে গুহামুখের অর্ধেক ঢাকা পড়েছে। পাঁচ ফুট উঁচু গাদা। চমৎকার আড়াল সৃষ্টি করেছে, বাতাস তো ঠেকাচ্ছেই – গুলিও ঢুকবে না সহজে। সুড়ঙ্গটা লম্বা, পেছনে ঈষৎ বাঁকা – একজন লোক স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারে। চাপা স্বরে ওখানে চলে যেতে বললাম ড্রুসিলাকে।

পাথুরে দেয়াল রিফলেক্টর হিসেবে কাজ করছে, তাপ ঠিকরে গরম রাখছে গুহাটা। আরও তিনটে বাড়তি জিনিস আছে আমাদের কাছে – গাঁইতি, বেলচা, আর কুঠার। তুষার-রাজ্যে টিকে থাকতে হলে ওগুলো অপরিহার্য। এ-ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধে বেশি: ওরা এ-সবের সাহায্য পাচ্ছে না।

এই খনি আমার আবিষ্কার। কেউ কেড়ে নিতে চাইলেই আমি তা দেব কেন?

ওরা দুভাবে আমাদের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। গুহার ছাত ও দেয়াল তাক করে ব্যাপক গুলি বর্ষণ করবে। ফলে নরকে পরিণত হবে জায়গাটা। এই স্বল্প পরিসরে বেরোনোর জায়গা না পেয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করবে দিগ্ভ্রান্ত বুলেটগুলো। সামনে নরম কিছু পড়লে নিমেষে ভেদ করে বেরিয়ে যায় এ-ধরনের বুলেট।

অথবা আমাদের ঘোড়াগুলো মেরে ফেলবে।

টানেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, মেরে ফেললে আমাদের দৃষ্টিপথ ঢাকা পড়ে যাবে। এমনকী পালানোর রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ওদের বাঁচার সম্ভাবনা একশো ভাগের এক ভাগ, তবু বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি।

ঢালের ওপরে কোথাও ঠাণ্ডায় একটা গাছের ডাল মট শব্দে ভাঙল। ভীষণ শান্ত পরিবেশ...ঝড়ের পূর্বাভাস?

মাটিতে সজোরে পা ঠুকল বয়েড, গাল বকল বিড়বিড় করে। ও-ই দল ছাড়বে সবার আগে। দীর্ঘ পরিশ্রমের সাহস বা ধৈর্য কোনটাই ওর নেই। ওদের মধ্যে বেন হবসই শেষ পর্যন্ত টিকবে।

হঠাৎ ওরা ঘুরে বনের পথে রওনা হলো। একজনকে খতম করা দরকার, ভাবলাম। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, তিনটে বিশাল গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা। ডালপালা ভাঙছে একটা ঝোপের ভেতর, আগুনের জোগাড়-যন্তর করছে। শুধু এক আগুনে কুলোবে না ওদের। আরও জিনিস লাগবে।

কিড কোথায়?

ছজন ছিল ওরা...একজন আঘাত পেয়ে নীচে পড়ে আছে। ক্যানিয়নের

নীচের অংশ দুর্গম, বড় বড় পাথরচাঁই আর গাছের গুঁড়িতে ভর্তি। বরফে নিঃসন্দেহে সেটা আরও ভয়াল হয়ে উঠেছে।

লাকড়ির পালায় আঘাত হানল একটা বুলেট। পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল রাইফেলের আওয়াজ। উবু হয়ে পট থেকে কাপে কফি ঢেলে আরাম করে বসলাম আমি। আঙুলগুলো গরম রাখতে কাপটা নাড়াচ্ছি দুহাতের তালুর মাঝখানে। একপশলা গুলি উড়ে এল, প্রবেশপথের ওপরে বিঁধল একটা, ঝুরঝুর করে পাথরকুচি খসে পড়ল গাদার ওপর।

'সরে থাকো, ড্রু। অযথা নড়াচড়া কোরো না।'

'ওরিন? আমাদের কী হবে?'

'ড্রু, সত্যি বলছি আমি জানি না। আমরা একজনও যদি পালাতে পারি – সেটা আমাদের ভাগ্য বলতে হবে।'

কয়েকমিনিট অবিরাম গুলি চালিয়ে গেল ওরা। আমি চুপ করে বসে রইলাম। এক পর্যায়ে থামল গুলি, শুনতে পেলাম ওরা তর্ক করছে।

ওরা কি বিশ্বাস করবে আমরা মারা গেছি? আমি তাই চাই মনে-প্রাণে।

আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল টুথহিল, জবাব দিলাম না। আরও দুটো গুলি ছুটে এল। একটা টানেলের ছাতে বিঁধল, অন্যটা আঘাত করল ভেতরের দেয়ালে।

আবার চিৎকার করল টুথহিল। আমি কফিপান শেষ করে, কাঠের পালার ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম।

আরেকটা গুলি। ক্রুদ্ধ ভোঁতা গর্জন তুলে গুহার পেছন দিকে চলে গেল বুলেটটা।

জোর বচসা চলছে। গলা শোনা গেলেও কথা বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপ সরিয়ে টম বিগলো উদয় হলো, হাতে পিস্তল, গুহার দিকে আসছে।

কাছাকাছি এসে হাঁটার গতি কমাল সে, ঝুঁকির পরিণাম বুঝতে পারছে। থমকে দাঁড়াল বিগলো, পিস্তলের ট্রিগার টিপল একবার। পরীক্ষামূলক গুলি, আন্দাজ করতে চাইছে আমরা বেঁচে আছি কি না, প্রবেশপথের বাইরে দেয়ালে আঘাত হানল।

দোনোমনো করছিল বিগলো, পরক্ষণে ঝেড়ে ফেলল সব দ্বিধা, দ্রুত পায়ে হাঁটা দিল গুহার উদ্দেশে। বারো কদম দূরে থাকতে মুখ খুললাম আমি, 'অল রাইট, বিগলো। ড্রপ দ্য গান!'

চমকে এক পা পিছু হটল সে, আস্তে আস্তে উঠে আসছে পিস্তলের মাযল্।

'ড্রপ ইট!'

এ-বার রাইফেলের নল চোখে পড়ল ওর। এই ব্যবধানে একটা বাচ্চাছেলেও নিশানা ফুটো করতে পারবে। পিস্তল ফেলে দিল সে।

'তোমার ভাই তাস চুরি করতে গিয়ে মারা পড়েছে। পিস্তল বের করতে নিষেধ করেছিলাম আমি – ও শোনেনি।'

কোনও কথা বলল না টম বিগলো।

'গান বেল্ট খোলো,' আদেশ করলাম।

নীরবে হুকুম তামিল করল সে।

'বেশ, তুমি এখন যাও। তবে যাবার আগে বলো দেখি, তোমরা খাওয়ার ব্যাপারে কী ভাবছ। রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদেরটা নিতে পারছ না, আর পারলেও তা দিয়ে বেশি হলে এক হপ্তা টিকবে।'

'আমরা ঠিকই ফিরে যাব।'

'বেন হবসকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। অ্যাল প্যাকারের কথা জিজ্ঞেস করো।'

'সে আবার কে?'

'একদল লোকসহ শীতে পাহাড় পেরোনোর চেষ্টা করেছিল। খাবার ফুরিয়ে যায় ওদের। বাকি পাঁচজনের মাংস খেয়ে বেঁচেছিল সে। তুমি এর জন্যে তৈরি আছ তো, বিগলো?'

'আমাকে ভয় দেখিয়ে ফায়দা হবে না, ওসমান।'

'আচ্ছা, যাও – মরোগে তা হলে।'

ওরা একটা পিস্তল আর গোটা বিশেক কার্তুজ হারাল। রাতে আমাকে বাগে আনবার চেষ্টা করবে।

'ড্রু, তোমাদের সাথে প্যাক হর্স ছিল?' প্রশ্ন করলাম।

'না,' জবাব দিল ও। 'কাজ সেরেই ফিরে যাওয়ার প্ল্যান ছিল ওদের।'

তার মানে খাদ্যসঙ্কটে পড়তে যাচ্ছে, সুতরাং ওদের চটজলদি ব্যবস্থা নিতে হবে – অবিলম্বে।

বিগলো ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। আচমকা ওইদিকে পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়লাম আমি, তারপর এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে, একটু নীচে আরেকবার।

কাঁপতে কাঁপতে কয়েকটা লাকড়ি গুঁজে দিলাম আগুনে। ক্ষুধার্ত শিখা ধীরে ধীরে গ্রাস করল ডালগুলো, তারপর একটা পিচ-পাইনের টুকরো পেয়ে লকলক করে উঠল। ছাতে বাড়ি খেলো একটা বুলেট, গোঁত্তা মেরে নেমে এসে লণ্ডভণ্ড করে দিল আগুন। জামা-কাপড় এবং বিছানা থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝেড়ে ফেললাম আমি। পরক্ষণে অগ্নিকুণ্ডের ঠিক সামনে আরেকটা বুলেট এসে পড়ল, তীক্ষ্ণ টান অনুভব করলাম জামার হাতায়।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওদের আগুন। লক্ষ্য স্থির করলাম ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে, ঝোপের প্রান্তে একটা কালো কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

ক্ষণিকের জন্যে ঢিল দিলাম পেশীতে। একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে, তর্জনী রাখলাম ট্রিগারে, আস্তে আস্তে বের করে দিলাম শ্বাস, তারপর আঙুল বাঁকা করলাম।

বীভৎস চিৎকার উঠল একটা...পরমুহূর্তে বমি করার আওয়াজ ভেসে এল – কোনও পশু বা মানুষের গলা দিয়ে অমন ভয়ঙ্কর আওয়াজ বেরোয় আগে জানতাম না আমি।

এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এল। আরও চারটে গুলি ছুঁড়লাম আমি, আগুনের পেছনে চার ফুট জায়গা জুড়ে, তারপর এক সেকেন্ড থেমে আগুনের ঠিক ও-পাশে আর একটা।

'ড্রু,' বললাম আমি, 'রান্না চড়াও। ব্যাগে ময়দা আছে, মাংস নাও কিছুটা। অন্ধকার ঘনালেই আমরা পালাব।'

'পারব?'

'চেষ্টা করতে দোষ কী?'

টুথহিলদের পরবর্তী পদক্ষেপ আঁচ করতে পারছি না বলে উৎকণ্ঠা বোধ করছি, তবে ঠাণ্ডাই ভাবিয়ে তুলেছে বেশি।

যে করে হোক পালাতে হবে আমাদের। চেষ্টা করতে হবে – এখনও বল আছে, এরপর তাও থাকবে না।

পাহাড়ে শীত কাটানোর মত শরীরের অবস্থা নয় ড্রুসিলার। পর্যাপ্ত খাবার নেই আমাদের, প্রয়োজনীয় পোশাক এবং সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। তবে, বাইরের ওদের অবস্থা এর চাইতে খারাপ। আমার গুলিতে লোকটা যদি মরে গিয়ে থাকে, খোদার দরবারে আমার জন্যে তার শোকর আদায় করা উচিত। ওর একটা মহাউপকার করেছি আমি...মেরে যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিয়েছি।

গোলাগুলিতে ভয় পেয়ে ঘোড়াগুলো দূরে সরে গিয়েছিল, এখন ফিরে আসছে। কিন্তু আমাদের কাছে পৌছানোর আগেই পরপর দুটো গুলিতে মারা পড়ল। প্রথমে প্যাক হর্স, তারপর অ্যাপালুসা।

বহুকাল পর এই প্রথম ঝেড়ে গাল দিলাম আমি। বাবা খিস্তিতে পটু ছিলেন না, আর মা তো এর ঘোর বিরুদ্ধে। তাই আমাদের কারও মুখ তেমন খারাপ নয়, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমার সহ্যক্ষমতা ভেঙে গেল। ভাল জাতের ঘোড়া ছিল ওগুলো, তা ছাড়া ওরা কারও পাকা ধানে মই দেয়নি। তবে কেন ওদের খুন করা হলো বুঝতে পারছি। ওই লোকগুলো নিজেদের তীব্র খাদ্য সমস্যার কথা জানে...ঘোড়াদুটো ওদের মাংসের জোগান দেবে।

রাত নামল। তারা ফুটছে আকাশে। হিমশীতল পানির মত হাওয়া আসছে পাহাড় ডিঙিয়ে। চাঁদ উঠেছে, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, পাহাড়চুড়োয় ডানা মেলেছে জ্যোৎস্না। দুবার জঙ্গলের দিকে গুলি চালালাম, তারপর খেতে বসলাম ড্রুসিলাকে নিয়ে। প্রচণ্ড টেনশনে মুখে বিশেষ কিছু রুচল না। উদ্বৃত্ত মাংসটুকু একটা থলেতে চালান করলাম আমি। অন্য পোঁটলায় রইল আমাদের বিছানাপাটি আর গোলাবারুদ।

টম বিগলোর গান বেল্ট ও পিস্তল কুড়িয়ে আনলাম একটা লম্বা খুঁটির

সাহায্যে। আগে ওটা দিয়ে মাছ ধরতাম আমি। ওর বেল্টের কার্তুজগুলো আমার বেল্টের শূন্যস্থান পূরণ করল। সিলিন্ডার উপুড় করে আমার তালুতে রাখলাম বুলেটগুলো, কুঠারের আঘাতে গুঁড়িয়ে দিলাম ফায়ারিং পিন।

এ-বার আমার হ্যাভারস্যাকের দড়িতে লূপ বাঁধলাম একটা, ওখানে কুঠার ঝুলবে। মেঝেতে অসংখ্য ছোট বড় পাথর পড়েছিল, ওগুলোর তলায় চাপা দিলাম গাঁইতি আর বেলচা দুটো। ওরা হয়তো খুঁজে পাবে, তবু কাজটা যত কঠিন করে তোলা যায় সে-চেষ্টাই করলাম আমি।

থেকে থেকে একটা-দুটো গুলি পেছনের দেয়াল বা লাকড়ির গাদায় এসে হোঁচট খাচ্ছে। লম্বা বিরতি দিয়ে পাল্টা জবাব দিচ্ছি আমি। এটা একটা কৌশল। অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে ওরা: আমাদের নীরবতায় চট করে ধরতে পারবে না আসল ঘটনা।

বরফের পটভূমিতে ওদের কালো অবয়ব চোখে পড়বে, তবু অন্ধকারের সুযোগে ওরা নির্ঘাত আক্রমণ চালাবে। অবশ্যি উপত্যকার শেষ-প্রান্তে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে যদি আসে...

'তৈরি থাকো,' ফিসফিস করে বললাম ড্রুসিলাকে। 'ওরা বোধ হয় এখন একটা কিছু করবে, তারপর ভাগব আমরা।'

সন্তর্পণে বুকে-হেঁটে বাইরে এলাম আমি, মিশে গেলাম দেয়ালের সাথে। ডানে-বাঁয়ে দুদিকই দেখা যাচ্ছে এখন। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না প্রথমে...হঠাৎ ডালপালার সাথে কাপড়ের ঘষা খাওয়ার ক্ষীণ শব্দ কানে আসতে সচকিত হয়ে উঠলাম। ঝোপের কিনারে নড়ছে কী যেন, রাইফেল তুললাম আমি, তাক করে ট্রিগার টিপলাম।

মুখ খিস্তি করল কেউ, ভারি কিছু পড়ল মাটিতে, পরক্ষণে আমার মুখের অনতিদূরে একটা বুলেট আঘাত হানল পাথরে। ঝপ করে বসে পড়লাম, আধ-কদম পিছিয়ে গেলাম টানেলের ভেতর। বাইরে অকথ্য ভাষায় গালির ঝড় চলছে, এলোপাতাড়ি গুলি হলো কয়েকটা। একটা বোঝা ঝুলিয়ে নিলাম পিঠে। ড্রুসিলা ইতিমধ্যেই ছোটটা তুলে নিয়েছে। অপেক্ষা করলাম এক মুহূর্ত। ঝোপের কাছে আগুনের ঝলক লক্ষ্য করে রাইফেল ছুঁড়লাম, তারপর আমরা নিঃসাড়ে হাওয়া হলাম।

সুড়ঙ্গের আশপাশ গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। দেয়াল ঘেঁষে দ্রুত পা চালাচ্ছি, যখন অনেকটা সরে এলাম সুড়ঙ্গ থেকে, বাঁক ঘুরে ঢুকে পড়লাম জঙ্গলে।

ওরা যে-পথে উঠে এসেছে, সে-পথে নামব আমরা। তারপর উল্টোদিকের ত্রিভুজ চিমনি বেয়ে খাঁজের মাথায় চড়ব। ড্রুসিলার পক্ষে দুরূহ হবে কাজটা।

জঙ্গলে ঢুকে মন্থর করলাম চলার গতি, একলয়ে এগোচ্ছি। জমাট বাঁধা বরফ, মসৃণ ভূত্বক, স্নো-শূয়ের তাই প্রয়োজন নেই।

ফেলে দিলাম জুতোজোড়া, ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে উঠেছিল। যতদিন ঠাণ্ডা আছে, জমাট থাকবে তুষার। কিন্তু এর নীচে রয়েছে শিলাবরফ, ঝড়ের

সময় পড়েছিল, গরমে ওগুলো যেই গলতে শুরু করবে, অমনি দেখা দেবে সত্যিকার বিপত্তি। চলাফেরা করা যাবে না। সামান্যতম চাপে মারাত্মক তুষারধস নামবে। এই ঠাণ্ডাকে তাই আমাদের জন্যে আশীর্বাদই বলতে হবে।

একনাগাড়ে হাঁটছি। খানাতল্লাশির ব্যাপারে অতিউৎসাহ দেখাবে না কেউ, এমনকী আমরা পালিয়েছি এটা টের পেলেও নয়। পরে যখন ঢুকবে ওখানে, ওদের মূল লক্ষ্য থাকবে সোনা খোঁজা। সামনে যা ছিল আমি চেঁছে-মুছে নিয়েছি, বাকিটুকুর জন্যে খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে ওদের।

মাঝে-মধ্যে থেমে বিশ্রামের সুযোগ দিচ্ছি ড্রুসিলাকে, এতে ওর পেশীর জড়তা কেটে যাচ্ছে, স্বাভাবিক হচ্ছে রক্ত চলাচল। কোনও নালিশ জানাচ্ছে না ও, মুখ বুজে কষ্ট সইছে।

ট্রেইলে পৌঁছুলাম আমরা, চন্দ্রালোকে চকচক করছে ক্যানিয়নের দেয়াল। আমার হাত খামচে ধরল ড্রুসিলা।

'ওরিন? যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ।'

আলতোভাবে ট্রেইলে পা রাখলাম আমি। জমাট বরফে সহজতর হবে নামা। সাবধানে রওনা হলাম নীচের দিকে, যেন ডিমের খোসার ওপর দিয়ে হাঁটছি।

দেহের অনাবৃত অংশে কামড় বসাচ্ছে বাতাস, টান পড়ছে পেশীতে। নীচের ক্যানিয়নকে মনে হচ্ছে এক বিশাল অন্ধকার গহ্বর, হাঁ করে আছে। জ্যোৎস্নায় খাঁজগুলোকে দেখাচ্ছে হিংস্র মাংসাশী জন্তুর দাঁতের মত। এমন দৃশ্য মানুষের জীবনে বারবার আসে না, শিরায় শিরায় রোমাঞ্চিত আমি, থমকে দাঁড়ালাম এক মিনিট। ড্রুসিলা ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে, দুহাত আমার কাঁধে।

'এই দৃশ্য দেখলে মা খুব খুশি হতেন,' বললাম। 'সুন্দর জিনিস দেখতে ভালবাসেন তো।'

কনকনে বাতাস ক্রমাগত দাঁত বসাচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে মুখ, যেন অজস্র সুচ ফোটানো হয়েছে। পায়ের চাপে চিড় ধরছে বরফে; প্রতিপদে শঙ্কা, জীবনমরণের ঝুঁকি।

রাস্তাটা তিন ফুট প্রস্থ, কোথাও কোথাও বড়জোর চার ফুট। কিন্তু কিনারে বরফের কারনিস সৃষ্টি হওয়ায় বেশি চওড়া দেখাচ্ছে। খাড়া ঢাল, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছি, পা ফেলছি মেপে, তারপর আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ ভর চাপিয়ে আরেকটা পা তুলছি।

ওপরে আকাশ উজ্জ্বল; অফুরান জ্যোৎস্নায় দিনের মত হাসছে শৈলমালা। বহু উঁচুতে একটা খাঁজের মাথায় দমকা তুষার-ঝড় উঠল, ক্ষণিকের জন্যে পাতলা পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল আকাশ। আমার গন্তব্য ওই খাঁজ, সকাল নাগাদ ওখানে পৌঁছে যাব। ট্রেইলের ওপর দিকে, ক্যানিয়নের দেয়ালে ঝালরের মত বরফ ঝুলছে। ভয় করছে ভীষণ, সামান্যতম দুলুনিতে ধস নামতে পারে, সূর্য

উঠলে তো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।

মাঝপথে এসে আবার থামলাম আমরা, ড্রুসিলা পাশে চলে এল।

'রেডি,' জিজ্ঞেস করলাম ওকে। 'ওরা কিন্তু এক্ষুণি এসে পড়বে, ড্রু।'

'কতক্ষণ হলো বেরিয়েছি?'

'তা দুঘণ্টা হবে...'

ঝড়ের বেগে নীচে নেমে এলাম আমরা, হাঁটু কাঁপছে ঠকঠক করে; গুহার দিকে এগিয়ে গেলাম। ফরসা হবার আগেই ওরা টের পেয়ে যাবে আমরা নেই। আগুন নিভে গেলে ধরে ফেলবে সব কিছু, খ্যাপা কুকুরের মত তেড়ে আসবে আমাদের খোঁজে।

গুহার কাছাকাছি আসতে ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম নাকে। ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। কেউ আছে গুহায়।

পা টিপে টিপে দোরগোড়ায় হাজির হলাম, হাতে উদ্যত রাইফেল। ভেতরে উঁকি দিয়েই জমে গেলাম মূর্তির মত, একটা .৪৪ মাযল্ তাকিয়ে আছে আমার পানে। গুহামুখের মত হাঁ করে আছে যমদূত – সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরীর মত কালো, অন্ধকার।

'মিস্টার,' বললাম, 'পিস্তলটা নামাও – না হলে আমি তোমাকে খুন করব।'

চোদ্দ

কিড নিউটন ধরে আছে পিস্তল – সেই সাদাচুলো ছেলেটি, যাত্রার শুরুতে ওকে আমি গোলমাল থেকে তফাতে থাকবার পরামর্শ দিয়েছিলাম।

চিত হয়ে শুয়ে আছে ও, মুমূর্ষু চেহারা, পিস্তলটা কাঁপছে হাতে। একটা কম্বল চাপানো গায়ে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, শোয়া থেকেই আগুন উস্কে দেবার চেষ্টা করছিল।

'কী ব্যাপার, কিড?'

আমার দিকে পিস্তল তাক করে রইল সে। উইনচেস্টারের ট্রিগার সময়মত টিপতে পারব তো আমি? সে-চেষ্টা যেন করতে না হয়, প্রার্থনা করলাম মনে মনে।

'পা ভেঙে গেছে।'

'ওরা তোমাকে ফেলে চলে গেল? এটা কোনও মানুষের মত কাজ হলো, কিড?' বুক টিপটিপ করছে, তবু সাহসে ভর করে রাইফেলটা নামালাম। 'কিড, পিস্তল সরাও – তোমার জখম দেখব।'

'তুমি আমাকে সাহায্য করবে কোন্ দুঃখে,' মুখে বলল বটে, কিন্তু ওর চেহারা জানান দিচ্ছে এই মুহূর্তে সাহায্য পেলে ও বর্তে যায়

'অসুস্থ লোকের সাথে আমার শত্রুতা নেই' – হাসি ফুটিয়ে তুললাম মুখে– 'তুমি সেরে ওঠো, তখন দেখা যাবে, কেমন! নাও, বাপু, এখন হাতটা সরাও, দেখি আমি কদ্দূর কী করতে পারি।'

ড্রুসিলার উদ্দেশে বললাম, 'তুমি পাহারায় থাকো।'

ওর হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে, তুলে ফেললাম কম্বল। চটী বেঁধেছিল, ঢিলে হয়ে গেছে। বিশ্রীভাবে ফুলে উঠেছে হাঁটুর নীচে, একনজরেই ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে।

ঊরুর কাছ থেকে চিরে ফেললাম ওর প্যান্ট, বুটখানা কেটে খসিয়ে নিলাম পা থেকে। একজোড়া দামী বুট বরবাদ হয়ে যাক এটা কোনও কাউহ্যান্ডই চায় না, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। মনে হলো হাঁটুর কয়েক ইঞ্চি নীচে হাড় ভেঙে গেছে। আগের চটীগুলো একদম আনাড়ি হাতের কাজ, নতুন করে কয়েকটা কেটে বেঁধে দিলাম।

পানি ফোটালাম খানিকটা, গরম কাপড়ের সেঁক দিলাম। সত্যি বলতে কী, কতটুকু উপকার হবে এতে জানি না, তবে কিড অন্তত অনুভব করবে যে ওর যত্ন নেয়া হচ্ছে। নির্জন গুহায় একজন নিঃসঙ্গ মুমূর্ষু লোকের জন্যে এই অনুভূতি টনিকের মত কাজ দেয়।

'নিজের চেষ্টায় এসেছ এখানে?'

'না, ওরা রেখে গেছে।'

'কিড, এইসব আজেবাজে লোকের সাথে থেকো না। ভাল কোনও দলে যোগ দাও।'

কিছু লাকড়ি ভেঙে চাঙা করলাম আগুন। কেবল একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। কঠিন সমস্যায় পড়েছি। এমনিতেই আমরা, ড্রুসিলা আর আমি, বিপদের মধ্যে আছি, পালানোর চেষ্টা করছি ওই নারকীয় খাঁজ পেরিয়ে। তার ওপর এখন কাঁধে সওয়ার হয়েছে একজন পঙ্গু।

লোকে হয়তো বলবে আমার এ-ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে, আমার প্রধান দায়িত্ব ড্রুসিলাকে নিয়ে এখান থেকে পালানো। একটা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছি আমরা – ব্যর্থতার দিকে পাল্লা বেশি ভারি। আমার মাল লুট করতে চায় এমন কিছু লোকের সাথে এসেছিল কিড, হয়তো মেরেও ফেলত। ইতিপূর্বে আরেকবার আমার সাথে লড়াই বাধাতে চেয়েছিল। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না, হয়তো কেউ বাধ্য হয়ে খুন করবে ওকে।

কিন্তু এখানে ফেলে গেলে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাবে। কোনও সন্দেহ নেই এতে। ওই সোনালোভী হায়েনাগুলো একটা খড়কুটো এগিয়ে দিয়েও সাহায্য করবে না ওকে। কিড মরে গেলেই বরং ওদের লাভ – একজন ভাগীদার কমে গেল।

জঙ্গলের ধারে গেলাম কুঠারখানা তুলে নিয়ে। চাঁদ ডুবে গেছে, ভোর হলো বলে। একটু খোঁজাখুঁজির পর যা চাইছিলাম পেয়ে গেলাম অ্যাসপেন ঝাড়ে। দুটো মজবুত খুঁটি কেটে আনলাম। প্রায় আট ফুটি।

ডালপালা ছেঁটে কুঠারের সাহায্যে ঘষে ঘষে মসৃণ করলাম একদিক। আমার কুঠারটা ধারাল, গাছ ছাঁটার কায়দা ভালই জানি। ছেলেবেলায় টেনেসিতে থাকতে বেড়ার খুঁটি কেটে হাত পাকিয়েছি। বড়শির ঢঙে গোড়াটা ঈষৎ বাঁকিয়ে দিলাম ওপর দিকে।

ছোট ছোট কয়েক টুকরো কাঠ নিয়ে এলাম লাকড়ির পালা থেকে। চারটে করে মোট আটটা ফুটো করলাম খুঁটি দুটোতে, তারপর কাঠের টুকরোগুলো ঢুকিয়ে দিলাম ফাঁকের ভেতর।

'কী বানাচ্ছ?'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো। তোমাকে ঘাড়ে করা সম্ভব নয় – তাই টেব্‌গেন তৈরি করছি।'

'আমাকে বাঁচাতে চাও কেন?' বিস্মিত হলো কিড।

'ঠাণ্ডায় মরতে দিতে চাই না বলে,' ঝাঁঝিয়ে উঠলাম আমি। 'এখন চুপটি করে শুয়ে থাকো। আমরা যদি বেরোতে পারি, তুমিও আসছ আমাদের সাথে। তবে বেশি কিছু আশা কোরো না – আমাদের চান্স খুব কম।'

কয়েকমিনিট কথা জোগাল না কিড নিউটনের মুখে। চামড়ার ফিতে দিয়ে ক্রসপিসগুলো বেঁধে ফেললাম আমি। একসময় একটু নড়েচড়ে বসল কিড, ভাঙা পা মেলে দিল সামনে। 'ওসমান, মেয়েটাকে নিয়ে তুমি বরং চলে যাও। না-না, অন্তর থেকেই বলছি। আমাকে বাঁচানোর দরকার নেই – আমি তোমাকে মারব বলেই এসেছিলাম।'

'পারতে না, কিড। আমি পিস্তল চালাই ছবছর বয়েস থেকে।'

'তোমরা যাও। তোমার ওই স্লেজের কাজ নয় ট্রেইলে বহন করে আমকে।'

'আমরা ট্রেইল ধরছি না, কিড।' গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসলাম। 'বেঁচে থাকলে নাতিপুতির কাছে তুমি গল্প করতে পারবে, কোনও একদিন পাহাড় টপকেছ।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিড। বোধগম্য হয়নি আমার প্ল্যান – হবার কথাও নয়। সুস্থ মস্তিকে কোনও মানুষ ওই কাজ করবে না।

ট্রেইল ধরেই পাহাড়ে এসেছিলাম আমরা, এখন সেগুলো বারো ফুট বরফের তলায় চাপা পড়েছে। তাই আমি ঠিক করেছি খাঁজ পেরিয়ে ও-পাশের খাড়া ঢাল বেয়ে সোজা ক্যাম্পে নেমে যাব।

পাগলামি? ঠিক...কিন্তু আর উপায় কী?

আমরা সবাই ঘোড়ায় চেপে এসেছিলাম, এখন সেভাবে ফেরা অসম্ভব। মানুষের ভার হয়তো-বা পারবে, ঘোড়া এবং সওয়ারির ওজন একত্রে চাপালে প্রলয় ঘটতে বাধ্য। আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা এক, তবু ঝুঁকি নিতে হবে।

Tobaggan: বরফের ওপর দিয়ে চলার জন্যে এক ধরনের স্লেজ গাড়ি।

ঘোড়ায় চেপে অচেনা জায়গায় যাওয়া, আর পায়ে হেঁটে ফেরা এক কথা নয় – দু-তিনগুণ সময় লাগবে। ওই লুটেরাগুলো ভেবেছিল এসেই কাজ হাসিল করে ফিরে যাবে। কঠিন গাড্ডায় পড়েছে ওরা।

'মানে?' এ-বার বোধ হয় কিড আমার মতলব বুঝেছে, আতঙ্ক ফুটে উঠেছে চোখে।

কাজ থামিয়ে উল্টোদিকের পাহাড়ের পানে ইশারা করলাম। 'ওটা আরও উঁচু – টপকাব।'

ওর চাউনি বলে দিচ্ছে আমাকে উন্মাদ ভাবছে ও। একলা একজন লোক কিনা চায় একটা মেয়ে আর একজন আহত লোককে নিয়ে পাহাড় টপকাতে!

ভোরের মুখে রওনা হলাম আমরা। পুব আকাশে সবে আলো ফুটছে। নড়বড়ে স্লেজে দড়ি বেঁধে টানছি আমি। খাড়া টেইল্যাস, তবে বরফ থাকাতে ওঠা সহজ হচ্ছে, পাথর সরে যাচ্ছে না পায়ের তলায়। তবু, উঠতে ঘাম ছুটে গেল।

ড্রুসিলা আপাদমস্তক চিমনিটা দেখে ভয়-বিস্ফারিত চোখে ঘুরল আমার দিকে। 'ওরিন,' বলল ফিসফিস করে, 'না!'

বস্তুত আমি নিজেও শঙ্কিত। উঁচু পাহাড়, তায় ভাঙাচোরা, প্রতিপলে প্রাণ হারাবার আশঙ্কা। আড়াআড়িভাবে রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিলাম কাঁধে, তারপর আমার বেল্টে একগোছা দড়ি বেঁধে ডাকলাম ড্রুসিলাকে।

শুয়ে আছে কিড, স্লেজের সাথে শরীর বাঁধা আমার পানে তাকাল। 'আমাকে ফেলে যাচ্ছ, ওসমান? না-না, তোমাকে দুষছি না – ওখানে উঠতে হলে তোমার একজোড়া ডানা লাগবে।'

টেব্‌গেনের মাথায় দড়ির একটা প্রান্ত বেঁধে আমি রওনা হলাম। প্রতিটা রানারের সাথে পেঁচিয়ে, সবশেষে ওপরের ক্রসপিসে বাঁধা হয়েছে দড়িটা। এর ফলে টেনে তোলার সময় সোজাভাবে ঝুলবে ওটা।

যাত্রাপথে বরফের গায়ে টো-হোলড খুঁড়লাম কিছু, গতবার ব্যবহার করেছিলাম এমন দুটো চোখে পড়ল। চিমনির মাথায় উঠে আসতে বললাম ড্রুসিলাকে।

ও দেখতে ছোটখাটো মানুষটি হলে কী হবে – অসম্ভব চটপটে, সাহসী। তরতর করে উঠে এল, আমার চেয়ে স্বচ্ছন্দে।

বুড়ো গ্রন্থিলব্রিসল-কন সেই আগের জায়গায় অবিচল দাঁড়িয়ে, চিমনির অব্যবহিত ওপরে, পাহাড়ের গভীরে মেলে দিয়েছে শতসহস্র শেকড়। গাছের পেছনে গিয়ে গোড়ালিতে ভর রেখে বসলাম আমি, বাঁ-পা ঈষৎ সামনে বাড়ানো। তারপর আস্তে আস্তে গোটাতে শুরু করলাম দড়ি। আগেই বলেছি, আমি বড়মাপের মানুষ, কাঁধ আর বাহুতে পাকানো পেশী। কিন্তু কিডের ভার বইতে গিয়ে অনুভব করলাম কঠিন কাজে নেমেছি।

ওকে টেনে তোলা কেবল এর একটা দিক মাত্র। পাথুরে দেয়াল থেকে

নিজের চেষ্টায় দূরে সরে থাকতে হবে ওকে, নয়তো টানাহেঁচড়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে শরীর। যেখানে সুবিধে পাচ্ছে কিড নিজেই উঠে আসছে, এ-ক্ষেত্রে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরছে টো-হোলডগুলোকে।

ড্রুসিলা আমার পাশে দাঁড়ানো, পাইনের গুঁড়িতে জড়িয়ে দিচ্ছে দড়ি। হাত ধরে গেছে আমার, তবু দাঁতে দাঁত চেপে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

কিছু সময়ের জন্যে অবসর দিলাম হাতকে। প্যাকবোর্ডে বাঁধা শিশুর মত শূন্যে ঝুলে রইল কিড। উপত্যকার ও-পাশে চোখ পড়তেই দেখলাম, ট্রেইল বেয়ে নামছে চারজন লোক। সিকি মাইলটাক দূরে রয়েছে। সারির শেষ ব্যক্তি খোঁড়াচ্ছে।

রাইফেল তুলল একজন, একটা ভোঁতা আওয়াজ কানে এল আমাদের। বুলেটের কী হলো বলতে পারব না, তবে আমাদের ধারেকাছে কোথাও আসেনি। টার্গেট উঁচুতে থাকলে এ-রকম ক্যানিয়নে দূরত্ব হিসেব করা অসম্ভব। কালেভদ্রে ঝড়ে বক মরে, এই-যা। আমি নিজেও বহুবার ব্যর্থ হয়েছি।

আবার মন দিলাম কাজে। ব্যথা করছে হাত, হাঁসফাঁস করছি নিশ্বাসের জন্যে। পাহাড়চুড়োয় বাতাস হালকা, ফুসফুস খালি হয়ে যায়। অতিকষ্টে ফুট দুয়েক টেনে তুললাম ওকে, পরস্পর ঘষে গরম করে নিলাম দুহাতের তালু, তারপর ফের শুরু করলাম।

কোনও দিকে তাকানোর অবসর নেই। এখন শুধুই টেনে তোলা। টানো, শ্বাস নাও, আবার টানো।

ফাটলের এককোণে বেধে আটকে গেল টেব্‌গেনটা। 'ড্রু,' সোজা হয়ে বললাম, 'আমি নীচে যাচ্ছি। তুমি যতটা পারো দড়ি গাছের সাথে জড়িয়ে ফেলো।'

'ওরিন?'

ঘুরে তাকালাম ওর পানে। সরাসরি আমার চোখের দিকে চেয়ে আছে। 'তুমি এই ঝামেলা পোয়াচ্ছ কেন? আমি দুর্ব্যবহার করেছিলাম বলে?'

দিব্যি কেটে বলছি, একটিবারও এ-চিন্তা ঠাঁই পায়নি আমার মাথায়। 'না, ড্রু। একটা কথা কী জানো, বিপদের সময় কোনও পুরুষই মেয়েলোকের কথামত চলে না। সে তার বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করে। ওই লোকটা একবার আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। আমারও প্ল্যান ছিল ওকে হারাব।

'সেটা এক জিনিস, কিন্তু এখন পরিস্থিতি একদম আলাদা। এখন ও একজন অসহায় মানুষ। আমি ওকে উদ্ধার করার পর হয়তো ও আবার আমাকে খুন করতে চাইবে। তখন আমিও তাই করব।'

নেমে গেলাম ঢাল বেয়ে। একটা ফাটলের কোনায় আটকে গিয়েছিল স্লেজটা, মুক্ত করলাম, তারপর কিডকে টেনে তুললাম খাঁজের মাথায়।

এই পাহাড়ের নীচে রয়েছে ক্যাপ, আমাদের কেবিন; এবং ক্লেইম – দূরের ওই গাছপালার আড়ালে নিভৃত শান্তি – অথচ এখানে ঝোড়ো হাওয়ায় সোজা

হয়ে দাঁড়াতে পারছি না আমরা। সমস্ত চিন্তা দূর করে দিলাম মাথা থেকে: যেভাবেই হোক নামতে হবে আমাদের, এবং দ্রুত।

ফের মেঘ করছে – কালো কালো ঢাউস সব মেঘ। অর্থাৎ আরও তুষারপাত হবে। চলতি হপ্তা শেষ হবার আগেই ওই ক্যানিয়ন হয়তো বিশ ফুট বরফে ঢাকা পড়বে।

আকাশ পথে ক্যাম্পের দূরত্ব আধ-মাইল, তবে পাঁচ হাজার ফুট নীচে। উত্তরে যে-ট্রেইলটা আবিষ্কার করেছিলাম আমি, সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একবার জঙ্গলে পৌছুতে পারলে, বাকি পথটুকু পেরোতে পারব আমরা – যদিও পরিশ্রম হবে অমানুষিক।

এই পাহাড় প্রায় তেরো হাজার ফুট উঁচু, সগর্জনে বাতাস বইছে। ছোট ছোট নুড়িপাথর উড়িয়ে নিয়ে গেল, ঝিরঝিরে তুষার পড়ছে। হাওয়ার অনুকূলে রওনা হলাম আমরা, স্লেজটা টেনে আনছি। অবশেষে খাঁজ ডিঙিয়ে নামলাম নীচে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাস পড়ে এল।

আমার মুখ ফেটে চৌচির, হাত অসাড়। দস্তানার ভেতর আঙুল নাড়াতে পারছি না, শক্ত হয়ে গেছে। কিড নড়তে পারছে না, ঠাণ্ডায় জমে যে-কোনও মুহূর্তে ওর মৃত্যু হতে পারে, আমার ভয় হলো।

স্লেজটাকে সামনে রেখে অগ্রসর হলাম ঢাল বেয়ে। হঠাৎ পাহাড়ের এককোণ থেকে দমকা হাওয়া ছুটে এল, বৃক্ষপত্রের মত স্লেজসহ শূন্যে তুলে ফেলল আমাদের। পরক্ষণে নামিয়ে দিল আবার, দড়ি ছিঁড়ে গেল আমার হাত থেকে। দড়াম করে আছাড় খেলো স্লেজটা, ঝাঁকুনি লাগল কিডের ভাঙা পায়ে, ব্যথায় ককিয়ে উঠল।

প্রথমে ড্রুসিলা নেমে গেল। পাথুরে মেঝেতে বুক ঠেকালাম আমি, ধীরে-সুস্থে নামিয়ে দিলাম কিডকে। ইতিমধ্যে আমি সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি, খেয়াল করতে পারছি না শেষ কবে গরম অনুভব করেছিলাম।

সামনে, নীচে একটা বিশাল বুড়ো গাছ শেকড় উপড়ে পড়ে আছে। বিরাট মাকড়সার মত ছড়িয়ে আছে গাছটা, মৃত্যুযন্ত্রণায় ধুঁকছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে শেকড়গুলো। এর সামান্য নীচে ইতস্তত-ছড়ানো গাছ, বাতাসের অত্যাচারে অধিকাংশই ন্যাড়া, বেঁটে – তারপর জঙ্গল। গাছের মাথাগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা; দূরে, বহুদূরে অমলধবল তুষার-রাজ্য। কোনও কোনও বাড়ি থেকে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠছে।

বাড়ির কথা মনে পড়ল আমার। ভাসমান তুষারকণার পর্দায় দেখলাম, আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে, দোলনা-চেয়ারে দুলছেন মা, মুখে জ্বলন্ত পাইপ, গিটার বাজিয়ে গান ধরেছে অ্যানজেল। হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় ছিঁড়ে গেল পর্দা: ড্রুসিলা, আহত কিড আর বাতাসের সাঁই-সাঁই ঝাপটা ছাড়া কেউ নেই সঙ্গে।

একসময় আমরা বনে ঢুকলাম। এ-বার আর অসুবিধে হচ্ছে না চলতে। কেবল এখানে-সেখানে সাবধানে ধরাধরি করে নামাচ্ছি স্লেজ। এক জায়গায়

পাথরে হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল ড্রুসিলা, হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেললাম। অবশ্যি আমি নিজেও সুস্থ বোধ করছি না, দুহাঁটু ঠকঠক বাড়ি খাচ্ছে ক্রমাগত।

ক্যাম্পের ওপরে ছোট্ট যে-কেল্লাটা আমি বানিয়েছিলাম, অবশেষে সেখানে পৌঁছুলাম। ইতিমধ্যে দুবার আছাড় খেয়েছি আমি, ঠাণ্ডায় পরিশ্রমে এত নিস্তেজ বোধ করছি যে আমার মাথা কাজ করছে না। ড্রুসিলার কাঁধে ভর রেখে দীর্ঘ পাইন বনের ভেতর দিয়ে বাসার দিকে যাত্রা করলাম। দড়ি-টানা স্লেজটা আসছে পেছন পেছন।

গাছপালার গোড়ায় পুরু বরফ জমেছে। সুতোর মত ধোঁয়া উঠছে চিমনি দিয়ে, জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে একটা। মনে হলো এই তো ভোর হচ্ছিল, এখন আবার রাত নামছে।

সহসা, বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম আমি। অনুভব করলাম ওঠার চেষ্টা করছি...দুহাতের তালুতে ভর দিয়ে উঠছি একটু একটু করে। জানালার বাতিটা চোখে পড়ছে, হালকা কথাবার্তা কানে আসছে। টলতে টলতে দরজায় গেলাম, অনেক চেষ্টাতেও খুলতে পারছি না, ল্যাচের ওপর সাড়া দিচ্ছে না আমার আঙুল।

আচমকা খুলে গেল কপাট, সিক্স-গান হাতে ক্যাপ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে – সতর্ক, প্রস্তুত।

'ভয় নেই, ক্যাপ, আমি,' শ্রান্ত অবসন্ন গলায় বললাম।

জো রাগার ছিল, দুজনে মিলে চ্যাংদোলা করে কিড নিউটনকে নিয়ে গেল ঘরে। ড্রুসিলা দুহাতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ওর পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি, সান্ত্বনাবাণী শোনাতে লাগলাম একহাতে জড়িয়ে ধরে।

কিড নিউটন আমার হাত খামচে ধরল। 'মাইরি,' বলল সে, 'আজ আমি একজন মরদ –'

'ঘুমোনোর চেষ্টা করো, কিড,' বললাম। 'জো ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে।'

'অথচ আমি কিনা নিজেকে –' আপনমনে বিড়বিড় করছিল কিড। 'শাট আপ!' ধমক দিলাম আমি। উঠে আগুনের কাছে গিয়ে মেলে ধরলাম হাত। ঠাণ্ডা ছেড়ে যেতেই লক্ষকোটি সুচ চঞ্চল হয়ে উঠল আমার আঙুলের ডগায়।

'সত্যিকার মরদের কথা যদি বলো' – তাকালাম নিউটনের দিকে – 'মোরায় আমার যে-দুভাই আছে, ও'নীল আর অ্যানজেল, ওরা!'

'আমি বড় হবার চেষ্টাই করেছি, কিন্তু পারিনি।'

বিছানার কিনারে বসে তাপ শুষে নিচ্ছি। প্রতিটি পেশীর খিল ছেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, ফিরে পাচ্ছি সাড়া। ড্রুসিলা আমার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে, দুগালে শুকনো অশ্রুর দাগ, চোখের কোলে কালি।

'অনেক ঝড় গেছে তোমার ওপর দিয়ে,' বলে নিউটনের দিকে তাকাল ক্যাপ। 'ওকে বাঁচালে কেন?'

'ওটাই ভাল বলে মনে হয়েছে, তাই।'

'কিন্তু ও তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল!'

'হ্যাঁ...মনে মনে। আমার বিশ্বাস সেই থেকে ও ভাবনাচিন্তা করার সময় পেয়েছে।'

মুখ থেকে পাইপ নামাল ক্যাপ সয়্যার, পটে কফি ঢালল।

'এ-বার তা হলে তুমি একটু চিন্তাভাবনা করো,' বলল সে। 'আরেকজন বিগলো এসেছে শহরে – তোমার খোঁজ করছে।'

পনেরো

বিছানায় শুয়ে থাকার বান্দা নই আমি। ভোরে ফের খাড়া হলাম, শরীরে বল ফিরে আসেনি। দারুণ খিদে পেয়েছে, তাই উঠে পড়েছি।

ড্রুসিলা এখনও ঘুমোচ্ছে আরেকটা কামরায়। সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছে জো রাগার। ওহাইওর পাট চুকিয়ে গতকাল এখানে পৌঁছেছে ওর স্ত্রী।

'বিগলো লোকটা আমাকে বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে,' বলল রাগার। 'গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে।'

'লেসিং চেনো – একধরনের ইঁদুর। সুমেরু অঞ্চলে দেখা যায়, ভীষণ নাছোড়বান্দা। একটা যে-দিকে যায়, আরগুলো হুড়মুড় করে তার পিছু নেয়, একবারও ভাবে না এতে তার মরণ হতে পারে। বিগলোদের আমার ওইরকম মনে হচ্ছে – ওদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা লেগে গেছে, কে কার আগে মরবে।'

'ওকে এত হালকাভাবে নিও না, ওরিন,' রাগার হুঁশিয়ার করল। 'ডেনভার সিটি আর টাসকোসায় এই সেদিন দুজন লোককে খুন করেছে ও।' বেনসন, বিগলো ভাইদের মধ্যে সবার বড় – এবং সবচেয়ে ডেঞ্জারাস।'

'নাম শুনেছি,' বলল ক্যাপ। 'তবে ভাই-ব্রাদার আছে জানতাম না।'

'অন্যদের খোঁজ করছে। ওরা পাহাড় থেকে ফিরে আসেনি। বেনসনের বিশ্বাস, তুমি খুন করেছ।'

'ফিরলেই বরং অবাক হব। না, আমি মারিনি। ওরা পাঁচজন ছিল। ড্রুসিলা থাকায় ঝুঁকিটা নেইনি।'

আগুনের তাপে ঘর গরম। আরাম লাগছে আমার। একটুবাদে ফের সটান ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন চোখ মেললাম, উনানে রান্না চাপিয়েছে ড্রুসিলা। উঠে বুট পরলাম আমি। ভাল করে কুলি করলাম বেসিনে, হাত-মুখ ধুলাম। পানির ছোঁয়ায় জুড়িয়ে গেল মুখ, গালে হাত বুলিয়ে বুঝলাম দাড়ি কামানো দরকার।

ক্যাপ বাইরে কোথাও গেছে। বাসায় আমরা দুজন একা। কিড হাসপাতালে, ডাক্তার নিয়ে গেছেন।

ড্রুসিলাকে চুলোর পাড়ে দেখে আমার ভারি ভাল লাগল। এই অবস্থায় দেখলে কে বলবে, মাত্র কাল সন্ধ্যেয় যমের দরজা থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে ও। মেয়েদের এই গুণটি আমার মন কাড়েঃ ঝামেলার মাঝেও, ওদের গিন্নিস্বভাব বদলায় না। সমবেদনা দিয়ে যে-মেয়ে পুরুষকে ধরে রাখতে পারে সে-ই বুদ্ধিমতী। পুরুষের ভালবাসা ঝরনার মত, অজস্রধারায় ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েদের প্রেম বহতা নদী, সেই ঝরনা-ধারাকে সস্নেহে বুকে লালন করে। পুরুষের টান বাইরে, মেয়েদের আকর্ষণ ভেতরে। তাই মেয়েদের উচিত পুরুষকে প্রেমের বন্ধনে জড়ানো; সংসারের নাগপাশে নয়। আমার এ-শিক্ষা হয়েছে মায়ের কাছে, বাবার দুরন্তপনাকে একটুও খর্ব না করে ভালবাসার মায়ায় বেঁধেছিলেন তাঁকে। এতে মায়ের নারীত্ব যায়নি, বাবার পৌরুষেরও হানি ঘটেনি।

ড্রুসিলার এখনও বহু শিক্ষা বাকি। ও কী শিখবে?

হঠাৎ চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। ডিনারে ডাকছে ড্রুসিলা। আমার দাড়ি কামানো সারা, তৈরি হয়ে নিলাম। বাইরে ক্যাপের পদশব্দ, বারান্দায় বুট ঝেড়ে ঘরে ঢুকল।

'বরফ পড়ছে,' বলল সে। 'তোমার কপাল ভাল, আর কিছুক্ষণ দেরি হলে হয়তো ফিরতে পারতে না।'

ড্রু এক কাপ ধূমায়িত কফি এনে দিল আমাকে, দুহাতের তালুতে ধরে ওই লোকগুলোর কথা ভাবতে লাগলাম। ওরা স্বেচ্ছায় নিজেদের পায়ে কুড়োল মেরেছে। লোকগুলো আমার শত্রু, তবু ওদের জন্যে দুঃখ হলো।

এক চুমুক কফি খেয়ে ক্যাপ তাকাল আমার দিকে। 'বেনসন বলছে তোমার নাকি সাহস নেই, ওর সাথে লড়তে ভয় পাচ্ছ।'

সংসারটা বড় আজব জায়গা, কিছু লোক থাকে যারা জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেয়।

জীবনের কাছে আমার চাওয়া খুব সামান্যঃ একটা ছোট্ট বাথান, কিছু গবাদি পশু, আর আবাদযোগ্য খানিকটা জমি। সহসা ড্রুসিলার প্রতি চোখ পড়তে উপলব্ধি করলাম, না, কেবল এই নয় – আরও কিছু চাই আমি।

কথাটা কীভাবে পাড়ব বুঝতে পারছি না। দেবার মত আমার কিছু নেই, তাই বলতেও ভয় হচ্ছে। আমি এখন পুরোপুরি যুবক, সবে ঠিকমত পড়তে শিখছি, একটা খনি পেয়েছি তবে সেটা কত বড় জানি না। বস্তুত ওটাকে আমার একটা পকেট বলে মনে হয়েছে। সে-জন্যেই ঠিক করেছি বসন্তের শুরুতে মোরায়, ভাইদের কাছে চলে যাব।

কথাটা জানালাম ক্যাপকে।

'ও-সব তোমার না ভাবলেও চলবে,' বলল সে। 'ও'নীল আর অ্যানজেল

আসছে এখানে। বিল ক্যানাভানও আছে।'

বিলের বাড়ি কামবারল্যান্ডেই। এককালে ওখানকার শেরিফ ছিল, আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। অ্যানজেলকে রাজনীতিতে এনেছে ও-ই, তবে টেনেসির ছেলেরাও রাজনীতি পাগল।

'কবে?'

'আজ রাত, বা কাল। তোমার বিপদের কথা শুনেই আসছে।'

নিশ্চয়ই শহর হয়ে আসবে ওরা। ওখানে বিগলো রয়েছে। আমাকে চেনে না সে। আচমকা ওসমান নামটা শুনে গোলাগুলি বাধিয়ে বসা অসম্ভব নয়।

তেমন ঘটলে অবশ্যি আমার চিন্তার কিছু নেই। ও'নীল একাই ওকে সামলাতে পারবে...পিস্তলে ওর হাত বিজলি-চমকের মত ক্ষিপ্র।

কফিপান শেষে উঠে দাঁড়ালাম আমি। গান বেল্ট তুলে নিয়ে বাঁধলাম কোমরে। তারপর কোট আর হ্যাট হাতে নিয়ে বললাম, 'শহরে যাচ্ছি।'

'এখানে গুমট লাগছে,' বলল ক্যাপ সয়্যার, 'আমিও আসছি।'

উনোনের পাশ থেকে ঘাড় ফেরাল ড্রুসিলা, হাতে একটা খুন্তি। 'খেয়ে গেলে না? এত কষ্ট করে রাঁধলাম।'

'দেরি হবে না,' বললাম আমি, 'খাবারগুলো গরম রেখো, ড্রু।'

কোট পরে হ্যাট চাপালাম মাথায়। এতে পোষাবে না, কুনস্কিনের জ্যাকেট কিনতে হবে। 'অবশ্যি,' খেই ধরলাম, 'তোমার রান্না আমার খাওয়া উচিত নয় – অভ্যাস হয়ে যাবে।'

সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল ও, মুহূর্তের জন্যে আরক্ত হলো চেহারা।

'বিশেষ করে আমার মত বোকাকে কোনও মেয়ে যখন বিয়ে করবে না।'

'মেয়েদের তুমি খুব ভাল চেনো বলে মনে হচ্ছে,' ওর গলায় ঝাঁঝ প্রকাশ পেল। 'আজ পর্যন্ত কোনও বোকাকে দেখেছ যার বউ নেই?'

সত্যি বলতি কী, দেখিনি।

'গরম রেখো,' বললাম আমি।

বেনসন বিগলো সম্পর্কে একটা কথাও বলল না ড্রুসিলা। শুধু বলল, 'দেরি কোরো না, ওরিন – হাত পুড়িয়ে রেঁধেছি।'

বাইরে যদিও ঠাণ্ডা, আমার আরাম লাগছে। কোরাল থেকে ঘোড়া বের করল ক্যাপ। স্যাডল চাপানোই ছিল, নীরবে রওনা হলাম আমরা।

খদ্দের গিজগিজ করছে স্যালুনে। বারে একজন দীর্ঘদেহী লোক দাঁড়িয়ে। চওড়া, দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল। একনজরে বোঝা যায় গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ধরে এ-লোক। আঁচ করলাম, ও-ই বেনসন বিগলো। ওরিন ওসমান, আপনমনে বললাম আমি, একে হালকাভাবে নিও না – জাত কেউটে।

ঘুরে আমার দিকে তাকাল সে। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর পাশে।

চোখের পলকে খালি হতে শুরু করল স্যালুন। আমি যখন বারে দাঁড়াই,

পঞ্চাশ-ষাটজন ছিল, আধ-মিনিট পর মোটে জনাছয়েক রইল। এরা নিরীহ কৌতূহলী দর্শক, কী ঘটে স্বচোখে দেখে গল্প করবে প্রিয়জনদের কাছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে ওপর-নীচ জরিপ করল বিগলো। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমি চেয়ে রইলাম ওর পানে। একটুবাদে হাসি হাসি মুখ করে বললাম, 'বিগলো, তোমার গোঁফটা তো দারুণ!'

'মানে?'

'না, এমনি বললাম – ড্রিংকস চলবে?'

'কথা এড়াচ্ছ কেন? না, আমি পরেরটা খাই না!'

এতক্ষণে ওর হুঁশ হলো, ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। শক্ত হয়ে গেল বিগলোর চোয়াল, দুপাশের হাড় ঠেলে বেরোতে চাইছে, চোখ কোঁচকানো।

বাইরে থেকে ঘোড়ার পদশব্দ ভেসে আসছে। এই আবহাওয়ায় জরুরি কাজ না থাকলে কেউ বেরোবে না বাড়ি ছেড়ে। অ্যানজেল আর ও'নীল বোধ হয় এসে পড়েছে, ভাবলাম।

দুশো মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছে আমার ওই দুভাই – আমার বিপদের খবর পেয়েই এসেছে।

'তুমিই ওরিন ওসমান?' বিগলোর গলায় রুক্ষতা।

'তোমার ভাইটা, ওই ওয়েস, তাসের কিস্‌সু জানত না। পিস্তলেও আনাড়ি, এত করে নিষেধ করলাম –'

'টম, ইরা ওরা কোথায়?'

'অপেক্ষা করো, শীত কাটুক, বসন্তে ওদের দেখা পাবে,' বললাম আমি। 'ওদেরও মাথায় ঘিলু বলতে কিছু ছিল না, এই বরফের মধ্যে কেউ যায় পাহাড়ে!'

'তুমি দেখেছ ওদের?'

'দুবার আক্রমণ করেছিল আমাকে। পারেনি, মাঝখান থেকে টম তার পিস্তল খুইয়েছে।'

চুপ করে আছে বিগলো, কপালে ভাঁজ পড়েছে।

'শুনলাম তুমি আমাকে মারতে এসেছ?' মৃদু সুরে প্রশ্ন করলাম।

এখনও আমাকে বুঝে উঠতে পারেনি ও। আমার হাবভাবে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়নি। সচরাচর একজন পথচারীর স্যাথে মানুষ যেভাবে কথা বলে, তেমনি হালকা চালে আলাপ করছি।

'তুমি এক কাজ করো, বিগলো, এখান থেকে চলে যাও। তোমার ভাইয়েরা নিজেদের দোষে মরেছে।'

'তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক,' বলল সে। 'এসো, ড্রিংক করবে।'

হুস্ করে চেপে-রাখা নিশ্বাস ছাড়ল কেউ। মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে খদ্দেরদের মাঝে। চমকপ্রদ কিছু ঘটল না দেখে হতাশ হয়েছে ওরা।

বারটেন্ডার দুটো গ্লাসে পানীয় ঢেলে দিল। আমি একচুমুকে শেষ করে

আরেক গ্লাসের অর্ডার দিলাম। ওটা খেয়ে পিছিয়ে এলাম এক পা। 'চলি, বিগলো – দেখা হবে।'

ঘুরে দরজার উদ্দেশে হাঁটা দিয়েছি, পেছন থেকে ডাক এল, 'ওসমান?'

ফাঁকা ঘরে পিস্তল কক্ করার শব্দ জোরাল শোনাল। পাঁই করে ঘুরলাম আধপাক, ওর প্রথম বুলেটটা আমার কানের লতি ছুঁয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে আমার হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল, গুলি করলাম ওর পেটে। ছিটকে বারের গায়ে আছড়ে পড়ল সে। বাঁ-হাতে রেলিং ধরে পতন ঠেকাল। বাইরে ঘোড়া থামার শব্দে শুনতে পেলাম না গুলির আওয়াজ, আচমকা কোমরের কাছে তীব্র টান অনুভব করলাম আমি। ককিয়ে উঠলাম ব্যথায়, আবার গুলি করলাম ওকে।

এখনও মরেনি ও... .৪৪ হলে কী হবে, আসলে কোনও মানুষকে থামাতে সোজা তার মাথায় নয়তো হৃৎপিণ্ডে গুলি করতে হয়। বিশেষ করে লোকটা যদি উন্মাদ হয়। বিগলোর অবস্থা এখন তাই, খুনের নেশায় খ্যাপার মত জ্বলছে ওর চোখ। আহত গ্রিজলির মত দেখাচ্ছে।

কয়েকমিনিট অনড় দাঁড়িয়ে রইল বিগলো, রক্তে ভেসে যাচ্ছে শার্ট-প্যান্ট, দুপায়ের মাঝখানে মেঝেতে টপটপ করে বড় বড় লাল ফোঁটা পড়ছে।

অতিকষ্টে পিস্তল তুলল বিগলো, বাঁ-হাতে ধরেই আছে রেলিং, নিশানা স্থির করল আমার বুক বরাবর। ধীরে ধীরে কক্ করছে পিস্তল, আবার গুলি করলাম আমি। ওর ধাক্কায় বার কেঁপে উঠল। একটা বোতল উলটে গড়িয়ে চলে এল, ছলকে পড়ল খানিকটা হুইস্কি। হাত বাড়িয়ে বোতলটা তুলে নিল বিগলো, ঠোঁটে ঠেকিয়ে উপুড় করল গলায়, একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আমার চোখের দিকে।

বোতলটা নামিয়ে রাখল বিগলো। 'ওটার দাম আমি দেব,' বললাম।

'আমারই ভুল,' বলল সে। 'ওদেরকে পেছন থেকে মারোনি তুমি।'

'শুধু ওয়েসকে...অন্যরা ঠাণ্ডায় শেষ হয়েছে।'

'তাই,' বলে পেছন ফিরল বিগলো। বাইরে ছোটাছুটির আওয়াজ পাচ্ছি।

দীর্ঘ একটা মিনিট পিস্তলহাতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, চোখ ওর পিঠের দিকে। তারপর ভাঁজ হতে শুরু করল ওর হাঁটু, আস্তে আস্তে পড়ে গেল, কেবল আঙুলগুলো খামচে ধরে রইল রেলিং, ঢিলে হয়ে গেল একসময়, মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল বেনসন – মারা গেল বিগলো পরিবারের বড় ছেলে।

ভুসির মেঝেতে পড়ে আছে বেনসন বিগলো। চোখের পাতা খোলা, দৃষ্টি ছাতে নিবদ্ধ। দাড়ির এখানে-সেখানে ভুসি লেগে আছে।

প্যান্টের নীচে ভেজা ভেজা ঠেকছে আমার, রক্ত নামছে গড়িয়ে। পিস্তলে টোটা ভরে খাপে তুলে রাখলাম, ক্যাপ এগিয়ে এল কাছে।

'লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল।

'মনে হচ্ছে,' বলে টাল সামলালাম দেয়াল ধরে।

ঠাস করে খুলে গেল ব্যাটউইং ডোর, নীল ঢুকল, পেছনে অ্যানজেল। দুজনেরই হাতে খাপমুক্ত পিস্তল।

'চলো বাড়ি যাই,' বললাম আমি, 'খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

বিগলোর দিকে তাকাল ওরা।

'আর কেউ?' জিজ্ঞেস করল নীল।

'থাকলেও আর চান্স পাবে না, আমি নিজেই এবার আগে গুলি করব।'

ক্যাপ আমার শার্ট খুলল টেনে। ডান কোমরে একটা গর্ত থেকে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। মারাত্মক জখম নয়, হাড় অবধি পৌঁছেনি। পকেট থেকে সিলকের রুমাল বের করে ক্ষতস্থানে চেপে দিল নীল।

'আগে ডাক্তারের কাছে চলো,' আপত্তি জানাল ক্যাপ।

'বাসায় কল দাও। ড্রুসিলা খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

কেবিনে ফিরে দেখলাম দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ড্রুসিলা। 'এই বোকাটা বিয়ে করেনি এখনও,' বললাম আমি।

ড্রুসিলা ঘুরে তাকাল আমার দিকে। 'করবে,' বলল ও। খুন্তিটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল, দুহাত সামনে বাড়ানো, চিকচিক করছে চোখের কোল।

আমি টেনে নিলাম বুক উথালপাথাল। নিশ্বাস ভারি। ধীরে ধীরে নামছে ঠোঁট। ওদিকে, বাইরে আবার তুষারপাত শুরু হয়েছে।

***

কুহকিনী

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭

এক

কৃষ্ণ-নয়না মেয়েটিকে বারবার আমার দিকে তাকাতে দেখে ঈশ্বরকে ডাকলাম মনে মনে। এইসময়ে আমার কাছে একটা বাইবেল থাকা উচিত ছিল।

আমি পাহাড়ের লোক। ছফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। বাহু, কাঁধে অমিততেজ; যে-কোনও বুনো ঘোড়াকে পোষ মানাতে জানি – কিন্তু মেয়েলি ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি।

সবাই আমাকে সাদাসিধা লোক বলেই জানে, চেহারাতেও তেমন জৌলুস নেই, তবু এই মেয়েটি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

আমাদের দেশে, টেনেসিতে, একটি প্রবাদ আছে। ঘুমোনোর সময় বালিশের তলায় বাইবেল রাখলে ডাইনীদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মানুষের কোনও ক্ষতি করার আগে বাইবেলের প্রতিটি শব্দ গুনতে হয় ওদের। এবং যেহেতু সকালের আগে শেষ হয় না গোনা, ওদেরও তখন অশুভ শক্তি নেতিয়ে পড়ে।

ফরসা ওকে বলা যায় না। শ্যামলার দিকেই কয়েক পোঁচ টান বেশি। মাথাভর্তি কালো চুল। পিঠময় ছড়ানো। কপাল ঈষৎ চওড়া। স্বাভাবিক সরু ভুরু। সরু চোখা নাক। আয়ত কালো চোখ। পুষ্ট ঠোঁট। মুখের গড়ন, চলতি কথায় যাকে বলে ডিমের মত। অর্থাৎ, পুরোপুরি লম্বা নয়। তবে ওর শরীর দীঘল, সাড়ে পাঁচ ফুটের ওপরে। সুগঠিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল একহারা শরীরে একধরনের বন্য অনম্রতা প্রথমেই চোখে পড়ে। পরনে আঁটসাঁট রঙ-জ্বলা জিন্স। দেহের প্রতিটি বাঁক, চড়াই-উতরাই স্পষ্ট।

দ্বিতীয়বার যখন ওর দিকে তাকালাম, মনে হলো আসলে আমারই ঈশ্বরনাম জপা দরকার। ওই আধো-স্ফুরিত ঠোঁটজোড়া দেখলে পুরুষ মাত্রই ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে।

জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে পাহাড়ে, বনে-বাদাড়ে। সমাজের উঁচুতলায় মেলামেশার সুযোগ পাইনি। মেয়েদের চাহনিকে আমার ভীষণ ভয়, টেনেসির সবগুলো ক্রীক সেচলেও ওইরকম চোরাবালি মিলবে কিনা সন্দেহ। তবু যতবার ওই কালোচুলো মেয়েটির ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছি, ততবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করছে।

আমার পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে আছে আমার স্যাডলব্যাগ। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে নড়াচড়ার সময়ে। যেন সতর্ক করছে আমাকে: কোনও মেয়ের সঙ্গে জড়াবার ক্ষেত্র এটা নয়। ত্রিশ পাউন্ড সোনা আছে ব্যাগগুলোতে। এর সবটাই আমার নয়।

বিপদের আঁচ পেয়েছি আমি। গত তিনটে দিন ধুলো উড়তে দেখেছি ব্যাক ট্রেইলে। কেউ বোধ হয় দূর থেকে নজর রাখছে। সামনে নিশ্চয় কেউ ওত পেতে আছে।

অবশ্যি সমস্যা, সঙ্কট এ-সব আমার জীবনে আজ নতুন নয়। টেনেসি থেকে যারা ইউনিয়ন আর্মিতে যোগ দিয়েছিল, তাদের প্রত্যেকেই সেই থেকে বহুবার মৃত্যুকে কোলাকুলি করেছে। আমি যেখানেই পা রেখেছি, জড়িয়ে পড়েছি একটা না একটা বিপদে। এখন, এই অচিন জায়গায়, ওই কৃষ্ণ-নয়নার সাথে কোনও ফ্যাসাদে জড়িয়ে গেলে আমি তাই অবাক হব না।

একা একটি টেবিলে বসে আছে ও, খাচ্ছেও একাই। হাবভাবে একধরনের আভিজাত্য ফুটে আছে। ফলে কেউ কাছে ভিড়ছে না। এলাকাটা বিপজ্জনক, সময়টিও খারাপ। কিন্তু মেয়েটি এমনভাবে বসে আছে যেন এটা ডেলমনিকো বা পুবের ওই জাতীয় নামকরা কোনও রেস্তোরাঁ। আশপাশ সম্পর্কে উদাসীন, কোনও দিকে খেয়াল নেই। কেবল, মাঝে মাঝে, আড়চোখে আমাকে দেখছে।

ওর সাদামাঠা বেশভূষা, কিন্তু আমার গোলমেলে ঠেকছে। পাগলা-ঘণ্টি বাজছে মাথায়। বলছে, সময় থাকতে পালাও। ভাল মেয়েরাও অনেক সময় চোখের পলকে বিপদে ফেলতে পারে পুরুষকে। আর একে তো রীতিমত ডাইনী বলেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু যাব কোথায়, কাছেপিঠে তেমন জায়গাও যে নেই।

হার্ডিভিল ছোট্ট শহর। স্যালুন, মুদিখানা আর কলর্যাডো ক্রসিংয়ে একটা হোটেল। বছরের অধিকাংশ সময় এমনিই পড়ে থাকে ঘাট, কালেভদ্রে এলডোরাডো ক্যানিয়ন, কিংবা ক্যাভিল* অবধি স্টীমবোট যায়।

আমার ইচ্ছে ভোরে পয়লা ফেরিতে নদী পেরিয়ে ব্র্যাডশ্য রোড হয়ে লস এঞ্জেলেসের উদ্দেশে রওনা হব। অ্যারিযোনার শহরগুলোতে জনশ্রুতি, ওখানে সোনা আউন্স প্রতি আঠারো, এমনকী বিশ ডলারেও বিকোয়। কিন্তু মাইনিং ক্যাম্পগুলোতে এর দাম ষোলোর বেশি উঠবে না।

লস এঞ্জেলেসে সোনা বেচে নিত্যব্যবহার্য পণ্য আর খচ্চর কিনব বলে ঠিক করেছি। মোজাভে মরুভূমি এবং কলর্যাডো পার হয়ে খনি শহরগুলোতে গিয়ে বিক্রি করব মাল। কপাল ভাল থাকলে, সোনা এবং মাল দুটো থেকেই লাভ আসবে।

আমি ব্যবসায়ী এ-কথা কেউ বলবে না, আমি নিজেও তা দাবি করি না। তবে এটুকু বোঝার শক্তি আছে যে, সস্তা কিনে চড়া দামে বেচতে পারলে অন্তত অনাহারে মরতে হবে না। প্রতিটি কাজের পেছনেই যুক্তি থাকে। এখানেও আছে এই অঞ্চলটা দুর্গম, আউট-ল আর ইন্ডিয়ান তস্করে ভর্তি। কোনও

* বর্তমানে লেক মীড-এর গর্ভে

ব্যবসায়ী এ-পথে যাতায়াত করতে সাহস পায় না। আমি ঝুঁকি নিচ্ছি, কেননা এতে আমার মুনাফা বেশি। কথায় বলে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই...তা হলে একজন স্মোকি মাউন্টিন ওসমানই-বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

সোজা কথায়, টেনেসিতে তিন রকমের ওসমান রয়েছে। স্মোকি মাউন্টিন ওসমান, কামবারল্যান্ড গ্যাপ ওসমান, এবং ক্লিঞ্চ মাউন্টিন ওসমান। শেষোক্ত দলটি একটু বুনো, হিংস্র প্রকৃতির। এক লড়াইয়ের সময় ছাড়া ওদের সাথে আমাদের সংশ্রব নেই। বিপদে-আপদে ওদেরকে পাশে পেলে সুবিধে হয়, কারণ ওরা পারে না এমন কিছু নেই। তবু, ওই ক্লিঞ্চ মাউন্টিন ওসমানদের আমরা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।

এ ছাড়া নিচু এলাকাতেও কয়েক ঘর ওসমান আছে। ওদের বাস কামবারল্যান্ড ভ্যালিতে। ওরা বিত্তশালী, আমাদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ নেই। বাবা সর্বদা বলতেন, ওদের টাকা আছে বলে আমরা যেন ওদেরকে হিংসে না করি। কামবারল্যান্ড উপত্যকাটাই এমন যে ওখানে সোনা ফলে।

এই ফাঁকে একটি কথা বলে রাখা ভাল, আমাদের দেশ স্মোকি মাউন্টিন হলেও আমরা পরে কামবারল্যান্ড গ্যাপে চলে এসেছিলাম।

পাহাড়ে আমাদের, ওসমান পরিবারের ছেলেদের, খেলাধুলা। এমনকী ক্লিঞ্চ মাউন্টিনের ওই অপদার্থ ছোকরাগুলোও এতে পিছিয়ে নেই। টেনেসিতে একটা রটনা আছে, ঝোপ লক্ষ্য করে কেউ যদি ঢিল ছোঁড়ে, সেটা ওসমানদের কারও গায়ে গিয়েই লাগবে। এবং এই সঙ্গে ট্রেল্যানিদের কোনও মেয়ে যদি চোট পায়, অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবশ্যি এটা নেহাতই আমার অনুমান, প্রবাদে এ-রকম কথা বলা হয়নি। ট্রেল্যানি কিশোরীদের সাথে ওসমান কিশোরদের একটা অলিখিত মর্যাদার লড়াই বহুকাল ধরে চলে আসছে।

তবে এই মুহূর্তে ও-সব কিছু ভাবছি না: আমার চিন্তা কীভাবে মোজাভে পেরিয়ে লস এঞ্জেলেসে গিয়ে সোনা বেচব, তারপর সস্তায় মাল কিনে আবার ফিরে আসব খনি শহরে।

একজন সুন্দরী মহিলা বা সুদর্শন যুবক অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা স্বাভাবিক; কিন্তু আমি সাধারণ মানুষ, তাই এই কৃষ্ণ-নয়না যখন কৌতূহল দেখাতে শুরু করল, আমি আমার অবস্থান খতিয়ে বিচার করলাম।

মেয়ে দেখলেই যে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেই, তা কিন্তু নয় – সময় বিশেষে সাহায্যও করি। তবে মানুষের চামড়া গণ্ডারের নয়, ভুলচুক ঘটতেই পারে...বিশেষ করে তাতে যদি নারীর ইন্ধন থাকে।

আমার কাছে সোনা আছে। সুন্দরী মহিলার নিশ্বাসের চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান। কেন জানি না মনে হচ্ছে, এই মেয়েটির দৃষ্টিতে যাদু আছে, আমার স্যাডলব্যাগের চামড়া ভেদ করে দেখে নিচ্ছে ভেতরের সব কিছু।

ইচ্ছে ছিল খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নেব। এখন দেখছি বিলাসিতা পোষাবে না, চড়া মাশুল গুনতে হতে পারে।

এ-রকম মনে হওয়ার পেছনে কারণ আছে। এমন একটি মেয়ে হার্ডিভিলে কেন এসেছে কিছুতেই ঢুকছে না আমার মাথায়। ওর পোশাকের কোথাও ধুলোবালির দাগ নেই। অথচ স্টেজকোচ বা ওয়াগনে চেপে এলে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। এর অর্থ, স্টীমবোটে এসেছে, উজান ঠেলে।

আমার খাবার নিয়ে আসছিল ওয়েট্রেস, মেয়েটা ওকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লস এঞ্জেলেসের স্টেজ কটায়? সময় হয়নি?'

'দেরি হবে – নতুন আরেকটা না ছাড়া পর্যন্ত আসছে না,' বললাম আমি।

'মানে?' ভাঁজ পড়ল ওর কপালে।

'আপাতত আসছে না।'

এ-বার সবাই আমার দিকে চোখ ফিরিয়েছে দেখে বললাম, 'আসার পথে ওটা দেখলাম।' রুটিতে পুরু করে মাখন লাগাচ্ছি আমি। 'ড্রাইভার পটল তুলেছে...দুটো গর্ত বুকে। ক্যানিয়নের ভেতর পড়ে আছে স্টেজ, ঘোড়াগুলো নেই। আরও দুজন মারা গেছে...যাত্রী।'

'আর ইউ শ্যুঅর?' হার্ডি প্রশ্ন করল।

'শকুন দেখেছি,' উত্তরটা ঘুরিয়ে দিলাম।

'অ, কাছে যাওনি?'

'গিয়েছিলাম – কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। বলা তো যায় না, কে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে।'

'বোধ হয় মোজাভেদের কাজ,' মন্তব্য করল একজন।

'পায়ে মোকাসিন ছিল, তবে ওরা ইন্ডিয়ান নয়। ওগুলো কোম্যাঞ্চে মোকাসিন – কিন্তু এখানে তো ওরা থাকে না।'

সবাই নিজেদের মধ্যে আলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, একযোগে, নীরবে আহারে মন দিলাম আমি। এমনিতেই অনেক বেশি বলে ফেলেছি। আততায়ীদের কেউ এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত থাকা অসম্ভব নয়, যদিও আমি ঢুকেই লক্ষ করেছি কারও পায়ে মোকাসিন আছে কি না। বেফাঁস কথার পরিণাম খুব খারাপ হয়।

ওয়েট্রেসের সাথে কথা বলছে কৃষ্ণ-নয়না। 'পরের গাড়ি কখন?'

'ধৈর্য ধরতে হবে, ম্যাম – নেক্সট্ স্টেজ বিষ্যুতবারে।'

আজ মোটে সোম, মেয়েটার চেহারা বলে দিচ্ছে তার আগেই হার্ডিভিল ছাড়তে হবে ওকে। জায়গাটা অচেনা, কেবল সে-জন্যে নয় – ভয় পেয়েছে ও।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কুহকিনীর ঠোঁটজোড়া, চোখ বিস্ফারিত, যেন ভূত দেখেছে। হয়তো-বা নিজেরই।

হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বলল, 'একটা উপকার করবে আমার – লস এঞ্জেলেসে নিয়ে যাবে?'

'যাব,' ফস্ করে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

কথায় বলে গতস্য শোচনা নাস্তি। ভুল করে পরে পস্তালে কোনও লাভ হয় না – তবু মনে মনে ঝেড়ে গাল দিলাম নিজেকে। কোথায় তাড়াহুড়ি

ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছুব, না ঘাড়ে একটা আপদ চাপালাম। তার ওপর ওর ভাবভঙ্গি যেখানে সন্দেহজনক।

যাক, ঢিল যখন ছোঁড়া হয়ে গেছে সেটা আর ফেরত নেওয়া যাবে না, তবু কথার প্যাঁচে ফেলে নিরস্ত করতে চাইলাম ওকে। 'তোমার ঘোড়া লাগবে,' বললাম। 'সাথে বেশি মাল আছে?'

'ট্রাঙ্কটা পরে স্টেজে এলেও চলবে – তবে কার্পেটব্যাগদুটো নেব।'

'যদি ভারি না হয় আমার প্যাক হর্স বইতে পারবে ওগুলো,' অভয় দিলাম, 'কিন্তু তোমার একারই লাগবে দুটো ঘোড়া। আমার তাড়া আছে – কোথাও থামতে পারব না।'

'থ্যাঙ্কস,' বলল ও। 'তুমি দামটা দিয়ে দাও, আমি লস এঞ্জেলেসে গিয়ে শোধ করে দেব। আমার কাছে শুধু'– মোহিনী হাসি হাসল মেয়েটা – 'স্টেজের টিকেট আর একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট আছে। বড় ড্রাফট – এখানে ভাঙতি হবে না।'

'আ–' বলতে চেয়েছিলাম টাকা নেই, কিন্তু স্যাডলব্যাগগুলো খোঁচাতে শুরু করল। তা ছাড়া আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ব্যাগে কী আছে ও তা জানে।

'বেশ,' বললাম, এবং সেই সাথে হাতছাড়া করলাম আমার পিছিয়ে আসার শেষ সুযোগটুকু।

বিরক্তিতে ছেয়ে গেল মন। লস এঞ্জেলেসে দ্রুত পৌঁছুব বলে দুটো ঘোড়ার ব্যবস্থা রেখেছি। কিন্তু এখন মেয়েটার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। ও কেমন ঘোড়সওয়ার তাও ছাই জানি না।

পট থেকে আরেক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে, ঘরের ও-পাশে বারের দিকে তাকালাম। আমার দিকে চেয়ে আছে এক লোক, পাশে আরও দুজন দাঁড়িয়ে, নিজেদের মাঝে ফিসফিস করছে ওরা। ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বাচওড়া লোকটাকে পরিচিত ঠেকল। লম্বায় আমার সমান হবে, তবে আরেকটু মোটা। গায়ের রঙ শ্যামলা। কোমরে গান বেল্ট, পিস্তলবাজদের ঢঙে হোলস্টার উরুর সাথে বাঁধা। পেছন ফিরে আছে লোকটা। চওড়া কাঁধ...অনেকটা পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধাদের মত গড়ন।

মেয়েটি আগের জায়গায় বসে আছে, আমাদের দুই টেবিলের মধ্যে ব্যবধান মাত্র দুফুট। প্রথমেই দরকারি কথাবার্তা সেরে নিলাম।

'আমার সঙ্গে যেতে হলে,' বললাম ঈষৎ রুক্ষ স্বরে, 'সকাল-সকাল তৈরি হয়ে থেকো। সূর্য ওঠার আগেই রওনা দেব।'

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম। 'পিস্তল চালাতে জানো?'

বিশ্বাস করুন, অবাক করল ও। 'রাইফেল চালাতে পারি।' তারপর আবার সেই মন-মজানো হাসি। 'তুমি চিন্তা কোরো না – আমি নিজেকে সামলাতে পারব।'

খাবার দাম বাবদ টেবিলে একটা সিকি ফেলে, বাঁ-হাতে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলাম স্যাডলব্যাগগুলো, তারপর ডান হাতে আমার উইনচেস্টারখানা

নিয়ে রওনা হলাম দরজার উদ্দেশে।

পেছন থেকে একটা হেঁড়ে গলা ভেসে এল, অনুমান করলাম, বিশাল-বপু ঘুরে দাঁড়িয়েছে ওর স্বরে বিদ্রূপ, ঝগড়া বাধাবার মতলব। বাইরে গিয়ে ভিড়িয়ে দিলাম দরজাটা কোমল রাত নেমেছে মরুভূমির বুকে, আশপাশে কেউ নেই।

মৌন পরিবেশ। অন্ধকারে কুলকুল শব্দে কলর‍্যাডো নদী বইছে। তার ও-পাশে ডেড মাউন্টিন্স নেভ্যাডার একটা সরু করিডর নেমে এসে ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে মিশেছে।

অস্বস্তিভরে পশ্চিমে, যোজনবিস্তৃত মরুভূমির দিকে তাকালাম। শিরশির করে উঠল গা, মনে হলো ওই ঊষর অঞ্চল পেরোনোর আগেই অশেষ দুঃখের ভাগীদার হব। কৃষ্ণ-নয়নার সঙ্গে নিজেকে জড়ানো চরম বোকামি হয়ে গেছে।

বিজলিচমকের মত একটা সত্য উপলব্ধি করলাম: বিপদ এড়াতে চাইলে এখুনি রওনা হতে হবে – অবিলম্বে। ফেরি সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে, তবে নদী এখানে গভীর নয়, সাঁতরে পাড়ি দেওয়া যাবে।

হার্ডির কেবিনে বাতি জ্বলছে। এগিয়ে গিয়ে মৃদু টোকা দিলাম।

হার্ডি বিচক্ষণ লোক, দরজা খোলার আগে পরিচয় জিজ্ঞেস করল। আমি ঘোড়া কিনতে আগ্রহী বলায় দরজা খুলল, তবে উদ্যত পিস্তলহাতে। ওর এই সতর্কতায় একটুও বিস্মিত হলাম না – পশ্চিমের জীবনটাই বিপদের সাথে সহবাস, তাই এখানকার মানুষ সদা হুঁশিয়ার।

'হ্যাঁ,' আমার কথার পিঠে জবাব দিল ও, 'আছে দুটো ঘোড়া, দাম পড়বে।'

হোলস্টারে পিস্তল গুঁজে, কোট তুলে নিল হার্ডি। গায়ে দিতে গিয়ে, হঠাৎ থেমে সরাসরি তাকাল আমার পানে। 'তুমি কি বেটি ওয়ারেনকে নিয়ে যাচ্ছ?'

'আমি ওর নাম জানতে চাইনি, ও-ও জিজ্ঞেস করেনি আমারটা। হ্যাঁ, যাচ্ছে – কেন?'

কোট পরল হার্ডি। 'বিপদ ঘাড়ে নিচ্ছ। দেখো, আমি তোমাকে চিনি না – তবে ভাল মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ওই মেয়েটার কোথাও একটা কিন্তু আছে। ওর হাবভাবে বোঝা যায়, কেউ তাড়া করছে ওকে। তুমি সাহায্য করতে গিয়ে মাঝখান থেকে নিজেও ফেঁসে যাবে।'

'তা হোক,' বললাম, 'ও মেয়েছেলে মানুষ, তার ওপর একা – সাহায্য দরকার।'

আর কিছু বলল না হার্ডি, পথ দেখিয়ে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে লণ্ঠন ধরাল একটা। স্টলে-বাঁধা ঘোড়াগুলো জুলজুল চোখে তাকাল। বেশি নেই, সবকটা মাসটাং কোরালের পেছনের অংশে।

দুটো ঘোড়া দেখাল ও। একটা মেটে-রঙের স্ট্যালিয়ন, সাদা নাক, তিন পায়ে খুরের ওপর সাদা ছোপ। বিশাল জানোয়ার: দেখেই বোঝা যায় অফুরন্ত দম আর শক্তিতে ভরপুর, জোরে ছুটতে পারবে। ওজন একহাজার পাউন্ড বা

তার কিছু বেশি। এত সুন্দর ঘোড়া আমি খুব বেশি দেখিনি, এই অঞ্চলের তুলনায় বড়ই বলতে হবে। দ্বিতীয় ঘোড়াটা খর্বাকৃতি গেল্ডিং, ছাই-রঙা। মাথার গড়নটা সুন্দর, পেছনের পা-দুটো মজবুত শক্তিশালী।

লণ্ঠনের আলোয় দরদস্তুর শুরু হলো। ও জানে আমার ঘোড়া দরকার, চড়া দাম হাঁকল। তবে ওতেও ঠকা হবে না। এক আর্মি অফিসারের কাছ থেকে কিনেছে ও। অফিসারের নিজস্ব ঘোড়া ছিল ওগুলো। বদলির সময় বিক্রি করে গেছে। গেল্ডিংটা মহিলা চড়ার উপযোগী।

'তুমিই জিতলে,' পকেটে টাকা রেখে সন্তোষের সুরে বলল হার্ডি। 'কাছেপিঠে এদের চেয়ে ভাল ঘোড়া আর নেই।'

আস্তাবলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা, ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কানে আসছে। 'মেয়েটা বোটে এসেছে,' হার্ডি স্বেচ্ছায় তথ্যটা দিল। 'একটুর জন্যে প্রেসকটের স্টেজ পায়নি।'

'প্রেসকট?'

'হ্যাঁ। লস এঞ্জেলেসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরে। আমার ধারণা, ও প্রথম স্টেজটা ধরতে চায় – তা সে যেখানেই যাক।'

ও থামল, নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। পশ্চিমের পথ, আসন্ন যাত্রার চিন্তা আমার মন আচ্ছন্ন করে আছে। কারা অনুসরণ করছে আমাকে?

এক পর্যায়ে মনে হয়েছিল আমার বোঝার ভুল...ওরা হয়তো একই পথের পথিক। কিন্তু বেলস স্প্রিংস থেকে অল্পক্ষণের ভেতর কয়ৌট ওয়েলসে পৌঁছে যাই আমি। হাতে সময় থাকায় ওখানে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। ওই অশ্বারোহীদের দেখা পাইনি, অথচ ট্রেইলে ওদের ধুলো উড়ছিল। এর মানে ওরা পাহাড়ে ক্যাম্প করেছিল যাতে আমি দেখতে না পাই।

মাঝরাতের সামান্য আগে চুপিসারে সটকে পড়লাম আমি, ক্যাম্পফায়ারের আগুন নিভাইনি। যাচ্ছিলাম পশ্চিমে, ইউনিয়ন পাসের দিকে; কিন্তু মত বদলে ঝোপঝাড় ভেঙে দক্ষিণে চলে এলাম, তারপর সিক্রেট পাসের ভেতর দিয়ে ফের পশ্চিমে।

রাতটা সিক্রেট পাসে কাটিয়েছি। বেলায় ঘুম ভাঙল। তারপর স্যাডলে চেপে পাহাড়ের মাথায় উঠে উত্তর-পুবে নজর বোলাতেই ব্যাক ট্রেইলে নড়াচড়া চোখে পড়ে। ফিল্ড গ্লাসের সাহায্যে চারজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেলাম।

আমাকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করছিল ওরা। তখনও প্রায় দশ-বারো মাইল দূরে ছিল, স্যাকরামেন্টো ওয়াশের ভাটিতে।

তখন একরকম বাধ্য হয়েই সিক্রেট পাস ট্রেইল ধরে হার্ডিভিলে চলে এসেছি।

এখন পর্যন্ত ওদের কারও দেখা পাইনি, তার মানে আমার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে ওরা আবার ঘাপটি মেরেছে। এই রহস্যময় আচরণ আরেকটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে: লোকগুলো সম্ভবত আমার পরিচিত।

'লোকটা কে জানি না,' নীরবতা ভাঙল হার্ডি, 'তবে বেটিকে তার খুউব দরকার।'

একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল হার্ডির কথায়, ঝট করে ঘুরলাম ওর দিকে। 'কেন খামোকা বোঝা বাড়াচ্ছ, দোস্ত, সরে যাও,' পরামর্শ দিল হার্ডি। 'স্যালুনে তিনজন লোক নজর রাখছে ওর ওপর। লক্ষণটা ভাল ঠেকেনি আমার কাছে। ওদের দ্বারা সব সম্ভব – হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে।'

'মেয়েটাকে কথা দিয়েছি।'

'হুম্, তোমার মৃত্যু ঘনিয়েছে – আমার বলা কর্তব্য, তাই বললাম।'

'কী জানি,' ম্লান সুরে বললাম, 'গোলমাল আমার একদম অপছন্দ – আসলে আমাদের ওসমান বংশের কেউই পছন্দ করে না।'

পলকে পলক তুলল হার্ডি। 'কী বললে – তোমার নাম ওসমান?'

'হ্যাঁ – কেন, নামটা পরিচিত?'

চকিতে সর্পাহতের মত পিছিয়ে গেল ও। 'পালাও...যত তাড়াতাড়ি পারো!'

দ্রুত কেবিনের উদ্দেশে হাঁটা দিয়েছিল হার্ডি, আচমকা থমকে ঘুরল। 'ও তোমার নাম জানে?'

'তখন বললাম না, জিজ্ঞেস করেনি।'

'হুঁ।' চোখ তুলল সে, ওর চোখের ভাষা পড়তে পারলাম না, হ্যাট ব্রিমের নীচ দিয়ে কেবল মুখটা আবছা দেখা যাচ্ছে।

'শোনো, একটা পরামর্শ দিচ্ছি...বিলকুল মুফত...বলো না, অন্তত লস এঞ্জেলেসে পৌঁছুনোর আগে তো নয়ই।'

আমাকে ধাঁধায় ফেলে চলে গেল হার্ডি।

দুই

স্যালুনের জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। বারে-দাঁড়ানো লোকগুলো এখনও ড্রিঙ্ক করছে। কৃষ্ণ-নয়না মেয়েটি নেই।

চারটে বিশেষ কামরা আছে হোটেলে, একটা আমি দখল করেছি। বাকিগুলোর মধ্যে আর একটায় আছে ওই মেয়ে। পেছন দরজা দিয়ে ঢুকে ওর ঘরে গেলাম, আলতো টোকা দিলাম কপাটে।

কাপড়ের খসখস শব্দ উঠল ভেতরে, ক্লিক করে পিস্তলের হ্যামার টানার আওয়াজ হলো, তারপর নিচু গলায় সাড়া এল। 'আমার কাছে পিস্তল আছে। ভাগো!'

'ম্যাম,' ফিসফিস করে বললাম, 'লস এঞ্জেলেস যাবার ইচ্ছে থাকলে দরজা খোলো – কুইক!'

আবার খুটখাট শব্দ, তারপর সামান্য একটু ফাঁক হলো পাল্লা। ওর পিস্তলের মুখ উঁকি দিল আগে। বাচ্চাদের খেলনা নয়, রীতিমত পুরুষালি জিনিস – .৪৪ কোল্ট।

'পোশাক পাল্টে নাও, বিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হব

মানতে হবে, স্নায়ুর জোর আছে ওর। কোনও তর্ক করল না, শুধু বলল, 'আসছি। কোথায় – আস্তাবলে?'

'ফেরি,' বললাম আমি। 'সাঁতরে পার হব। সন্ধ্যের পর সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়।'

মুহূর্তের জন্যেও সোনা বা রাইফেল হাতছাড়া করিনি, ঘরে গিয়ে বাদবাকি মাল তুলে নিলাম, তারপর বিছানার দিকে একবার সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে বেরিয়ে এলাম পা টিপে টিপে।

আস্তাবলে গিয়ে স্যাডল চাপালাম ঘোড়ার পিঠে। নতুন ঘোড়াদুটোয় চড়ব আমরা, বাড়তি দুটো স্যাডল এবং আমার প্যাক হর্স পেছন পেছন আসবে। এভাবে ঘোড়া বদলে দ্রুত এগোনো যাবে, সহজে নাগাল পাবে না কেউ।

অবশ্যি তুরুপের তাস কেবল এই একটাই নয় আমার হাতে। পশ্চিমের ওই ট্রেইলে আগে কখনও যাতায়াত করিনি সত্যি, তবে ওখানকার পথঘাট সম্বন্ধে লোকমুখে নানান কথা শুনেছি। আমার বিশ্বাস, দৈব সহায় হলে অচেনা পথেও মানুষ তার গন্তব্যে পৌঁছুতে পারে।

ঘাটে গিয়ে দেখলাম, আগেভাগে এসে পড়েছে মেয়েটা। সাথে দুটো কার্পেটব্যাগ। তাড়াহুড়ো করে কাপড় পাল্টেছে, অথচ কোথাও তার ছাপ নেই। ওকে স্যাডলে উঠতে সাহায্য করলাম। নরম তুলতুলে বাহু।

অন্ধকার নদী। স্রোত আছে। পানিতে নামলাম আমরা, তর্জনী তুলে আমি সামনে ইশারা করলাম। 'সোজা ওই চূড়ো বরাবর এগিয়ে যাও। পাড়ে উঠে ডাকাডাকি কোরো না – আমি খুঁজে নেব।'

আমার রাইফেল, গান বেল্ট সব কাঁধে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছি পানি কেটে। পেছনে আসছে মেয়েটা।

পানি এখানে গভীর, তল পেতে হিমশিম খাচ্ছে স্ট্যালিয়ন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, মেয়েটা আমার ঠিক পেছনেই রয়েছে। ওর ঘোড়াও জোর লড়াই করছে স্রোতের সাথে। পাড়ে উঠেছি আমরা, এমন সময়ে পেছন থেকে দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল কেউ। বাপ-মা তুলে গাল বকছে।

'ব্যাপার কী?' বললাম। 'এত শিগগির তো টের পাবার কথা নয়?'

আমার পাশে এসে রাশ টানল বেটি ওয়ারেন। 'বোধ হয় ফেরি-মালিক বলে দিয়েছে,' বলল।

'ফেরি-মালিক? ও কী করে জানল?'

অবাক চোখে তাকাল মেয়েটা, যেন এত বোকা আর দেখেনি। 'কেন –

আমি পার করে দিতে বলেছিলাম। ও রাজি হয়নি।'

জীবনে কোনও দিন কোনও মেয়ের গায়ে হাত তুলিনি, ইচ্ছে হলো ওর গাল লাল করে দিই। অতিকষ্টে ক্রোধ দমন করলাম, ঘোড়া ঘুরিয়ে যাত্রা করলাম ডেড মাউন্টিন্সের দিকে। এ-মুহূর্তে আমি খালি হাতে একটা গ্রিজলিকে সামলাতে পারব।

'সব ভণ্ডুল করে দিয়েছ,' তিরিক্ষে সুরে বললাম ওকে। 'ওদের সাথে ব্যবধান বাড়াবার জন্যে আমি কোথায় আগে রওনা দিলাম, তোমার ভুলে সেটা আর হলো না। ওরা এখন ছুটে আসবে।'

'পারবে না!' প্রতিবাদ করল মেয়েটা। 'ও এখনও – মানে, আমাদের পেছনে কেউ লাগবে কেন?'

'তুমিই সেটা ভাল জানো। তবে হার্ডি বলল, স্যালুনে কয়েকজন লোক নজর রাখছিল তোমার ওপর।'

গুম মেরে গেল বেটি, জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত অবস্থা হলো ওর, সুযোগও পেল না কিছু বলার, কারণ আমি ইতিমধ্যে জোর কদমে ওকে অনেকটা পেছনে ফেলে চলে এসেছি। স্ট্যালিয়নটা তাজা, আমার আগের ঘোড়া এই সুযোগে আরেকটু জিরোতে পারবে।

নিশুতি রাতে খুরের শব্দ ঢাকের মত শোনাচ্ছে। পাগলা ঘোড়ার মত ছুটছে স্ট্যালিয়ন, যেন ওর লেজে জ্বলন্ত সলতে বেঁধে দেয়া হয়েছে। রাগ হচ্ছে, তবু মনে মনে বেটির প্রশংসা করতে বাধ্য হলাম। নিতান্ত আনাড়ির মত স্যাডলের একদিকে পা ঝুলিয়ে বসেছে, এক হাঁটুর সাহায্যে আংটার মত আঁকড়ে রয়েছে স্যাডলহর্ন, কিন্তু আমার পিছু ছাড়েনি – গদের আঠার মত লেগে আছে।

ওই লোকগুলো ওকে কেন ধরতে চাইছে খোদা মালুম, তবে শ্বেতাঙ্গরা আজকাল ইন্ডিয়ানদের চাইতেও রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছে। সম্ভব হলে গোলমাল এড়িয়ে যাব। সূর্য ওঠার আগমুহূর্তে রাশ টেনে স্যাডলগুলো বদলে তাজা ঘোড়ায় চাপালাম আমি। কিন্তু রওনা হলাম আরও এক ঘণ্টা পরে।

পেছনে ডেড মাউন্টিন্স অনড় দাঁড়িয়ে। একটা বালিয়াড়ি দেখতে পেয়ে মোড় ঘুরলাম। যতদূর জানি, এ-জায়গার নাম পাইউট ওয়াশ, উত্তরে বেশ কিছু দূর চলে গেছে, তারপর একটা আবছা ট্রেইল ওখান থেকে পাইউট স্প্রিংয়ে গিয়ে মিশেছে।

কথা বলার মত ফুরসত নেই এখন, তা ছাড়া ইচ্ছে করছে না, আমার একমাত্র লক্ষ্য ওই লোকগুলোর সাথে ব্যবধান বাড়ানো।

পাইউট স্প্রিংয়ে, রেঞ্জের পুব প্রান্তে আমরা থেমে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়ালাম, নিজেরাও পান করলাম কিছুটা। সামনে প্রায় সমতল উপত্যকা, জশুয়া বন। প্রথমে ছড়ানো-ছিটানো গাছ, তারপর নিবিড়। বনে ঢুকে চলার গতি মন্থর করলাম যাতে ধুলো কম ওড়ে।

হাজার হাজার গাছ উপত্যকায়। চমৎকার আড়াল। ওপর থেকে হয়তো

আমাদের দেখা যাবে, কিন্তু সমভূমিতে সেটা সম্ভব হবে না। যুদ্ধের সময়ে হার্ডিভিল ও ফোর্ট মোজাভের মধ্যে একটি রাস্তা নির্মিত হয়েছিল, আমরা তার সমান্তরালে এগোচ্ছি।

যখন রক স্প্রিংয়ে পৌঁছুলাম, সূর্য ডুবে গেছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা ক্ষীণতোয়া ঝরনা। উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম, এখানে পানি পাব আশা করিনি।

বেটি ওয়ারেনের অবস্থা কাহিল, অতিশ্রমে বসে গেছে চোখমুখ। কোলে করে ঘোড়া থেকে নামালাম ওকে। ম্যাটিতে পা রেখেই আমার বুকে নেতিয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার খুব শক্তি।'

ওর আদিখ্যেতায় গা জ্বলে গেল, ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা করলাম। অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল বেটি, আমি ঘুরে জ্বালানি কাঠ জোগাড়ে মন দিলাম। জায়গাটা ঘেরা। বিশ্রামের পাশাপাশি কফি-নাস্তা এগুলো সারা যাবে।

এ-সব হরহামেশা করতে হয় আমাকে, তাই অসুবিধে হলো না। অল্পক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল খাবার, কফি।

'তোমার নাম কিন্তু বলোনি।'

'ওরিন।'

'ব্যস – এই?'

'যথেষ্ট।'

'আমি ওয়ারেন বেটি।'

মনে হলো নামটা বানোয়াট, তবে আমি জানি আসল নামও অনেকক্ষেত্রে বানোয়াটের মত শোনায়। 'প্লিজড টু মিট ইউ।'

'কই, জানতে চাইলে না তো, স্টেজের জন্যে কেন অপেক্ষা করতে পারব না।'

'সে তোমার ব্যাপার।'

ও একটা কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাইছে, কিন্তু আমি এর বেশি আর জড়াতে চাই না নিজেকে। এমনিতেই সাথে এনে ঢের বোকামি করেছি, এখন আপদ বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।

আকাশ নক্ষত্রের দখলে। নাস্তা সেরে কফি পান করলাম আমরা। 'আগুন বোধ হয় জাদু জানে,' বলল ও, 'কয়লার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার ভাল লাগে।'

'শেষবারের মত দেখে নাও,' বললাম, 'নিভিয়ে দিচ্ছি।' কয়লার ওপর বালু ছিটিয়ে দিয়ে যোগ করলাম, 'বোকারাই শুধু আগুনের দিকে তাকায়। দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাবে, আঁধারে আর কিছু দেখতে পাবে না পরে। এভাবে অনেক লোক মারা গেছে।'

ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে মালপত্র বোঝাই করলাম। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল বেটি, আমার তৎপরতায় অবাক হয়েছে।

'যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে স্যাডলে ওঠো,' বললাম।

'যাচ্ছ? এই রাতেই?'

'তুমি চাও, ওরা আমাদের ধরে ফেলুক? আমি যখন এই ঝরনার অস্তিত্ব জানি – বাজি ধরতে পারো, ওরাও চেনে। মরুভূমিতে যারা চলাফেরা করে, পানির খোঁজ তারা রাখে।'

সন্দেহ নেই, ওই লোকগুলো মেয়েটাকে ধরার জন্যে প্রয়োজনবোধে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে। তবে ওরা যে আমাকেই অনুসরণ করছে না তাই-বা কে জানে? এরাই হয়তো হার্ডিভিল পর্যন্ত ট্রেইল করে এসেছে। যুদ্ধফেরত কিছু লোক সম্প্রতি এই এলাকায় উৎপাত শুরু করেছে। হামলা চালাচ্ছে লোকের জানমালের ওপর। অনেকের ধারণা ওদের নেতার নাম জন ফ্রিস্কো। দলপতির নামানুসারে ফ্রিস্কো আউটফিট বলে ডাকা হয় ওদের। এই আউটফিটের ঘাঁটি নেভ্যাডায়, এখানে এসে লুটতরাজ করে।

বেটি ওয়ারেনের আসল পরিচয় আমি জানি না। হয়তো কারও ঘর ভেঙে পালিয়ে এসেছে, কিংবা ক্যালিফোর্নিয়াতে কোনও রহস্যজনক ঘটনার সাথে যোগসাজশ থাকা বিচিত্র নয়। সম্ভবত এ-কারণেই ওকে খুঁজছে ওরা।

গোটা পরিস্থিতি খুঁটিয়ে বিচার করতে বসলাম। আমার জানামতে পরবর্তী জলাশয় মার্ল স্প্রিং, এখান থেকে বিশ মাইল দূরে। এই বিশ মাইল প্রায় রুক্ষ মরুভূমি। এখন রওনা হলে সকাল নাগাদ পৌঁছে যাব – অবশ্যি যদি ট্রেইল থেকে হঠতে না হয়, তবেই।

হঠলে?...এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে, আশা করি, মরুভূমিতে ইতস্তত ছড়ানো অসংখ্য কঙ্কালই যথেষ্ট। উপরন্তু, আমার সাথে একজন ক্লান্ত মহিলা রয়েছে, দীর্ঘ পথশ্রম সইতে পারবে না।

তিন

তথ্য সংগ্রহের জন্যে সে-কালে স্যালুন আর কাউ ক্যাম্পের জুড়ি ছিল না। এইসব আড্ডায় বসে লোকজন তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করত। ফলে পথঘাটের হদিস আপনাআপনি জানা হয়ে যেত মানুষের।

মাইলের হিসেব কেউ করত না। অন্তত সবক্ষেত্রে নয়। দূরত্ব মাপা হত সময় দিয়ে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছুতে কদিন লাগে এইভাবে।

জীবনে টেক্সাসের বাইরে যায়নি এমন অনেক কাউবয় বর্ণনা দিতে পারত হিকক, এরাপ, টিলগম্যান, মাসটার্সন, বা ম্যাথার্সের চেহারা কেমন। টাউন মার্শালের পরিচয় প্রায় সবাই জানত; আর যারা তা জানত না, তারা সহজে পশ্চিমের শহরগুলোতে আগুন নিয়ে খেলত না।

মোজাভেতে আমি নবাগত, কিন্তু এর বহু তথ্য জানি। পথঘাট কেমন, কী

ধরনের বিপদ আসতে পারে সবই আমার জানা। কেবল জানা ছিল না যে, একজন শহুরে মেয়েকে নিয়ে এই দীর্ঘ মরু পেরোতে হবে।

ট্রেইলে চললে বিশ মাইল পর আবার পানি পাব। তবে দক্ষিণে, প্রভিডেন্স মাউন্টিন্সের কাছেও পানি আছে। ওখানে একটা ঝরনা খুঁজে নিতে পারলে রাতে বিশ্রাম নিতে পারব আমরা। তারপর ভোরে দক্ষিণের কোনও ট্রেইল ধরে বেরিয়ে যাব। কাজটায় নিঃসন্দেহে ঝুঁকি আছে, তবে এতে ধাওয়াকারীদের চোখে ধুলো দেওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

ঈশ্বরনাম জপে ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। রক স্প্রিং থেকে যাত্রা করলাম দক্ষিণে।

মরু-রাত যেমন হয়, আজও তেমনি শীতল...প্রায় ঠাণ্ডা। আকাশে মেঘ নেই। লক্ষকোটি তারা। দিগন্তবিস্তৃত মহাকাশকে এত কাছে দেখাচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই তারাগুলোর নাগাল পাওয়া যাবে। চারদিকে দাঁত বের-করা কালো ভয়াল শৈলমালা। অচেনা অসমতল জায়গা, পথ চিনে চলতে হচ্ছে, তাই ধীর কদমে এগোচ্ছি। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ব্ল্যাক ক্যানিয়নে পৌঁছুলাম।

একটা ঝরনা ছিল ক্যানিয়নে, তবু আমরা অবিরাম দক্ষিণে এগিয়ে চললাম। সঙ্কীর্ণ বিসর্পিল গিরিখাত, হিমশিম খাচ্ছি এগোতে। দিনের আলোয় হয়তো ততটা অসুবিধে হত না, আঁধারে প্রতিমুহূর্তে প্রাণ হাতে করে আছি। আরও মাইলচারেক পর যখন গ্রানিট ওয়েলে উপস্থিত হলাম, আর এক পাও এগোনোর শক্তি রইল না।

ঝরনার অদূরে শুকনো বালুতে ক্যাম্প করলাম। চারপাশে অজস্র ছোট বড় পাথর। 'শুয়ে পড়ো,' আমার বিছানাটা পেতে বললাম। 'আমি মাটিতে শোব।'

'তোমার বিছানা আমি কেন নেব?'

'তর্ক কোরো না,' বললাম কঠোর সুরে। 'ভাল করে জিরিয়ে নাও, সামনের পথ আরও খারাপ।'

দুর্গম বন্ধুর এলাকা, পাথর আর বায়ু-প্রবাহিত বালু। কিছু নিচু মরুঝোপ আছে। আমার চোখে ঘুম নেই, আকাশ পানে চেয়ে ভাবছি পরবর্তী কর্মপন্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরা পথ ব্যবহার করে মানুষ। পুরোনো গভর্নমেন্ট রোড বা স্প্যানিশ ট্রেইল ধরে ক্যাজন পাসের ভেতর দিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের তাড়া করছে কিছু লোক, ওদের মতলব অসাধু, সুতরাং দক্ষিণে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়াই উত্তম।

ও-দিকে আরও একটা গিরিপথ আছে, জো ওয়াকার অন্তত তাই জানিয়েছিল। ইন্ডিয়ানরা একসময় ব্যবহার করত ওটা, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে একদল স্প্যানিশ বণিক ওই গিরিপথ পাড়ি দিয়েছিল। ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা, তবে আমাদের ওসমান রক্তে অজানার টান প্রবল, নতুন নতুন দেশ দেখতে ভালবাসি। সময়টাও এর উপযুক্ত। বেটি ওয়ারেন এই অবসরে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবে। অবশ্যি সেটা ওর আদৌ পছন্দ হবে কি না সন্দেহ।

মাঝে-মধ্যে আড়চোখে দেখছি মিস ওয়ারেনকে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পুরু নরম বালুর ওপর বিছানা, মোটা গদির চেয়ে কোনও অংশে কম আরামদায়ক নয়। ওর শ্যামলা মুখাবয়বের একাংশ দেখা যাচ্ছে কেবল। চুল শিথিলভাবে বিছানায় এলায়িত।

আগামী দিনগুলোতে অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হবে ও, তার আগে এই বিশ্রাম সুফলদায়ক হবে ওর জন্যে।

তবে আমার খটকা রয়ে গেছে। লোকগুলো ওকে ধাওয়া করছে কেন? ওরা কি আইনের লোক?

বারের লোকগুলোকে সে-রকম মনে হয়নি বদখত চেহারা। একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত: এই বিজন মরুভূমিতে, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও, মোকাবেলা করতে পারব ওদের, আমার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে।

একজন বৃষস্কন্ধ লোক বারে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। খচখচ করছে মনে। ওর চেহারা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে – কেন?

সহসা ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

ইতিমধ্যেই উঠে পড়েছিল বেটি, চোখ বিস্ফারিত। 'শব্দ পেয়েছি একটা,' বলল চাপা স্বরে।

'কীসের?'

'বুঝতে পারিনি – তবে ওতেই জেগে গেছি।'

আমার হাতে সিক্স-শূটার, প্রথমেই তাকালাম ঘোড়াগুলোর দিকে। ওদের কান খাড়া, পুবে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে।

পিস্তল নামিয়ে রেখে বুটজোড়া ঝাড়লাম ভাল করে – অনেক সময় মাকড়সা বাসা বাঁধে জুতোর ভেতর।

ভোর হতে আর বাকি নেই, তবে শুকতারা আকাশ কামড়ে আছে। 'উঠে পড়ো, শব্দ করবে না,' বললাম। 'এখুনি রওনা দেব।'

নীরবে হুকুম তামিল করল বেটি। এই ফাঁকে একটা জিনিস স্বীকার করছি: যে-কোনও অবলা মেয়ের চেয়ে দ্রুত তৈরি হতে পারে ও। আমি তাজা ঘোড়ায় স্যাডল চাপানো শেষ করলাম, ওরও বিছানা গোটানো সারা হলো, বেশ আঁটসাঁট বাঁধুনি।

ফিকে অন্ধকারে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'পুবে, মাইলখানেক দূরে, আরেকটা ঝরনা আছে। রাত্রে মরুভূমিতে বহুদূরের শব্দ শোনা যায়।'

আমার মনে হয় না শব্দটা অতদূর থেকে এসেছে, আবার একেবারে অসম্ভবও নয়। এটা যদি কোনও মানুষ বা ঘোড়ার আওয়াজ হয়ে থাকে মরুভূমিতে পানি লাগবে তার।

স্যাডলে চেপে সোজা দক্ষিণে যাত্রা করলাম। আমি পুরোভাগে, তারপর

প্যাক হর্স ও বাড়তি দুটো মাউন্ট, সবশেষে বেটি ওয়ারেন। যথাসম্ভব নরম বালুর ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ডানে প্রভিডেন্স মাউন্টিনস; আকাশ-ছোঁয়া, অটল, রুক্ষ।

কষ্ট হচ্ছে চলতে, তবে ট্রেইল চেনার মত পর্যাপ্ত আলো আছে। আট মাইল পর আবার বালুর দেখা পেলাম। ডানে, আগের মতই, সেই প্রভিডেন্স মাউন্টিনস, বাঁয়ে ধু-ধু মরুভূমি, দূরবর্তী পাহাড়-পর্বতের দিকে থাবা প্রসারিত।

'আমরা দক্ষিণে যাচ্ছি,' বলল কৃষ্ণ-নয়না।

ওর কণ্ঠে জিজ্ঞাসার ছাপ, সুতরাং উত্তর দিলাম। 'তুমি লসএঞ্জেলেস যেতে চাও, তাই না? ওরা ট্রেইলে খোঁজাখুঁজি করুক। আমরা দক্ষিণে গিয়ে, পরে অন্য একটা গিরিপথ হয়ে পশ্চিমে যাব।'

ওই গিরিপথ আমি চিনি না, লোকমুখে শুনেছি মাত্র, সেটা আর বললাম না ওকে। আমার জানামতে ওখান দিয়ে একটা স্টেজ রুট কলর্যাডোর স্বর্ণখনি লা পায অবধি গেছে।

দূর-আকাশে কমলার আভা, হুঁশিয়ারি জানাচ্ছে আরেকটু পরেই রোদে পুড়ব আমরা। দক্ষিণের কোথাও আরও কয়েকটা ঝরনা আছে, সেগুলো সহজে মিলবে কিনা সন্দেহ। ঊষর এলাকায় সম্পূর্ণ অভাবিত জায়গায় – মাঝে মাঝে উইলো, কটনউড বা পামবীথির ভেতরে, তবে প্রায়শঃ নিচু জংলা ঝোপের আড়ালে – পানির উৎসগুলো থাকে বলে সহজে চোখে পড়ে না। এখন সেসব খোঁজার সময় নেই।

আমার পাশে চলে এল মেয়েটা। 'তুমি খুব কম কথার মানুষ।'

ঈষৎ মাথা কাত করলাম আমি।

'বিবাহিত?'

'গালের কাটা দাগটা দেখে জিজ্ঞেস করছ তো? নিউ অরলিন্সে একবার ছোরা মারামারি করেছিলাম, তারই সাক্ষ্য।'

'বাড়িতে কেউ নেই?'

'আমার? আছে – অনেক – তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কত। কিন্তু আমি একলা থাকতেই পছন্দ করি।'

চোখের কোণে দেখলাম, কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে জরিপ করছে ও। একটুবাদে বলল, 'তোমার বাড়ি কোথায়, বললে না তো?'

দায়সারাভাবে শ্রাগ করলাম।

পরবর্তী দুমাইল এভাবে পাশাপাশি এগোলাম আমরা। একটা খরগোশ সঙ্গ দিল কিছুক্ষণ। বোধ হয় এই নির্জন প্রান্তরে মানুষের দেখা পেয়ে আনন্দিত বোধ করছিল। ওপরে নিঃসীম আকাশ, সূর্য ওঠার সাথে সাথে কচি নেবু পাতা বরণ থেকে তামাটে হচ্ছে। ডানের পাহাড়গুলো এখন শীতল, তবে আর দুঘণ্টার মধ্যে তাপ ছড়াতে শুরু করবে আমাদের ওপর।

'চোখ খোলা রাখো, সামনে ঝরনা আছে – হারিয়ে ফেললে ঝামেলা হবে।'

চুপ করে রইল ও। মেয়েটা সুন্দরী, পেছনে শত্রু না থাকলে ওর সঙ্গ উপভোগ্য হত।

'অসুবিধে হচ্ছে?'

'আমি কী তাই বলেছি,' শীতল গলায় জবাব পেলাম।

হাসলাম আপনমনে, খানিক আগের শোধ তুলল।

ক্রমশ গরম বাড়ছে। একরত্তি হাওয়া নেই। আগুন হয়ে গেছে সাদা বালু।

দূরে পর্দার মত নাচছে মায়াবী মরীচিকা। সামনে অদ্ভুত সব সরোবর দেখতে পাচ্ছি। চোখ ভিজে যাচ্ছে ঘামে। অবসন্ন পায়ে এগোচ্ছে ঘোড়াগুলো: সারা গায়ে ধুলো-ঘামের বিচিত্র নকশা। কথা কলার মত মনের অবস্থা নেই কারও।

খোলা প্রান্তরে রয়েছি আমরা। তাপ-তরঙ্গ আর পাহাড়ী দেয়াল সামান্য আড়াল সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে ব্যাক ট্রেইল জরিপ করছি আমি। কিচ্ছু নেই; শুধু দিগন্তবর্তী পাহাড়, মরীচিকা।

কুকস্ ওয়েল ধারেকাছেই কোথাও হবে, কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলেছি। খুঁজে সময় নষ্ট করলাম না আমি। আরেকটু গেলেই ব্লাইন্ড স্প্রিং, ওটাও যদি চোখে না পড়ে, তবে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে কটনউড ছাড়া কোথাও পানি মিলবে না।

ওরা কি আমাদের পেছনেই আছে? নাকি গভর্নমেন্ট রোড ধরে পশ্চিমে মার্ল স্প্রিং অভিমুখে যাচ্ছে? তাই যেন যায়, প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে।

'ওরা তোমাকে ধরার ব্যাপারে কতটা আগ্রহী,' আচমকা বললাম, 'জানতে পারলে সুবিধে হত।'

নীরবে কয়েক কদম এগিয়ে গেল ও, তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বলল, 'লোকটা ভয়ঙ্কর। আমাকে ধরার জন্যে দরকার হলে আধ-ডজন লোক খুন করবে...তারপর আমাকেও।'

আমার জবাব পেয়ে গেলাম।

ভর দুপুরে যাত্রা-বিরতি করলাম আমরা। ওকে নামতে সাহায্য করলাম আমি। ঝটপট স্যাডল বদলে, ক্যান্টিনের পানি দিয়ে স্পঞ্জ করলাম ঘোড়াগুলোর মুখ। তারপর নিজেরাও পানি খেয়ে ফের রওনা হলাম।

সারাদিন একনাগাড়ে ছুটে সন্ধ্যের মুখে ছেড়ে দিলাম ব্লাইন্ড স্প্রিংয়ের আশা। ক্যান্টিনের পানি তলানিতে ঠেকেছে, শিগগির একটা ঝরনার সন্ধান না পেলে অবস্থা কী হবে ভাবতেই আমার হাত-পা হিম হয়ে এল। আমরা হয়তো কষ্ট সইতে পারব, কিন্তু ঘোড়াগুলো পারবে না; অথচ ওদের ছাড়া আমরা অসহায়।

এক জায়গায় থেমে স্যাডল খসিয়ে ঘোড়াগুলোর শরীর দলাই-মলাই করলাম আমি, স্পঞ্জ করলাম মুখ। বেটি চুপ করে আছে। ওর কিছু বলার থাকলেও, আমার শোনার ইচ্ছে নেই।

কোমল রাত নামল মরুভূমিতে। অন্ধকারের রেমশী পর্দায় ঢাকা চরাচর। একটা-দুটো করে তারা ফুটছে আকাশে। হিমেল বাতাসে পথশ্রমের ক্লান্তি জুড়ায়।

ঘোড়া পরিচর্যা শেষ হতে স্যাডলব্যাগ থেকে রুটির শেষাংশ বের করলাম। শুকিয়ে খটখট করছে জুতোর সুখতলার মত; কিন্তু বেটিকে দিতে ও এমনভাবে খেতে লাগল যেন ওটা কেক। একসময় বলল, 'আমরা বিপদে পড়েছি, না?'

'বলতে পারো – তবে আমি আশা ছাড়িনি। যদ্দূর শুনেছি, সামনের তিন-চার মাইলের ভেতর তিনটে ঝরনা আছে। ওগুলোর একটা হয়তো পেয়ে যাব।'

বিশ্রামের অবকাশ খুব কম, তবু ঘোড়াগুলোর ভরসায় শুয়ে পড়লাম আমরা। বেটি আমার বিছানায়, আমি বালুতে গর্ত খুঁড়ে।

ভোরে ঘুম ভাঙল আমার। পুরোপুরি ফরসা হয়নি। মিটিমিটি জ্বলছে শুকতারা। বেটি ওয়ারেন আগেই জেগেছে, নীরবে তাকিয়ে আছে তারার পানে। বুট পরলাম আমি। ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললাম, 'পশ্চিম মেয়েদের জায়গা নয় – এখানে চাই কঠিন মানুষ।'

ও আগের মতই নিশ্চুপ পড়ে রইল, ঘুরে একটিবার তাকাল না পর্যন্ত, তারপর আমি যখন কোমরে গান বেল্ট বাঁধার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম তখন বলল, 'আমাকে লস এঞ্জেলেস পৌঁছে দাও, তা হলেই চলবে।'

জবাব দিলাম না। ব্যানডানা দিয়ে পিস্তলের সিলিন্ডার, হ্যামার সাফ করলাম। অসীম প্রত্যাশা মেয়েটার। বোধ হয় নিজেও জানে না যে আকাশের চাঁদ পেড়ে দিতে বলছে। কিন্তু রাখতে পারব না এমন কোনও প্রতিশ্রুতির মধ্যে আমি যাব না।

'রাশ আলগা রাখো – ওরা নিজেরাই পানি খুঁজে নেবে,' স্যাডলে চড়ে বললাম ওকে।

যদিও আমাকে জানানো হয়েছিল কটনউডের অবস্থান এই পাহাড়ের শেষ-মাথায়, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম অপর দুটো ঝরনার সন্ধান করব কারণ ঘোর বিপদের মুখে পরের কথায় চলা ঠিক নয়। তাই দক্ষিণে এগিয়ে গেলাম, স্ট্যালিয়নকে সুযোগ দিলাম নিজের মাথা খাটানোর।

কিছুক্ষণ আনমনে দুলকি চালে এগোল। যেন একটা কিছু করতে হয় তাই করছে, তারপর হঠাৎ বাতাসের গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে মাথা তুলল, চলার বেগ বাড়িয়ে ডান দিকে এগিয়ে গেল। প্রথমে ভেবেছিলাম ওল্ড ড্যাড মাউন্টিনসের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু খানিকবাদে একটা ছোট্ট টিলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। টিলার দুপাশে চারণভূমি।

পাহাড়ের ফাটলে একটা ঝরনা। তিরতির করে গড়িয়ে পড়ছে পানি। ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিলাম ঝরনার কাছে। আমাদের ক্যান্টিন ভরে নিয়ে আবার রওনা হলাম।

বারো মাইল পর উইলো স্প্রিং। উইলো আর গুটিকতক কটনউডে ঘেরা।

এখানে পানির প্রবাহ বেশি। বেটি ঝরনায় নামল হাত-মুখ ধুতে, আমি উইনচেস্টার হাতে খাঁজের মাথায় উঠলাম ব্যাক ট্রেইলের প্রতি নজর রাখব বলে।

একটা মসৃণ পাথরের অংশবিশেষ পড়ে আছে ছায়ায়। ঠিক পাথরের সামনে, প্রায় ছ-সাত ফুট নীচে বালুর ঢিপি। সাদা, হাওয়ায় উড়ে জমা হয়েছে। ছায়ায় পাথরের কিনারে একটা ঠাণ্ডা জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ব্যাক ট্রেইল – দিগন্তে আকাশকে চুমু খাচ্ছে প্রভিডেনস গিরিমালা।

মাথার ওপর গনগনে সূর্য, হাওয়া নেই নিস্তব্ধ দুপুর। দূর মরুভূমিতে গ্যালেটা ঘাস আর ক্রেসটোস ঝোপের ভেতর ধুলোর ঘূর্ণি, শয়তানীর মত নাচছে। কোনও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না সম্ভবত আমাদের আসার সময়ে উড়েছিল, থিতানোর অবকাশ পায়নি। এ-যাত্রা ফাঁড়া বোধ হয় কেটে গেছে।

মাথা কেন ঘুরিয়েছিলাম খেয়াল নেই, তবে বাঁয়ে তাকাতেই সূর্যের প্রতিফলন ধরা পড়ল একটা রাইফেল মাযলে।

চকিতে বালুর ঢিপির ওপর ঝাঁপ দিলাম। পড়েই ডিগবাজি খেলাম একটা। উঠে বসলাম এক হাঁটুতে ভর রেখে, অপর পা সামনে ছড়ানো। ইতিমধ্যে উইনচেস্টার চলে এসেছে ফায়ারিং পজিশনে।

দুটো গুলির প্রতিধ্বনি বহুক্ষণ জেগে রইল উত্তপ্ত মরুভূমির বুকে। পাথরের আড়াল থেকে একটা লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে টান দিলাম ট্রিগারে। ওর বুকের বাঁ-প্যাশে জ্যাকেটের ধুলো উড়ল।

এমন কিছু আহামরি লক্ষ্যভেদ নয়, বড়জোর তিরিশ গজ দূরে ছিল লোকটা। কোত্থেকে এসেছিল জানি না, শুধু জানি: আর কোথাও যাচ্ছে না। .৪৪ কার্তুজ ওকে বিনামূল্যে স্বর্গের ওয়ানওয়ে টিকেট কেটে দিয়েছে।

সন্তর্পণে উঠে পড়লাম আমি, ফিরতি পথ ধরলাম ঝোপঝাড় ভেঙে। কাঁটার ঘায়ে ছড়ে যাচ্ছে চামড়া, সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঝরনার ধারে পৌঁছে লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে। হাঁফ ধরে গেছে, শরীর চলতে চাইছে না। পরক্ষণে চমক ভাঙল একটা তীক্ষ্ণ মেয়েলি স্বরে। বেটি পাড়ে দাঁড়িয়ে, বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে একখানা লম্বা-ঝুলের শার্ট; নগ্ন উরু, পায়ে বিন্দু বিন্দু পানি, ভেজা চুল থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে মাটিতে। চোখদুটো বিস্ফারিত, এমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে যে মনে হলো ফিরে গিয়ে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দেই। পরক্ষণে অন্য একটা চিন্তা বাতিল করে দিল সে-অভিলাষ।

'জলদি কাপড় পরো,' বললাম, 'ওরা এসে পড়েছে।'

আমার পায়ের কাছে বালু ছিটাল একটা বুলেট। গড়িয়ে ঝোপের ভেতর চলে গেলাম। উইলো পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলাম তপ্ত সীসে ঢোকানোর মত কাউকে চোখে পড়ে কী না। কেউ নেই।

মিলিয়ে গেছে প্রতিধ্বনি। মরুভূমি আবার যথারীতি শান্ত। অবিশ্রাম রোদে ফুটছে বালু। ওরা কারা, সংখ্যায় কতজন জানি না। তবে গোলাগুলি যখন শুরু করেছে, আমিও খেলা দেখাব একহাত।

খানিকবাদে ঝোপ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার কাছে গেলাম, পাথরের আড়ালে রয়েছে। মেয়েটার প্রতীক্ষায় রইলাম ওখানে পৌঁছে। সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখছি চারদিকে, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অদূরবর্তী পাহাড়ী এলাকার চিন্তা। আর চার মাইল, তারপরেই ন্যাড়া মরুভূমি।

অবিলম্বে পালাতে হবে আমাদের। এখানে অনেক আড়াল – সহজেই লুকিয়ে থেকে আক্রমণ করতে পারবে। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কুহকিনী, কালো চোখজোড়া জ্বলছে ধক্‌ধক্‌ করে। ও কিছু বলার আগেই কোমরে ধরে বসিয়ে দিলাম স্যাডলে। ঘোড়ার মাজায় চাপড় দিয়ে বললাম, 'গো!' তারপর আমি নিজেও জিনে চেপে ছুটতে শুরু করলাম উর্ধ্বশ্বাসে।

এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল পেছন থেকে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে এক পলকে দেখলাম একটা পাথরের পাশে চার-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে, পরমুহূর্তে সামনে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল আরও দুজন। পিস্তলের ঢঙে উইনচেস্টার ধরা ছিল আমার হাতে, ফুটো করে দিলাম একজনের বুক। অন্যজনের বুলেট আমার কানের লতি ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল; পরক্ষণে অ্যাপালুসা ধেয়ে গেল ওর দিকে। তীব্র আর্তনাদে কানে তালা লেগে গেল, খুরের চাপে গুঁড়িয়ে গেছে লোকটার পাঁজর। তবে মরেছে কিনা দেখার জন্যে থামলাম না, কেবল কামনা করলাম খুরটা যেন পাঁজরে আটকে না থাকে।

অল্পদূর গিয়ে রাশ টানলাম আমি, দ্রুত তিনবার গুলি ছুঁড়লাম ওদের লক্ষ্য করে। এই অবকাশে বেটি এবং অন্য ঘোড়াগুলো এগিয়ে গেল। টিলার আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছিল ওরা, বুলেট তিনটে পাথরে আঘাত হানল।

অন্তত এক-দেড় মিনিট ওভাবে থাকতে হবে ওদের, পাথরে ঠিকরানো বুলেট পাগলা হয়, এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে সামনে নরম কিছু পেলে। ততক্ষণে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

এই ঘোড়াগুলো ভাল। বিপক্ষ দল চুপিসারে আসতে গিয়ে নিজেদের ঘোড়া কিছুটা দূরে রেখে এসেছে। সুতরাং সময় লাগবে পিছু নিতে। ব্রিস্টল মাউন্টিনসের ছায়ায় পৌঁছে পেছন ফিরতে বহু দূরে কালো কালো বিন্দুর মত কয়েকটা অবয়ব চোখে পড়ল।

বেটি ওয়ারেনের পাশে গিয়ে বললাম, 'এরপর যদি স্নান করতে হয়, লস এঞ্জেলেস গিয়ে।'

চার

ওরা এত তাড়াতাড়ি হদিস পেল কীভাবে? নিশ্চয়ই সঙ্গে ট্র্যাকার আছে, কিংবা বুদ্ধিমান এমন কেউ রয়েছে যে অন্যের মতিগতি বিচার করতে পারে। দুশ্চিন্তায়

পড়ে গেলাম, কী করব ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। সঙ্গে মহিলা থাকায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে।

গোড়ায় ওদের যে-উদ্দেশ্যই থেকে থাকুক, ব্যাপারটা এখন গোলাগুলির পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ধূলিশয্যা নিয়েছে তিনজন লোক, সম্ভবত তিনজনই নিহত, কিংবা আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে। বন্ধুদের রক্ত মাড়িয়ে অন্যরা বেমালুম ভুলে যাবে সেটা, মনে হয় না।

এ-যাবৎ দৈব আমার সহায় হয়েছে – দুর্ভাগ্য কেবল এটুকুই যে ওরা খুঁজে পেয়েছিল আমাদের, কিন্তু সৌভাগ্যবশত নিজে আহত হইনি। মেয়েটা বা ঘোড়াগুলোও চোট পায়নি।

সামনে এখন একটা পথ খোলা আছে: আমাদের খুঁজতে গিয়ে ওরা যেন গলদঘর্ম হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে ওরা হাল ছেড়ে দিলে বাঁচোয়া, অবশ্যি ওরা সে-রকম কিছু করবে বলে মনে হয় না। এ-পর্যন্ত যত লোকসান ওদের হয়েছে, এইবার সেটা আরও বাড়ানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে।

ব্রিস্টল পর্বতমালা পেরিয়ে আমরা দক্ষিণে শীপ হোলস গিরিপথের উদ্দেশে ছুটে চললাম। মাঝখানে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল ধু-ধু মরু, পানির ছিটেফোঁটাও নেই।

দিগন্তে, অনতিদূরে, মাথা উঁচিয়ে রয়েছে একটা জ্বালামুখ, আগ্নেয়গিরির গা কালো শুকনো লাভায় একাকার। এরপরেই একটা মরা লেক। লাভা ও লেক যেখানে মিশেছে, সে-দিকে ঘোড়া ছুটালাম।

কিছুক্ষণবাদে পেছন ফিরে দেখলাম যে-নচের ভেতর দিয়ে আমরা এসেছি সেটা একটা পাহাড়ের ও-পাশে অদৃশ্য হয়েছে। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই, কেবল আমাদের ঘোড়া খটাখট আওয়াজ – খুরের আঘাতে ধুলো উড়ছে।

পেছনে চোখ-ধাঁধানো তাপ-তরঙ্গ, সামনে এবং চারপাশের দামাল হাওয়া প্রকৃতির আদল বদলে দিচ্ছে। ছোট্ট টিলাকে মনে হচ্ছে গগনচুম্বী টাওয়ার, বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড়কে দেখাচ্ছে ঝাঁকড়া গাছের মত। ঘোড়ার গায়ে ঘামের বিচিত্র আঁকিবুঁকি, চারপাশে ধুলোর মেঘ। একটা হারানো পৃথিবীতে এসে পড়েছি আমরা – দূরত্ব এবং ঝলসানো উত্তাপে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বাইরের জগতের সাথে।

বহুদূরে, বিশ মাইলেরও বেশি হবে, সারি সারি নীল পাহাড়...শীপ হোল মাউন্টিনস। তারপর আবার মরুভূমি এবং আরও পাহাড়।

ওরা কি পিছু নেবে? নাকি আমাদের চেয়ে বেশি চালাক? আমরা যখন লস এঞ্জেলেসেই যাচ্ছি, তখন আগেভাগে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করাই কি সঙ্গত নয়?

তবে, এবং এটাই আশার কথা, ওরা আমাদের পরিকল্পনা জানে না। আমরা স্যান দিয়েগো, অথবা পিছিয়ে উত্তরে গিয়ে উপকূলবর্তী রাস্তা ধরে স্যান ফ্র্যানসিসকোতেও যেতে পারি।

অনুসরণ ছাড়া ওদের উপায় নেই, সুতরাং আমাদের ধরে ফেলার আগেই গোলকধাঁধা সৃষ্টি করতে হবে। পিছু নেওয়ার জন্যে ওদের যদি ট্র্যাক দরকার হয়, অসংখ্য পাবে – বুনো দুর্গম এলাকায়। যদিও কৃষ্ণ-নয়না উপভোগ করবে না সেটা। বরং, আমার ধারণা, এভাবে এসেছে বলে এখন নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে। ওরা ওকে মুঠোয় পেলে ওর কী হবে জানি না, তবে সামনে যে-দুঃসময় আসছে সেটাও নির্ঘাত কোনও অংশে কম নয়।

জো ওয়াকার এবং ওল্ড বিল উইলিয়মস, দুজনেই পাহাড়ের লোক। এরা ছাড়াও প্রেসকটে দুজন হুয়ালাপাই ইন্ডিয়ানের কাছে মোজাভে সম্পর্কে বহু কিছু শুনেছি। বস্তুত ওরাই আমাকে স্যান গরগনিও পাসের কথা জানিয়েছে।

মরুভূমিতে ভ্রমণ আজ আমার নতুন নয়। গুডনাইট-লাভিং ট্রেইল ধরে পশ্চিম টেক্সাসের পাহাড়ী অঞ্চল পাড়ি দিয়েছি। নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যানডস্ এলাকাতেও গিয়েছিলাম একবার। তাই এ-ব্যাপারে অল্পবিস্তর জানাশোনা আছে।

পলায়নপর মানুষের জন্যে মরুভূমি মোটামুটি নিরাপদ আশ্রয়, তবে সূর্যাস্তের অপেক্ষায় থাকা উচিত। ঠিক এর উলটোটি করছি আমরা, ঠাঠা রোদে পথ চলছি। কী করব, উপায় নেই – পেছনের লোকগুলো বিরাম দিচ্ছে না।

নেহাত আমার কপাল ভাল, তখন বেঁচে গেছি। এরপর মনে হয় না আর তা হবে।

একনাগাড়ে ছুটছে ঘোড়া, আমরা স্যাডলে বসে ধুঁকছি। শুধু আমি, মাঝে মাঝে, পেছন ফিরে দেখছি কেউ আসছে কিনা। দুবার থেমে ঘোড়াগুলোর মুখ স্পঞ্জ করে দিয়েছি, এক ঢোক পানি খেয়েছে বেটি ওয়ারেন।

সন্ধ্যে নাগাদ পর্বতমালার দেখা পেলাম সামনে। আমি গিরিপথ খুঁজতে শুরু করলাম। পাহাড়ের দীর্ঘ একটা বাহু আমাদের পুবে, অর্থাৎ বাঁয়ে চলে গেছে, একটুবাদে ডানে আরেকটার দেখা মিলল। একটা নচ চোখে পড়তে সে-দিকে এগিয়ে গেলাম, তবে তার আগে পেছনটা দেখে নিলাম শেষবারের মত। ক্ষীণ ধুলোর ট্রেইল ঝুলে রয়েছে আকাশে।

শীপ হোল মাউন্টিনসে একটা ছোট্ট কোভে ক্যাম্প করলাম আমরা। বাইরে গুটিপায়ে আঁধার নামছে, প্রকৃতিতে শীতলভাব, ওপরে কোথাও ডাকছে একটা মরু-শেয়াল হুক্কাহুয়া হুক্কাহুয়া।

আহারের জোগাড় সেরে শোবার আয়োজন করলাম। শিথানের কাছে একটা গুলিভরা বাড়তি কোল্ট রাখলাম আমি।

'ওখানে একজনকে খুন করেছ তুমি,' হঠাৎ বলল বেটি।

'হ্যাঁ – তিনজনকে।'

'বাহ্! এমনভাবে বলছ যেন গরু-ছাগল মেরেছ!'

'বাগে পেলে ওরাই আমাকে খুন করত।'

ওকে এক কাপ কফি দিয়ে জোড়াসনে বসলাম। আগুন থেকে বেশ কিছুটা

দূরে আশ্রয় নিয়েছি আমরা, সহসা কারও চোখে পড়ব না। আরও একটা লাভ আছে এতে – কেউ আমাদের কাছে আসার চেষ্টা করলে শুনতে পাব, লাকড়ি ফাটার শব্দে কান বধির হবে না।

'যেচে কারও সাথে লাগতে চাই না আমি, কিন্তু কেউ বাড়াবাড়ি করলে আর উপায় থাকে না।'

ঘুমে ঢুলছে ও, একখণ্ড গরুর জার্কি বাড়িয়ে দিলাম। 'চোষো, কাজে দেবে।'

আমি নিজেও চুষলাম কিছুক্ষণ, তারপর বললাম, 'পিস্তল ঝোলানোর বিপদ আছে। একটা সময় আসে যখন ব্যবহার করতেই হয়।'

ঘুমিয়ে পড়েছে বেটি। ওর গায়ে কম্বল টেনে দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিলাম। তারপর বাইরে গিয়ে মালিশ করলাম ঘোড়াগুলোকে, ভেজা ন্যাকড়া চিপে পানি খাওয়ালাম। কিছুই হলো না এতে, আরও চায়; কিন্তু আমার কাছে যে আর নেই ওরাও বোধ হয় সেটা বুঝল।

মেসার কিনারে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতে রাইফেল, কান খাড়া। চাঁদ নেই, মিটিমিটি জ্বলছে তারা। গা ছমছমে পরিবেশ। বিরাট বিরাট জশুয়া গাছ অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে। বাস্তবিক ওগুলোর একটা মানুষ হলে আশ্চর্য হব না। আবহাওয়া এখন অনেক ঠাণ্ডা, ক্লান্তি সত্ত্বেও এক অনির্বচনীয় অনুভূতি জাগল মনে।

কাজের চাপে কবিত্বের সুযোগ পাইনি। সেনাবাহিনীতে আমার ইউনিটের এক লোক সর্বদা একটা বই রাখত কাছে। মাঝে মাঝে আমাকে দু-চার লাইন পড়ে শোনাত। সে-সব স্মৃতি মনে পড়ছে। আহা, আমিও যদি ওর মত মরুরাত সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে পারতাম!

মসৃণ পাথরের ওপর বসে আছি। প্রতিটা শব্দ অর্থবহ হয়ে ধরা পড়ছে, মাঝে-মধ্যে কষ্ট করে শুনতে হচ্ছে, তবু শব্দটা চিনতে পারছি। মানুষ, ঘোড়া, বা স্যাডলের খসখস, কিংবা স্পারের ঝুনঝুন নয়।

অসাড়ে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। বুঝি, ওর বিশ্রাম দরকার। অথচ আমাদের যারা অনুসরণ-করছে তাদের ভেতর একজন ট্র্যাকার আছে। লোকটা দক্ষ। এ-জন্যেই যত দুশ্চিন্তা, ও যদি এভাবে এগোতে থাকে যে-কোনও মুহূর্তে আমরা চরম পরীক্ষার মুখোমুখি হব।

দিশেহারা অবস্থা আমার, সব কিছু ধোঁয়াটে ঠেকছে। মেয়েটাকে এ-রকম মরিয়াভাবে খুঁজছে কেন ওরা?

ও সুন্দরী নিঃসন্দেহে, যে-কোনও পুরুষের কামনার বস্তু। এত যে ক্লান্ত, তবু ওর সৌন্দর্য ম্লান হয়নি। রহস্য বোধ হয় আরও গভীরে। সম্ভবত ওর পক্ষ নিতে গিয়ে আইনের বিরোধিতা করছি আমি। তবে হার্ডিভিলের ওই লোকগুলোর কারও বুকেই ব্যাজ ছিল না...ওদের দেখে সে-রকম মনে হয়নি। অবশ্যি পশ্চিমের শহরগুলোতে আইনের লোকমাত্রই যে সবার চেহারাতেই

সাদৃশ্য আছে তা নয়।

একটুবাদে ঘোড়াগুলোকে আরেক দফা পরখ করে শুয়ে পড়লাম।

অসম্ভব ক্লান্ত, তবু ঘুম এল না। বেটি ওয়ারেনের সত্যিকার পরিচয়, উদ্দেশ্য কিছুই জানি না বলে অস্থির বোধ করছি। শেষ অবধি হয়তো দেখব আমার অনুমানই ঠিক, ও একটা ডাইনী।

ডাইনীদের ভয় পাই তা নয়। সারাজীবন ওদের সম্বন্ধে নানান গল্প শুনেছি, চোখে দেখিনি...

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, চোখ খুলে দেখলাম দিনের আলো।

উজ্জ্বল ঝলমলে সূর্য।

মুখের ওপর রোদ পড়ায় জেগে গেছি, দ্রুত উঠে বসে তাকালাম চারপাশে।

ক্ষণিকের জন্যে মনে করতে পারলাম না কোথায় আছি এবং কেন। তারপর মেয়েটার দিকে চোখ পড়ল – বসে আছে।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' সলজ্জে হাসলাম। 'বোকামি হয়ে গেছে।'

খাড়া পাহাড়, এবড়োখেবড়ো। চেষ্টা করলে পায়ে হেঁটে একজন মানুষের পক্ষে ওঠা সম্ভব। সামনে, এবং ঈষৎ দক্ষিণে, উন্মুক্ত মরুভূমি। ইতস্তত ছড়ানো জশুয়া গাছ এবং ছোট ছোট ঝোপ। দক্ষিণে, প্রায় বারো-চোদ্দ মাইল দূরে পিন্টো মাউন্টিনস।

আমরা যে-কোভে লুকিয়ে আছি সেটা এক একরের মত সমতল জায়গা। বালুময়। হালকা কচি ঘাস আছে। আমাদের পাঁচটা ঘোড়া চরছে ওখানে। কোভের প্রবেশমুখ বালুর ঢিপি আর ঝোপে ঢাকা। ফলে ঢিপির মাথায় না চড়লে ভেতরটা কারও চোখে পড়বে না।

বস্তুত এটাই রক্ষা করল আমাদের। তা ছাড়া বাতাস থাকায় ঘোড়াগুলো পরস্পরের গন্ধ পায়নি। ঢিপির ওপর দিয়ে উঁকি দিতে ওই অশ্বারোহীদের দেখতে পেলাম। গজপঞ্চাশেক দূরে জটলা করছে।

রাতে বাতাস ছিল। মৃদু, তবে ট্রেইল মুছে ফেলার জন্যে যথেষ্ট। আমাদের ট্র্যাক হারিয়ে ফেলায় স্থির করতে পারছে না কোন দিকে যাবে।

বালুর স্তূপ জমেছে পাহাড়ের পাশে। কোথাও কোথাও এত উঁচু যে গোটা এলাকাটাই ঢাকা পড়েছে। ফলে কেউ এ-দিকে তাকালে সহসা ধরতে পারবে না বালু এবং পাহাড় ছাড়াও কিছু আছে।

বেটিকে অনড় থাকতে বললাম ইশারায়। উপুড় হয়ে শুয়ে আছি আমি, কেবল মাথাটা সামান্য জাগানো, সেটাও একটা জশুয়া গুঁড়ির আড়ালে। হাতে উইনচেস্টার প্রস্তুত, সাইটে চোখ, লোকগুলোকে বিন্দুমাত্র বেচাল দেখলেই টান দেব ট্রিগারে।

তর্ক চলছে ওদের মাঝে। বিষয় অনুমেয়। অবশেষে ঘুরে পুবে চলে গেল, টুয়েন্টি-নাইন পামসের ঝরনার উদ্দেশে।

আমাদের পেল না বটে, যা ঘটল তাও কম বিপজ্জনক নয়। কাছেপিঠে ওই

একটাই পানির উৎস, ওদিকে আমাদের ক্যান্টিনে আর মোটে কয়েক ঢোক পানি আছে।

বালুতে শুয়ে থেকে ওদের গমনপথের দিকে চেয়ে রইলাম। টুয়েন্টি-নাইন পামসে পৌঁছে ওরা ধরে ফেলবে আমরা এখনও যাইনি ওখানে। সে-ক্ষেত্রে ওদের ওত পেতে থাকাই স্বাভাবিক – পানির জন্যে আমাদের ঝরনায় যেতেই হবে।

ছক সাজাতে অসুবিধে হবে না ওদের। ইতিমধ্যে নিশ্চয় জেনে গেছে কী পরিমাণ পানি আছে আমাদের সাথে, কতক্ষণ লাগছে সেটা খরচ হতে। এরপর দুয়ে দুয়ে যোগ করলেই বুঝে ফেলবে আমাদের পানি তলানিতে ঠেকেছে।

ওরা আমাদের প্রাণ হরণ করে চলে গেল, দেখলাম চেয়ে চেয়ে। সে যে কী মনের অবস্থা! একটা মেয়ের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে আমার ওপর। সামনে পথের কথা ভাবতেই শিউরে উঠলাম।

যা হওয়ার তা হয়েছে, তাই বলে মরুভূমির খরদহনে এভাবে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। শত্রুপক্ষ যখন আগে চলে গেছে, ধীরে-সুস্থে রওনা হব। ঢিপি থেকে গড়িয়ে নেমে ফিরে গেলাম বেটি ওয়ারেনের কাছে। আমার চেহারা দেখে বোধ করি পরিস্থিতি বুঝে থাকবে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। আমি সব কিছু জানালাম ওকে।

মেয়েদেরকে অনেকেই বিপদে জড়াতে দেয় না। এটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না আমার কাছে। ওদের বুদ্ধিমত্তায় আমার আস্থা গভীর, জীবনে বহু মেয়েকে সুষ্ঠুভাবে সমস্যার মোকাবেলা করতে দেখেছি। হঠাৎ যেন মাথায় আকাশ ভেঙে না পড়ে সে-জন্যে আগে থাকতেই হুঁশিয়ারি দেয়া উচিত। অনেক লোক নিজের স্ত্রীর কাছে সমস্যা গোপন করে, তারপর একদিন যখন সে আচমকা চোখ বোজে, অপার দুঃখকষ্ট আর দারিদ্র্যের মাঝে পড়তে হয় বেচারিকে। তাই বেটিকে বিপদের স্বরূপ স্পষ্ট খুলে বললাম।

বালুতে নকশা আঁকলাম একটা। 'এটা টুয়েন্টি-নাইন পামস, এরপর স্যান গরগনিও পাস – পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে চলে গেছে। ঠিক এইখানে লস এঞ্জেলেস।'

'আর কোনও ওঅটর হোল নেই? অন্যদিকে?'

'আছে হয়তো...খুঁজতে হবে।'

পলক তুলল বেটি। 'আমাদের চেষ্টা করা দরকার, তাই না?'

কত সহজ কথা। চেষ্টা, তা করতে হবে বৈকী, এবং সেই সঙ্গে ওই লোকগুলোর কথাও মনে রাখতে হবে। ওরা যখন টের পাবে আমরা পেছনে রয়েছি, পানির উৎস আগলে বসে থাকবে আমাদের প্রতীক্ষায়।

আগুন জেলে খানিকটা চোলা আর বিভার-টেইল ক্যাকটাস সেদ্ধ করলাম। তৃপ্তি সহকারে ঘোড়াগুলো খেলো। টেক্সাসের র‍্যাঞ্চাররা তাদের গবাদি পশুকে এ-সব খাওয়ায়। চোলা এবং ক্যাকটাস দুটোতেই প্রচুর পরিমাণে রস থাকায় এ-

ক্ষেত্রে ওদের পিপাসা, কিছুটা হলেও, মিটবে।

ছায়ায় বসে আছি আমরা, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ যখন তাড়া করছে না, দিনে আর বেরোব না। মরুভূমির রোদে চলতে হলে সঙ্গে পর্যাপ্ত পানি থাকা দরকার – আমাদের তা নেই।

আমরা নীরব, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক সচল।

একবার প্রেসকটে গল্পচ্ছলে পল ওয়েভার একদল মোজাভে ইন্ডিয়ানের কাহিনি শুনিয়েছিল। 'ক্যালিফোর্নিয়ার কয়েকটা বাথান থেকে ঘোড়া লুট করে ফেরার পথে সাইমুমের মুখে পড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ট্রেইল থেকে সরে যায় ওরা ওদের সঙ্গে একজন চেমেহুয়েভি ইন্ডিয়ান ছিল। সে-ই পথ দেখিয়ে ক্যানিয়নের ভেতর একটা গোপন ঝরনার কাছে নিয়ে যায় সবাইকে।

ওই জায়গায় জশুয়া বন এবং বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য বিক্ষিপ্ত পাথর ছিল। ওয়েভারের একটা বর্ণনা মনে আছে আমার। বিশাল আলুর মত একটা পাথর, আরেকটা ত্রিকোণ পাথরের ওপর বসানো।

আরও দুটো ওঅটর হোলের উল্লেখ করেছিল সে, তবে ওগুলোর হদিস আমি জানি না – একমাত্র সেই চেমেহুয়েভিই জানত। কাজে নামার মত তথ্য হাতে নেই বলে ভীষণ ভয় করছে।

দুবার টিপির মাথায় উঠে জরিপ করলাম দক্ষিণের এলাকা। একবারও উৎসাহিত বোধ করার মত দেখতে পেলাম না কিছু। মাইলের পর মাইল শুধু মরুভূমি: রিক্ত খরাদগ্ধ। মাঝে মাঝে ক্রেস্টোস আর বিক্ষিপ্ত ক্যাকটাস ও জশুয়া গাছ।

আবার যখন জিন চাপালাম ঘোড়ায়, সূর্য পাটে বসেছে। ওরাও যাত্রার জন্যে এক পায়ে খাড়া। বাঁচতে চাইলে চলতে হবে, এই উপলব্ধিটুকু ওদের আছে। সূর্য লাল অগ্নিগোলকের মত পশ্চিমের পর্বতমালায় এখনও ঝুলছে, গোধূলিরাগে আকাশে লালগোলাপি ছটা, তারই ফাঁক-ফোকরে ভেসে বেড়াচ্ছে শরতের সাদা সাদা মেঘ। বালুর টিপি পেরিয়ে দক্ষিণে, রিক্ত অজানা মরুভূমির পানে যাত্রা করলাম আমরা।

কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যেতারা ফুটল, দূর পাহাড়ের মাথায় জ্বলজ্বল করছে। ওটাকেই পথনির্দেশক হিসেবে বাছাই করলাম। ঘোড়ার নাক ঘুরিয়ে দিলাম ওইদিকে, বেটিকে দেখালাম ইঙ্গিতে।

'ওটা কোন পাহাড়?'

'ঠিক বলতে পারব না। বোধ হয় পিন্টো রেঞ্জ। এইদিকে ছোট ছোট বারোটা পর্বতমালা আছে...প্রথম দর্শনে সবগুলোকে একরকম দেখায়।'

'আমার জন্যে লাইফ রিস্ক নিচ্ছ তুমি।'

'কী জানি...'

রূপচর্চা মেয়েদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার – অন্তত কারও কারও কাছে। আড়চোখে লক্ষ করলাম এই দুঃসময়েও – যখন নাওয়া-খাওয়া নেই,

পানি নেই, পদে পদে বিপদ – বেটি ওয়ারেন চুল আঁচড়াতে ভোলেনি। বেশ ফিটফাট। ওর পাশাপাশি আমাকে কেমন লাগছে তাও আঁচ করতে পারছি – কিম্ভূতকিমাকার: ছিপছিপে লম্বা একটা মানুষ, কুঠারের মত মুখ, বাঁ-চোখের নীচে কাটা দাগ, এ-কদিনে দাড়িও গজিয়েছে প্রচুর। আমি সুন্দর এমন দাবি কেউই কখনও করেনি, তবে এখন নিশ্চয়ই বুড়ো মেরু ভালুকের মত দেখাচ্ছে। ঝাড়মোছের মধ্যে শুধু হ্যাট আর অস্ত্রশস্ত্রের ধুলো সাফ করছি যত্নের সাথে।

এখানে টিকে থাকতে একজন মানুষের মাত্র দুটো জিনিসের প্রয়োজন, বন্দুক ও ঘোড়া...না, আরও একটি জিনিস দরকার।

পানি।

বেটিও সেটাই ভাবছিল। আবার আমার পাশে এসে বলল, 'পানি পাব তো?'

'খোদার কৃপা হলে। মরুভূমিতে ক্যানিয়ন, বা কোনও পাহাড়ী ফাটলে, কিংবা কোনও কোনও বেসিনের নীচের দিকে পানি মেলে। তবে গাছপালা থাকতে হবে।

'অনেক সময় ছোটখাট টিলার ধারেও পাওয়া যায় – কিন্তু এর সম্ভাবনা কম। গাছ দেখেই মরুভূমিতে পানির সন্ধান পায় মানুষ। পানি ছাড়া বাঁচে না এ-রকম গাছ খুঁজতে হয়। পাম গাছের শেকড় নাকি পানিতে থাকে – মরুভূমির লোকেরা অন্তত তাই বলে। উইলো, কটনউড এগুলোও হদিস দেয়।

'তবে কেবল এর ওপর ভরসা করলেই চলে না। তাই পশু-পাখির ট্র্যাক লক্ষ্য করতে হয়। মৌমাছির জুড়ি নেই এতে। আমি দেখেছি মৌমাছি মানুষকে খুব দ্রুত পানির কাছে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওই যে বললাম – সব কপাল।'

আমার ধারণা, একশো বর্গমাইলের মধ্যে বড়জোর তিনটে কি চারটে জলাশয় আছে। হ্যাটের কানা কপালে টেনে দিয়ে দূরের পাহাড়গুলো জরিপ করলাম। পাহাড়ের এ-পাশে কিছু পাব বলে বিশ্বাস করতে বাধছে।

অন্ধকার ঠাণ্ডা নামিয়েছে বালুর দেশে। ওপরে নক্ষত্রমণ্ডল, নীচে আমরা – সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছি। বারবার হাঁ করে শীতল বাতাস টানছি আমি।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর আর একটা। তবু পর্বতমালা দূরে। খোলা মরুভূমিতে রয়েছি। যদি কোনও আশার আলো পাওয়া যায়, মোজাভে সম্পর্কে এ-পর্যন্ত যা কিছু শুনেছি মনে করার চেষ্টা করছি সে-সব।

তারার অবস্থান দেখে যখন বুঝলাম দুঘণ্টা পার হয়ে গেছে আমি রাশ টেনে নামলাম। বেটিকেও সাহায্য করলাম নামতে। বিধ্বস্ত অবস্থা ওর, নেমেই নেতিয়ে পড়ল বালুতে। জিন বদলানোর সময় কানে কানে ঘোড়াগুলোকে আশ্বাসবাণী শোনালাম দু-চারটে। ওদের জন্যে এটা মৃতসঞ্জীবনীর মত কাজ দেবে।

'কতটা এলাম?' বেটির প্রশ্ন।

'সরলরেখায় ধরলে বারো মাইলের মত। আমরা ঘুরে এসেছি, আরও বেশিই হবে।'

'পাহাড় আর কদ্দূর? বিশ্রাম নেবে না?'

'পানি পাই আগে।'

পাঁজাকোলা করে ওকে স্যাডলে বসিয়ে ফের যাত্রা। তবে এবার আমি হাঁটছি। মাইলদুয়েক হাঁটার পর যখন পা ধরে এল, মুদে আসছে চোখের পাতা, উঠে পড়লাম স্যাডলে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি, যখন আবার তাকালাম ঘোড়াগুলো থেমে গেছে, পুবাকাশে দিনের আভাস।

আমরা একটা গভীর বালিয়াড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। আশপাশে তাকাতে দেখলাম অবসাদে জিনের উপর নুয়ে পড়েছে কুহকিনী, গর্তে বসে গেছে চোখ-মুখ, স্রেফ মনের জোরে পতন বোধ করে আছে এখনও। আমার প্যাক হর্স উধাও। পেছন ফিরতে দূরে একটা ছোট্ট কালো অবয়ব চোখে পড়ল।

'ওখানে তোমার এমন কিছু আছে যেটা হারাতে চাও না?' জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ও, বুঝতে সময় নিচ্ছে কথা। তারপর পেছন ফিরল দেখার জন্যে, একটুবাদে মাথা নাড়ল।

'পরে হয়তো চলে আসবে,' বললাম আমি। 'এই ঘোড়াগুলোর বোঝা বেশি ভারি, অবশ্যি ওটার চেয়ে এগুলো ভাল জাতের।'

ওর দিকে তাকিয়ে যোগ করলাম, 'বলিহারি তোমার সাহস।'

জিভ সরল না ওর, ঠোঁট ফেটে ফুলে গেছে। চেহারার জৌলুস নিঃশেষিত। আমার দশাও তাই।

ডানে বাঁয়ে পথ খুঁজলাম। বালিয়াড়ির পাড় খাড়া, ঘোড়াগুলো একবার নামলে আর উঠবে এ ভরসা পাচ্ছি না। অবশেষে একটা রাস্তা চোখে পড়ল। অনেকটা ভাঙা পাড়ের মত দেখতে। ঘুরে ওইদিকে এগোলাম। ইতিমধ্যে ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। শরীরের যা অবস্থা, তাতে পানি ছাড়া সূর্যের কবলে পড়লে আর রেহাই নেই।

বালিয়াড়ি পার হলাম আমরা। অপরদিকে ওঠার সময়ে আমি নেমে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম। অদূরে একটা পাহাড়ী ফাটল। দ্রুত এগোলাম...শরীরের শেষ শক্তিটুকু ব্যয় করে।

সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা বাদে একটা চাতালে আশ্রয় নিলাম আমরা। মেয়েটার ঘোড়া মারা গেল। বেচারাকে এ-জন্যে আমি দোষ দিই না। প্যাক হর্সটা এসে পড়েছে ইতিমধ্যে।

পাথরের ছায়ায় আমাদের স্যাডল গিয়ার রেখে চারপাশে নজর বোলালাম। এমনকী একটা কাঁটাঝোপও নেই, অথচ এ-জায়গাতেই ওরা জন্মায়। অবলা জীবগুলোর মুখে দেওয়ার মত দেখতে পেলাম না কিছু। ক্রেস্টোস ছাড়া কিচ্ছু নেই – তাও অতি সামান্য।

ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত, আর এগোতে পারবে না। বড় স্ট্যালিয়ন আর আমার

নিজের আদি ঘোড়াটা হয়তো-বা কিছুক্ষণ টিকে থাকবে – কিন্তু তাতেও সংশয় আছে। যেভাবেই হোক, পানি খুঁজে বের করতে হবে।

বালুর ওপর মরার মত পড়ে আছে বেটি। ওকে পাশ কাটিয়ে ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক করলাম. কোনও উৎসাহব্যঞ্জক ট্র্যাক নজরে এল না। বিক্ষিপ্ত কিছু আছে, কিন্তু সেগুলো থেকে পানির পাত্তা মিলল না।

মরুভূমির অধিকাংশ প্রাণী, লতাগুল্ম বা জন্তু, পানি ছাড়া টিকে থাকতে পারে। খাবার থেকে যতটুকু জলীয় বাষ্প পায় তাতেই চলে যায় ওদের। কিন্তু পেলে প্রায় সবাই পানি খায়।

শেষ-পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম, ফিরে এসে পাথরে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। মাথা রাখলাম দুই হাঁটুর মাঝখানে। হঠাৎ নিশ্বাসের অভাব বোধ করায় তন্দ্রা ছুটে গেল। গলায় চড়া পড়ে গেছে. কষ্ট হচ্ছে ঢোক গিলতে। হাঁ করতে স্পষ্ট অনুভব করলাম ঠোঁট ফাটছে। জিভটাকে মনে হচ্ছে শুকনো কাঠির মত। আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে।

মেয়েটা ঘুমে বিভোর, অথবা চেতনা হারিয়েছে। দেখার চেষ্টা করলাম না। মাটিতে টানটান পড়ে আছে একটা ঘোড়া, অন্যগুলো ধুঁকছে, মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে আমার মুখ, চোখ ফেরাতে গিয়ে মনে হলো কোটর থেকে বুঝি-বা বেরিয়ে যাবে।

একটা পাথরে ভর দিয়ে সোজা হলাম। শেষ একটা চেষ্টা করতে হবে। বরাবরের মত ক্যান্টিনটা ঝুলিয়ে নিলাম গলায়, যেন খোয়া না যায়।

আমরা সাদা পাথরচাঁইয়ের গোড়ায় আশ্রয় নিয়েছি, প্রায় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। এ-রকম আরও চাঁই রয়েছে আশপাশে। ক্লান্ত, তবু এলাকার ছবিটা গেঁথে নিলাম মনের পর্দায়...নইলে ইহজীবনে আর হয়তো ফেরা হবে না। অবশ্যি এটাও ঠিক, পানি না পেলে কিছু ইতরভেদ হবে না তাতে।

'আমি পানি খুঁজে বের করবই,' বললাম চেঁচিয়ে।

আমার কথা যদি ও শুনেও থাকে, কোনও ভাবান্তর ফুটে উঠল না চেহারায়, চুপচাপ পড়ে রইল বালুর ওপর। আমি ঘুরে হাঁটতে শুরু করলাম।

খই-ফোটা বালুতে সূর্যকিরণ ঠিকরে ঝলসে দিচ্ছে চোখ-মুখ, আড়াল পাওয়ার জো নেই। মাত্র কয়েক পা গিয়েই টলতে শুরু করলাম। একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম একটা পাথরের ওপর। আবার রওনা হওয়ার আগে ওখানে জিরিয়ে নিলাম কিছুক্ষণ।

আমার দৃষ্টি বালুর ওপর নিবদ্ধ, ট্র্যাক খুঁজছি। হঠাৎ মাথায় একটা সতর্কঘণ্টি বেজে উঠল – পরমুহূর্তে থেমে গেল বাজনা। চোখ জ্বালা করছে, বারদুয়েক পলক ফেলে ঘাড় ফেরালাম। অদূরে পাথরের মাথায় একজন লোক দাঁড়িয়ে।

আমার চোখ স্থির হলো ওর ওপর, রাইফেল তুলল লোকটা, ব্যারেলে রোদের প্রতিফলন, গুলি করল। অভ্যেসবশত পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালাম,

কিন্তু দুর্বল শরীরে আচমকা নড়াচড়া সইল না, পড়ে গেলাম। শুধু এইটুকু মনে আছে আমার...তারপর অনেকক্ষণ কেবল জমাট অন্ধকার।

পাঁচ

শীত...ভীষণ শীত করছে।

কম্পিত হাতে বালুতে গর্ত খুঁড়ে ঢুকে যেতে চাইলাম, তাতেও শরীর গরম হলো না। আমার চোখ খোলা, ঢোক গিলতে চেষ্টা করলাম। ক্ষতবিক্ষত গলা, ঘষা খেয়ে' ঝিল্লিগুলো জ্বালা করে উঠল।

দুহাতের তালুতে ভর দিয়ে উঠে বসলাম অতিকষ্টে। রাত নেমেছে, ঠাণ্ডা, ঘুটঘুটে অন্ধকার, একটাও তারা নেই, হিম বাতাস...তবে আমি বেঁচে আছি।

বেঁচে...

হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম।

সহসা অনতিদূরে কোথাও একটা কয়োট ভৌতিক সুরে ডেকে উঠল, থেমে গেলাম।

ফের যখন রওনা হলাম আমার কাছেই নড়ে উঠল একটা কিছু, খুট করে শব্দ হলো পাথরে।

ওই শব্দ আমার চেনা। খুরের...তবে ঘোড়ার নয়।

আপ্রাণ চেষ্টায় শক্ত ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালাম ওপর দিকে, আকাশের পটভূমিতে একটা কালো অবয়ব দেখলাম এক ঝলক। বিশাল শিঙওয়ালা একটা ভেড়া।

মৌমাছি ভোঁ-ভোঁ করছে মাথার ভেতর। ডালপালাময় শিঙদুটোকে মনে হলো কোনও প্রাচীন বটের ঝুরি। পরমুহূর্তে দেখলাম গল্পের দুটো ড্রাগন...আগুন ছড়াচ্ছে...দুধসাদা হরিণ, উঠে আসছে ঝরনা থেকে...হরিণ – ঝরনা – ঝরনা – পানি...এগোনোর প্রয়াস পেলাম...পানি ডাকছে আয় আয়...একচুল নড়ল না শরীর, বরফের মত জমে গেছে।

আবার যখন চোখ খুললাম রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। আমার মনে আতঙ্ক – মৃত্যুভয়, এভাবে বেঘোরে পানির কষ্টে মারা যাব। ভেড়ার কথা স্মরণ হলো। টেনে-হেঁচড়ে রওনা হলাম, ঝাপসা চোখে ট্র্যাকের সন্ধানে তাকালাম আশপাশে। কোথায় ট্র্যাক, কঠিন পাথরের ওপর দিয়ে ক্রল করছি আমি, একটা খুরের চিহ্নও নেই!

হঠাৎ কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল কী যেন।

বুলেট? বহুক্ষণ জেগে রইল শব্দটা।

আবার এগোব, থমকে গেলাম। ঝিঁঝি পোকার ডাকের মত কানে আসছে

কিছু। ওই আওয়াজ আমার পরিচিত। কোলাব্যাঙের ডাক।

নিমেষে আর একটা চিন্তা উদয় হলো। ওই ব্যাঙের প্রাণ ক্যানিয়ন বা ধারেকাছে কোনও স্থায়ী ঝরনায় রয়েছে।

পানি! কাছেই!

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম যেন ছুরির খোঁচা লেগেছে। খ্যাপার মত তাকালাম চারদিকে, চোখে পড়ল না কিছু।

তারপর ফের সে-ই আওয়াজ...মৌমাছির গুঞ্জন। ধাওয়া করলাম শব্দটাকে, তিন কদম গিয়েই টের পেলাম মিলিয়ে গেছে।

পাথরের অরণ্যে টলতে টলতে অবশেষে, সহসা, দেখা পেলাম ওটার – সাদা গ্রানিটের মাঝখানে একটা ক্ষুদ্র বেসিন; কানায় কানায় ভর্তি, টলটলে।

বুকে হেঁটে বেসিনের কাছে গিয়ে পানির ঝাপটা দিলাম মুখে। তারপর এক আঁজলা পানি গালে পুরে ধরে রইলাম একটুক্ষণ, স্বাদু শীতলতায় জুড়িয়ে যাচ্ছে প্রাণ। এবং তারপর শুরু হলো ব্যথা, চুইয়ে খানিকটা পানি গলার ভেতর চলে গেছে।

অনেক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পান করলাম ওই এক ঢোক পানি, এবং তারপর আরেক ঢোক।

পাথরের ওপর অনল বর্ষণ করছে সূর্য, ঝরনার ধারে ছায়ায় সরে গেলাম। হাত-পা ছড়ানোর জায়গা আছে, উপুড় হয়ে একটু একটু করে খেতে লাগলাম পানি।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ফের সচল হলো আমার মাথা।

মেয়েটা ওখানে পড়ে আছে...বেটি। ও এবং ঘোড়াগুলো...

একটা লোক গুলি করেছিল আমাকে। নাকি দুঃস্বপ্ন?

উঠে বসলাম দুর্বলভাবে। ক্যান্টিন ভরে নিলাম। ফিরে যাব।

ফিরতে হবে আমাকে – জানতে হবে সব কিছু।

আমার পুরোনো ট্র্যাকগুলো পথ দেখাল। রাইফেলধারীকে গুলি ছুঁড়তে গিয়ে যেখানে পড়ে গিয়েছিলাম সে-জায়গাটা খুঁজে পেলাম সামান্য দূরে একজন লোক দাঁড়াতে পারে এ-রকম একটা পাথর আছে। তবে আমি যেখানে পড়ে গিয়েছিলাম, সেখানে আমার নিজের ছাড়া আর কারও ছাপ নেই।

খুব সাবধানে পাথরের ভিড়ে ঘাপটি মেরে চাতালের উদ্দেশে এগিয়ে গেলাম...

নেই...

বেটি নেই। আমার ঘোড়া, মালপত্র, সোনা সব উধাও।

চার-পাঁচজন অশ্বারোহী, পশ্চিমদিক থেকে এসেছিল বেটি, আমার ঘোড়া, রাইফেল সব নিয়ে গেছে – বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে।

নিশ্চয়ই ভেবেছে আমি মারা গেছি সামনে তৃষিত মরু, কয়েক ক্রোশের

ভেতর লোকালয় নেই। আমি একা – অসহায়।

পাথরছায়ায় দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলাম জীবনে এমন কঠিন সমস্যায় কখনও পড়িনি। আমার কাছে পানির ক্যান্টিন, একটা পিস্তল আর গুলির বেল্ট আছে। কিন্তু কোনও ঘোড়া, খাবার, বা কম্বল নেই। নিকটতম জনবসতি, আমার জানামতে, মরমন টাউন স্যান বার্ন্যারডিনো। পশ্চিমে, এখান থেকে একশো মাইল দূরে।

আপাতত আমার ক্যান্টিন ভরা, একটু আগেই পানি খেয়েছি। যে-দীঘিটা আবিষ্কার করেছি সেটা আধ-মাইল পেছনে। এখন যদি ওখানে গিয়ে রাত্রি কাটাই, অকারণে এক মাইল হাঁটা হবে।

বাবা আমাদের মন স্থির করতে শিখিয়েছেন। সর্বদা বলতেন, একবার স্থির হয়ে গেলে আমরা যেন অযথা সময় নষ্ট না করে সিদ্ধান্ত মোতাবেক চলি। তাই এক পা-দুই পা করে পশ্চিমে হাঁটা দিলাম।

তবে যেহেতু এই বেলা দ্বিপ্রহরে বেশি দূর যাব না, একটা পাথুরে দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। রাগে রিরি করছে শরীর, নিজের ওপর।

এর আগে পর্যন্ত আমি মোটামুটি শান্তই ছিলাম। কারণ আমরা, ওসমানরা, সহজে ক্রুদ্ধ হই না, কিন্তু একবার চটলে রক্ষা থাকে না কারও।

বাবা আরেকটা কথা বলতেন, ক্রোধ আসলে ধ্বংস করে মানুষকে: যে রাগে তাকে হত্যা করে, কুরে কুরে দুর্বল করে দেয়।

কৃষ্ণ-নয়না যখন হার্ডিভিলে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, আমি বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম। তবে সেটা নারীঘটিত ব্যাপার, এ-ধরনের কিছু নয়। ও এখন শত্রুপক্ষের খপ্পরে। আমাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছে ওরা, আমার আউটফিট, সোনা লুট করেছে।

ক্রুদ্ধ হওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। মহীরূহে পরিণত হয়েছে আমার রাগ, অথচ আমি ভয়ঙ্কর শান্ত – প্রতিজ্ঞা করলাম এর শোধ আমি নেবই।

লস এঞ্জেলেসে গেছে ওরা, তাতে কী! যেখানেই যাক, খুঁজে বের করব।

কার কাছে যেন শুনেছিলাম পায়ে-পায়ে যাত্রার শুরু। আমি এক কদম বাড়িয়েছি। যাত্রাশেষে যখন থামব, অনেক রক্তের দাগ লাগবে চাঁদের বুকে।

সূর্যাস্তের পর পশ্চিমে রওনা হলাম। ক্যান্টিন খালি হওয়ার আগেই পানি চাই। এর ওপর আমার জীবন নির্ভর করছে। এতক্ষণে ওরা হয়তো পামস ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু ওটা উত্তরে – আমার যাত্রাপথের বাইরে। আমার লক্ষ্য পশ্চিম, আশাও পশ্চিমেই।

পায়ে-চলা একজন মানুষ ঘোড়াকে হার মানাতে পারে। অতীতে বহুবার ঘটেছে এমনটা। আমার অবশ্যি তেমন ইচ্ছে নেই, তবে পানি ও খাবার পেলে খুব একটা পিছিয়েও থাকব না।

খাবার...

ইতিমধ্যে খিদেয় পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে। নির্ঘাত উদর ভাবছে আমার খাদ্যনালী কাটা, তাই আহার আসছে না। তবু, এগিয়ে চললাম অবিরাম।

আমরা পাহাড়িয়া – হাঁটতে জানি। পাহাড়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে হেঁটেই গন্তব্যে পৌঁছুনো যায় দ্রুত, কারণ প্রায়শঃ এমন জায়গা পড়ে যেখানে ঘোড়ার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।

পশ্চিমের পাহাড়গুলো প্রায় হাজার ফুট উঁচু। আমি এর চাইতে উঁচু পর্বত অতিক্রম করেছি। যাওয়ার রাস্তা না থাকলে টপকাব।

সোজা পশ্চিমে হাঁটছি, প্রতি ঘণ্টায় বিশ্রাম নিচ্ছি মিনিটখানেক, তারপর ফের চলা। বারদুয়েক খাড়া চড়াইয়ের কারণে দেরি হয়ে গেল, তবে চাঁদ ওঠার পরপরই পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের কাছাকাছি। সঙ্কীর্ণ ট্রেইল চোখে পড়ল একটা, ভেড়া চলাচল করে। বালু আর পাথরের মাঝে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; এ-রকম ট্রেইলে অনেক যাতায়াত করেছি বলে চিনতে অসুবিধে হলো না।

এইসব ট্রেইল সচরাচর খুব সরু হয়, চার থেকে আট ইঞ্চি চওড়া। দূর থেকে চিনতে সুবিধে হয় বেশি। অর্থাৎ, চুড়ো বা খাঁজের মাথা থেকে চট করে চোখে পড়ে; কিন্তু নিয়মিত ব্যবহৃত না হলে কাছ থেকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে অভ্যস্ত লোকের চোখ আপনাআপনি চলে যায় ওইদিকে।

দক্ষিণমুখী ট্রেইল; মাইলটাক যাওয়ার পর আর একটা ট্রেইল পেলাম, পশ্চিমে পর্বতমালার ভেতরে ঢুকে গেছে। ওই ট্রেইল ধরে বেশ কিছুটা গিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় দেখা পেলাম একটা ঝরনার। এটা মূল পর্বতের একটা শাখা, উপত্যকার দিকে প্রসারিত। ঝরনার পাড়ে দুটো সাদা শিলাখণ্ড পড়ে আছে, ফলে অন্ধকারেও দিব্যি চেনা যাচ্ছে।

পুরু নরম বেলাভূমি, বাতাসে উড়ে এসে জমা হয়েছে। পেট পুরে পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে ঝরনার পানি খেলাম প্রথমে, তারপর ক্যান্টিন পূর্ণ করে হাঁটা দিলাম ফের। সূর্য ওঠেনি, যদিও পুব দিগন্তে প্রথম রশ্মি দেখা দিয়েছে।

খেতে হলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খাবারের সন্ধান করতে হবে। কিংবা কোনও ঝরনার ধারে রাতে ফাঁদ পাতলে হয়তো কিছু পাব। ভেড়া হলেই সবচেয়ে ভাল, তবে আর একটা দিন যদি অনাহারে কাটে – নেকড়ে, শেয়াল যা পাব তাই হজম করে ফেলব।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, হঠাৎ ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়ল।

কমপক্ষে পঞ্চাশটা, বেশিও হতে পারে। বুনো নয়, পোষা ঘোড়ার পাল। খুব সম্ভব দুজন লোক নিয়ে যাচ্ছে পালটা।

সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম, জরিপ করব। কোনও ভদ্রসন্তান এই অঞ্চলে ঘোড়ার পাল নিয়ে আসবে না। কয়েক ক্রোশের ভেতর র‍্যাঞ্চ নেই। এই এলাকার মাঝ দিয়ে পাল নেওয়ার মত কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। নিয়মিত লোক চলাচল করে এবং পানি আছে এ-রকম ট্রেইলগুলোই

সাধারণত এ-কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরক্ষণে মনে পড়ল ওল্ড বিল উইলিয়মস এবং জো ওয়াকার আমাকে কী বলেছিল একবার। অ্যারিযোনার কিছু তস্কর ক্যালিফোর্নিয়াতে ঘোড়া চুরি করে, মরুভূমি পেরিয়ে অ্যারিযোনা কিংবা আশপাশের কোথাও নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। বোধ হয় এখনও সেই ধারা চালু রয়েছে।

ঘোড়া মানেই-পানি; চালক দুজন নিশ্চয়ই তাদের চেনাজানা কোনও গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে পালটাকে।

গোপন ডেরাই হবে সেটা। এর অর্থ খাবার। চাই কি ঘোড়াও পেয়ে যেতে পারি একটা।

বড় বড় পাথরচাঁইয়ের মাঝখানে বসে সমস্যাটা খতিয়ে ভাবলাম। ওই লোকগুলো যদি চোর হয়ে থাকে আমার আগমনকে সুনজরে দেখবে না, প্রথম চোটেই হয়তো গুলি করবে। কিন্তু ওদের কাছে খাবার আছে, ঘোড়া আছে – এই দুটোই আমার প্রয়োজন

প্রায় আধ-ঘণ্টার মত ওখানে বসে আশপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করলাম। অসংখ্য বোল্ডার, পাথরের স্তূপ, আর ক্যাকটাস জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। একজীবনে একজায়গায় একসাথে সচরাচর এমনটা দেখা যায় না।

তারপর সহসা সেই গুপ্ত উপত্যকার কথা মনে পড়ল – যেখানে বিশাল আলুর মত একটা পাথর আছে। দু-তিনশো গজ দূরে ওইরকম একটা পাথর দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু এ-রকম পাথরের অরণ্যে উপত্যকার প্রবেশপথ খুঁজে পাওয়া অসম্ভবকে সম্ভব করার শামিল। বছর লেগে যেতে পারে। তবু চেষ্টা করতে হবে।

এখন আমার অবস্থা বানের জলে-ভাসা পিঁপড়ের মত, খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরব। ক্ষুধার্ত, ভয়ঙ্কর ক্লান্ত – কতগুলো লোক পথে বসিয়ে গেছে আমাকে সর্বস্ব অপহরণ করে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে গেছে। গায়ের চামড়া দিয়ে ওদেরকে এর মাশুল গুনতে হবে।

তাই ওই ট্র্যাকগুলো অনুসরণ করতে উদ্যত হলাম।

'কিছু খুঁজছ?'

আচমকা একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। জায়গায় জমে গেলাম, পলক তুলতেই দেখলাম একটা লোক দাঁড়িয়ে, হাতের উইনচেস্টার আমার বেল্ট বাকলের দিকে তাক করা। কঠিন চেহারা মাথায় চ্যাপ্টা ব্রিমের হ্যাট। প্যান্টের দুপাশে ধূলিধূসরিত চামড়ার পট্টি বা চ্যাপস।

'ঠিক ধরেছ,' বিরক্তির সুরে বললাম। 'খাবার আর একটা ঘোড়া খুঁজছি আমি।'

সশব্দে হাসল লোকটা। 'কেন, হেঁটে এসেছ বুঝি এতদূর?' ওর কপালে ভাঁজ পড়ল।

'না,' বললাম আমি, 'ফেলে রেখে গেছে। এখন একটা ঘোড়া পেলেই লস এঞ্জেলেস গিয়ে ধরব ওকে।'

'লস এঞ্জেলেসে থাকো?'

'অ্যারিযোনায়। যাচ্ছিলাম মাল কিনতে, হার্ডিভিলে এসে ওই মেয়েটার পাল্লায় পড়েছি।'

রাইফেল নামাল সে। 'তোমাকে দেখে আইনের লোক বলে মনে হচ্ছে না,' বলল। 'এসো, খাবে।'

একরাশ পাথরচাঁইয়ের কাছে গিয়ে আবার মুখ খুলল, 'হামা দিতে হবে।' তর্জনীর সাহায্যে একটা ফোকর দেখাল, ওপর থেকে পরস্পরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে দুটো পাথর, নীচ দিয়ে কোনওমতে একজন লোক ঢুকতে পারে। বসে পড়লাম আমি, বুকে হেঁটে ঢুকলাম ফাটলের ভেতর। আবার যখন সোজা হলাম, আমি হিডেন ভ্যালিতে দাঁড়িয়ে।

একনজরে মনে হলো আধ-মাইলের মত লম্বা। দুদিকে পাথরের দেয়াল, বেশির ভাগই চাঁইয়ের স্তূপ। চওড়ায় মাত্র কয়েকশো গজ। উপত্যকার মাঝখানে ষাট-সত্তরটা ঘোড়া চরছে।

দেয়াল ঘেঁষে একটা ঝরনা, ছোট ছোট কয়েকটা গুহা। অসংখ্য মৌমাছি উড়ছে। রাইফেলধারীর সঙ্গে ঝরনার ধারে গেলাম। আগুন জ্বলছে। চারজন লোক দেয়ালে হেলান দিয়ে গল্প করছিল, আমরা যেতে বসে পড়ল।

'এই চিড়িয়াটা আবার কে, উইলি?' প্রশ্নকর্তার সামনের পাটির কয়েকটা দাঁত নেই। ঢ্যাঙা।

'দাঁড়াও, খেয়ে নিই আগে – তারপর দেখাব, কে চিড়িয়া,' একগাল হেসে বললাম।

ওরা জানতে চাইল ব্যাপারটা, আমিও খুলে বললাম সব কিছু। ধৈর্যের সাথে শুনল ওরা। আমার উদ্দেশে-ছোঁড়া শেষ গুলিটার কথা চেপে গেলাম শুধু। কারণ ওরা যদি অনুভব করে আমাকে চক্রান্ত করে মরুভূমিতে ফেলে যাওয়া হয়েছে, যাতে হাঁটতে বাধ্য হই, তা হলেই বরং ওদের সহানুভূতি বেশি করে পাব।

উইলি হাতের রাইফেলটা মাটিতে রেখে একটা মগে কফি ঢালল। 'এটা দিয়েই শুরু করো। আমরা যদি তোমাকে মেরেও ফেলি, অন্তত ভরা পেটে মরতে পারবে।'

'তোমাকে এভাবে হাঁটানোর অধিকার নেই ওদের,' ভ্রূকুটি করল ঢ্যাঙা।

যা ভেবেছি, কতগুলো চোরের হাতে পড়েছি আমি। তবে মানুষ হিসেবে খারাপ নয়। তা ছাড়া মরুভূমিতে কেউই হাঁটতে পছন্দ করে না।

গোগ্রাসে কয়েক থালা মটরশুঁটি, মধু-লাগানো রুটি আর প্রায় দুই পাউন্ড বেকন খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললাম একটা।

'চার্লি, ওকে বরং একটা ঘোড়া দিয়ে দাও,' বলল উইলি। 'ওর খাওয়ার যা বহর তাতে আমরা ফতুর হয়ে যাব।'

একটা সিগারেট বানাল চার্লি, তারপর ধরিয়ে বলল, 'লোকগুলোকে আবার দেখলে চিনবে?'

শেষ হয়ে গিয়েছিল কফি, হাত বাড়িয়ে চুলো থেকে আরেক মগ ঢেলে নিয়ে বর্ণনা দিলাম চেহারার। কিছুক্ষণ গুম মেরে রইল চার্লি, তারপর উইলিকে বলল, 'তোমার বন্ধুটি মনে হচ্ছে আচ্ছা বিপদেই পড়েছে। আমাদের জড়ানো ঠিক হবে না – দিয়ে দাও ঘোড়া।'

বাটন পরিবারের দুই ছেলে – উইলি আর চার্লি। পশ্চিমের অপরাধ জগতে প্রায় সকলেই ওদের চেনে। হিডেন ভ্যালিকে ওরা ব্যবহার করছে চোরাই মালের ঘাঁটি হিসেবে। একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকল না, এখানে ওরা ঘোড়া আনে কীভাবে।' আমার বিশ্বাস, পেগ-লেগ স্মিথের কাছে এই জায়গার কথা শুনে থাকবে ওরা। স্মিথ তার জীবনে বেশিটাই ব্যয় করেছিল ঘোড়া চুরিতে।

'ঘোড়া ঢোকালে কেমন করে?' জিজ্ঞেস করলাম।

জবাব পেলাম না।

'তুমি রাতে বেরোতে চাও, না,' বলল উইলি। 'ঠিক আছে আরাম করো – রাতে পাবে একটা ঘোড়া।'

'থ্যাংক্স।'

ওরা আমাকে একবারও অনুরোধ করল না গোপন আড্ডার কথা যেন কাউকে না বলি, অবশ্যি তার প্রয়োজন ছিল না – এমনিতেও আমি বলতাম না। আগের সেই ফোকর দিয়েই আমাকে বাইরে নিয়ে গেল উইলি। দেখলাম, চার্লিসহ দলের আর সবাই রয়েছে। চার্লির হাতে লাগাম, শেষ-প্রান্তে একটা চমৎকার সোরেল বাঁধা।

'তোমার ঘোড়া,' বলল চার্লি। 'এটা নিয়ে কেটে পড়.'

জানি, তবু জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'মালিকানা? পরে কেউ আবার ধরবে না তো?'

চার্লি হাসল। 'পশ্চিমে গেলে কিছু হবে না, কিন্তু অ্যারিযোনায়...'

চোরাই মাল, কিন্তু ভাল জিনিস। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল। আপাতত আমি নিশ্চিন্ত, প্রচুর খাবারও দিয়েছে ওরা।

ছয়

হোটেলের নাম হ্যাভেন্স ইন। মালিক মি. গ্যাব্রিয়েল অ্যালেন। পকেটে অল্প কিছু স্বর্ণমুদ্রা ছিল, হোটেল ভাড়া পরিশোধ করে স্নান করলাম এবং দাড়ি কামানোর খুর কিনলাম একটা।

ভাগ্যিস পকেট হাতড়ায়নি। নতুন এক প্রস্থ কাপড় কিনলাম বারো ডলার

দিয়ে। লস এঞ্জেলেস থেকে তেরো-চোদ্দ মাইল দূরে একটা কাউ টাউনে আছি আমি। তাসত্ত্বেও জিনিসপত্রের দাম এখানে আগুন। প্রেসকটে এই সুটের দাম পড়ত দশ ডলার। আরও দেড় ডলার খরচা করলাম একটা সাদা শার্টের পেছনে। দোকানি বলল একসাথে তিনটে শার্ট কিনলে বোনাস হিসেবে একটা নেকটাই পাওয়া যাবে। তাই করলাম।

মোড়ের কালিওয়ালা একটা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে আমার বুট পালিশ করে দিল। তারপর ধোপদুরস্ত হয়ে যাত্রা করলাম লস এঞ্জেলেসের পানে। এই পোশাকে আমি স্যান পেদ্রো বা মেইন স্ট্রীটের যে-কোনও অভিজাত বাড়িতে যেতে পারব।

শহরে পৌঁছে পিকো হাউসে উঠলাম। এত বড় আর সুন্দর দালান আগে কখনও দেখিনি। ১৮৭০ সালে এই হোটেলের উদ্বোধন হয়েছে। পুরো তিনটে তলাই নীল মার্বেল পাথরের তৈরি। মেইন স্ট্রীট এবং প্লাযার মোড়ে অবস্থিত।

আমাকে যে-কামরাটা ওরা বরাদ্দ করল সেটা আয়তনে প্রায় আমাদের পাহাড়ী কেবিনের সমান। কাপড় ঝেড়ে চুল আঁচড়ে পিস্তল পরখ করলাম। আমার চারটে ঘোড়া, ত্রিশ পাউন্ড সোনা এবং দুটো চমৎকার স্যাডল লুট করে নিয়ে গেছে কয়েকজন লোক। আমি ওগুলো উদ্ধার করব।

কৃষ্ণ-নয়না কুহকিনীর ব্যাপারে তেমন দুশ্চিন্তা নেই। মরুভূমিতে চলাকালে টের পেয়েছি নিজেকে ও রক্ষা করতে জানে। তা ছাড়া এখন ওরও নিশ্চয় বিশ্বাস, মোজাভেতে মরে পড়ে আছি আমি।

তবু আমার কর্তব্য ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েছে কি না সেটা দেখা। সেই অবসরে আমার মালপত্র উদ্ধার করতে পারব।

আমার দেখায় এটাই বৃহত্তম শহর। প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। আরও অনেক বড় বড় শহরের গল্প শুনেছি আমি...নিউ অরলিন্স তার মধ্যে একটা। তবে সে-সব বহুকাল আগের কথা, এবং এখান থেকে বহুদূরে।

আমার ধারণা নির্ভুল বলে প্রমাণিত হলো: কৃষ্ণ-নয়নাকে লুকিয়ে রাখার মত বড় শহর আজও গড়ে ওঠেনি।

পিকো হাউসের সিঁড়ি বেয়ে যে-মানুষটিকে প্রথম নেমে আসতে দেখলাম, সে বেটি ওয়ারেন।

ঘরের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে ও, শহুরে কেতাদুরস্ত বেশভূষার দুজন লোকের সাথে আলাপ করছে। ওদের মধ্যে একজন যুবক, দীর্ঘদেহী সুদর্শন চেহারা। তবে আমার ঠিক মনঃপূত হলো না ওকে। লস এঞ্জেলেসকে আমি ভদ্রলোকের শহর বলেই জানি – অথচ ওর কোট ডান কোমরের কাছে বেঢপভাবে ফুলে আছে। দ্বিতীয়জনের বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। বেঁটে, চওড়া কাঁধ।

ওদের কাছে গিয়ে বললাম, 'যাক, তা হলে ভালভাবেই পৌঁছেছ, বেটি।'

পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল ও, এক মুহূর্ত সেভাবে রইল। তারপর ঘুরে

আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'দুঃখিত – আমাকে বলছ?'

ওর সঙ্গী দুজন এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেন আমি পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়েছি। দীর্ঘদেহী যুবক মুখ খুলতে নিল, কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'ফিরে এসে তোমাকে না পেয়ে ভাবনায় পড়েছিলাম।'

'তুমি বোধ হয় ভুল করছ,' শীতল গলায় বলল ও। 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হলাম। 'কেন, মোজাভেতে, আমি–'

নাক গলাল যুবক। 'ভদ্রমহিলা কী বললেন শুনেছ – উনি তোমাকে চেনেন না।'

ও পেছন ফিরে বেটির হাত ধরল, আমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেল ওখান থেকে।

ওরা এভাবে চলে যাওয়ায় নিজেকে আমার গেঁয়ো বোকার মত মনে হলো। চারপাশে এক ঝলক তাকাতে দেখলাম সবার চোখ এইদিকে, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল। কোথায় ওর নিরাপত্তার জন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিলাম, আর ও কিনা আমাকে চিনলই না!

যতই ভাবছি ব্যাপারটা ততই বিরক্ত রোধ করছি। তারপর মনে পড়ল ওর দেখা পেলেও, আমার জিনিস ফিরে পাইনি। পিছু নেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওরা চলে গেছে, বেমালুম গায়েব।

হোটেল চত্বর থেকে একটা কালো শকট বেরিয়ে যাচ্ছে, সম্ভবত ওতেই উঠে পড়েছে।

যাকগে, কিন্তু সোনা উদ্ধার করবই।

লস এঞ্জেলেসে তখন একশো দশটা স্যালুন ছিল। তবে আমাকে বুফামসে যাবার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। শহরের সেরা স্যালুন, খবর সংগ্রহের জন্যে আদর্শতম স্থান। বুফামস্...ওখানেই যাব।

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে পা রাখলাম বাইরে। চকিতে একজন লোক উদয় হলো পাশে। ছিপছিপে এক তরুণ। গায়ের রঙ শ্যামলা। চেহারায় মেক্সিক্যান ছাপ, ক্যালিফোর্নিয়ানও হতে পারে।

'সিনর, মনে হচ্ছে আমাদের দুজনের স্বার্থই এক,' মৃদু সুরে বলল সে।

'বলে যাও।'

'বাজারে গুজব ছিল ওই সিনোরিটা অসুস্থ, তাই বাইরে আসছে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস কথাটা সত্যি নয় – আসলে পালিয়ে গিয়েছিল লস এঞ্জেলেস থেকে, আবার ধরে আনা হয়েছে।'

'মিস্টার,' বলে লোকটার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালাম, 'সেটা ওই মহিলার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'তাই? হবেও বা। সিনর বেশ সাহসী, তবে মাথা গরম। ওই মেয়েকে বিশ্বাস কোরো না, সিনর, ওর সাথের লোকগুলোকেও নয়। ওরা ডেঞ্জারাস।

আমার জন্যে তো বটেই, তোমার জন্যেও। তোমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে।'

মেয়েদের প্রতি কটাক্ষ আমি সইতে পারি না। কিন্তু আমার কাছেও তো ওকে ডাইনী বলেই মনে হয়েছে!

'চলো, বুফামসে বসে তোমার কথা শুনব,' বললাম। 'আমার লোককেও বোধ হয় পেয়ে যাব ওখানে।'

'একশো দশটা স্যালুন এখানে। বুফামস্‌ই সেরা – কিন্তু ওখানেই পাবে তার কোনও মানে নেই।'

যুক্তি আছে ওর কথায়...তবু, জায়গাটার নাম-ডাক যখন শুনেছি, ওখান থেকেই শুরু করতে দোষ কী? তা ছাড়া কিছু ভাবনাচিন্তাও আছে। লোকটা হয়তো কোনও নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, এই শহরটা ও চেনে।

ও খাঁটি কথা বলেছে: কৃষ্ণ-নয়নাকে বিশ্বাস করা চলে না। কিন্তু ও পালাচ্ছিল...কার ভয়ে?

একটু চিন্তা করতেই মনে পড়ল, ঘোড়া কেনার সময়ে হার্ডি কী বলেছিল। আমার নাম ওসমান এটা বেটিকে জানাতে ও বারণ করেছিল। কেন? আমার নামের সাথে এর কী সম্পর্ক?

বুফামসে কোণের একটা টেবিল দখল করলাম আমরা। বিয়রের অর্ডার দিয়ে নজর বোলালাম চারদিকে। নানা ধরনের খদ্দের – স্প্যানিশ, ফ্রন্টিয়ার্সমেন, ব্যবসায়ী, কৃষক।

'আমার জন্ম এখানে,' আচমকা নীরবতা ভাঙল নতুন বন্ধু। 'নাম বেনডিগো পেদ্রো। জন্মভূমিকে ভালবাসি, কিন্তু খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে – আমরা একঘরে হয়ে পড়ছি।'

ওর কথা শুনছি, কিন্তু আমার চোখ ঘুরছে। একটা পরিচিত চেহারা দেখতে পেলাম। মনে হলো সে-রাতে হার্ডিভিলে এও ছিল। বারে দাঁড়িয়ে আরেকজনের সাথে গল্প করছে। তবে সামনে আরও লোক থাকায় দেখতে পাচ্ছি না দ্বিতীয়জনকে।

'আমরা খরচে মানুষ,' বলছিল আমার সঙ্গী, 'ক্যালিফোর্নিয়ার জীবনযাত্রাও ছিল সহজ। টাকার কথা ভাবতে হত না কাউকে, প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত। আমরা তাই ইয়াংকিদের সাথে ব্যবসায়ে টিকতে পারলাম না। ইয়াংকিদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এ-রকম পরিবারগুলোর ভাগ্য ভাল। তাও সবক্ষেত্রে নয় – যেমন আমার নিজের।'

কেউ কিছু বললে তার প্রতি যে সাধারণ সৌজন্যটুকু দেখাতে হয়, এখন সেটা রক্ষা করতে পারছি না। আমার দৃষ্টি ও-দিকের ওই লোকটার ওপর। কোমরে-গোঁজা পিস্তলের অস্তিত্ব অনুভব করছি, ও চলে যেতে নিলেই পিছু নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত।

'আমার ফ্যামিলিতে যে-ইয়াংকি বিয়ে করেছিল সে ছিল জলদস্যু।'

'নাম শুনেছি। জোসেফ চ্যাপম্যান।'

'না, অন্য লোক। সিনর চ্যাপম্যান ভাল লোক। আমার দাদু, বেন মারফির সাথে কোনও কোনও ব্যাপারে তাঁর মিল আছে – তবে দাদু নিজের পরিবার ছাড়া আর সবার প্রতি ভয়ঙ্কর কঠোর। কারও জন্যে কোনও দয়ামায়া নেই তাঁর মনে।

উল্টো দিকের লোকটার গ্লাস খালি হয়ে গেছে, আরেকটার ফরমাস দেয়নি। চেয়ার সরিয়ে ওঠার জন্যে তৈরি হলাম, কিন্তু বেন্ডিগোর হুঁশ নেই।

'দুহাতে খরচ করে এখন আমরা ফতুর। ব্যবসার টাকা নেই। সব হারাতে বসেছি।'

'লেগে থাকো।'

'লাভ হবে না। দুই বছর ধরে খরা চলছে...প্রচুর দেনা হয়ে গেছে। এক ব্যাঙ্কার বন্ধুর ঋণের জামিন হয়েছিলেন দাদু, ব্যাঙ্ক লোকসান দিচ্ছে, এখন তমসুকের টাকা শোধ করতে হবে তাঁকে। মেয়াদ বাড়াবে বলে মনে হয় না।'

ওর কথায় কান নেই, আমার সমস্ত মনোযোগ ওই লোকটির প্রতি, যেতে নিলেই অনুসরণ করব।

'জামিনের ব্যাপারে দাদুকে রাজি করিয়েছিল বেটি ওয়ারেন।'

ধক্ করে উঠল বুক। এতক্ষণ বেন্ডিগোর কথাবার্তায় আমল দেইনি, মনে হচ্ছিল এর সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই কারণ ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার না আছে জমি, না কাউকে চিনি। এখন যেন সহসা সব কিছু খাপে খাপে মিলে গেল।

'এর পেছনে ওর কোনও মতলব ছিল বলছ?'

'প্রমাণ নেই, তবে আমার বিশ্বাস ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের সঙ্গে বেটি ওয়ারেন যার হয়ে কাজ করছে তার একটা চুক্তি হয়েছিল। ব্যাংক যাতে লোকসান দেয় সেই প্ল্যান করা হয়েছে প্রথমে, তারপর বেটি দাদুকে পটিয়ে ঋণ দিতে জামিনের পাট্টা লিখিয়ে নেয়।'

ওর বক্তব্যে যুক্তি আছে। খরায় শস্যহানি এবং প্রচুর গবাদি পশু মারা যাওয়ার ফলে ব্যাংকের অবস্থা এমনিতেই খারাপ। এইসময় কেউ যদি ওদেরকে একতাল সোনার খোঁজ দিয়ে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা দেখায় – সেটা গ্রহণ করাই স্বাভাবিক...বিশেষত ওরা যদি অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার মত লোক হয়।

হ্যাঁ, ব্যাপারটার মধ্যে একটা কদর্য ইঙ্গিত আছে। ব্যাংকারের একটাই কাজ এখানে; বেটির সহায়তায় বেন মারফিকে ঋণের জামিন হতে রাজি করানো।

সে-কালে ক্যালিফোর্নিয়ার বনেদি পরিবারগুলো টাকাপয়সার ব্যাপারে উদার ছিল। কোমরবন্ধে টাকার থলে রাখত লোকে, কেউ সাহায্য চাওয়ামাত্র হাত ঢুকিয়ে বের করে দিত। ওরা ছিল সরল বন্ধুবৎসল মানুষ। জীবনের কোনও

জটিলতা ছিল না তখন। ওদের চারপাশের লোকজনও প্রায় একই রকম হওয়ায় খটাখটি হত না। তারপর সোনার সন্ধানে আরেক ধরনের লোক এল এ-দেশে, আর তখন জীবনটাও গেল বদলে।

প্রথমে এল মাইনার আর ভবঘুরেরা। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রবীণতম বাসিন্দাদের মত ওরাও সব কিছু সহজেই পেয়ে যায়। তারপর এক-এক করে আসতে শুরু করে জুয়াড়ি, বাটপার, এবং ঠক ব্যবসায়ী।

'কতটা জমি?' জিজ্ঞেস করলাম বেনডিগোকে।

'একলাখ একরের বেশি।'

আমার দম বন্ধ হওয়ার দশা হলো। পাহাড়ে আমরা একশো ষাট একরের মত জমি আবাদ করি। এ-রকম আরও কিছু জমি আছে আশেপাশে – আগাছায় ভর্তি। চাষ করা যাবে না – খাড়া ঢাল। ফসল বিশেষ হয় না, অনুর্বর জমি – যা পাই তাতে কোনও মতে চলে যায়। কিন্তু এখানকার জমি উর্বর, সেচের ব্যবস্থা করলে।

স্বাভাবিক, এই জুয়ায় জেতার জন্যে প্রয়োজনবোধে ওরা খুন করবে। আমি কোনও জট পাকাই চাইবে না সেটা।

'মেয়েটার কী ভূমিকা এতে?'

'দাদু আমাদের মতই রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ। মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা আছে – সুন্দরী যুবতী হলে আরও সরেস। তাঁর এই ব্যাংকার বন্ধুর নাম টার্নার। দাদুর সঙ্গে দেখা করার সময়ে ভাগনীকে সাথে করে এসেছিল।'

বারের লোকটা আচমকা ঘুরে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল। আমিও উঠে পড়লাম। 'বাকিটা পরে শুনব,' বললাম ওকে, 'জরুরি কাজ আছে আমার।'

লোকটা শহরের দিকে চলে গিয়েছিল, মোড়ে এসে দেখলাম একটা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আগে ওটার নাম ছিল বেলা ইউনিয়ন হোটেল। এখন পালটে রাখা হয়েছে সেন্ট চার্লস। এই হোটেলের নাম শুনেছি। দশ-পনেরো বছর আগে বিখ্যাত এক গান ব্যাটল হয়েছিল। বব চার্লিসলে বনাম কিং ব্রাদার্স।

হাঁটা দিলাম ওর দিকে, আমাকে দেখতে পাওয়ার আগেই যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকা দরকার। বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে ও, তবে আমার পা লম্বা, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ দেখে ফেলল, বাউলি কেটে ঢুকে গেল একটা গলির ভেতর। আমি ধাওয়া করলাম...অসতর্কভাবে।

মোড় ঘুরতেই দেখলাম প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে, সিক্স-শূটার উঁচিয়ে গুলি করল। পয়েন্ট-ব্ল্যাংক রেঞ্জ, ব্যর্থ হওয়ার কথা নয় – কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিশানা নড়ে গেল।

মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেলাম একটা, ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, তারপর পড়ে গেলাম মুখ থুবড়ে।

পেছন থেকে ভেসে আসছে ছুটন্ত পদশব্দ, তারপর সামনেই সশব্দে একটা দরজা বন্ধ হলো কোথাও।

সাত

মুহূর্তে ভিড় জমে গেল। অর্থহীন অবান্তর প্রশ্ন করে ভারি করে তুলল পরিবেশ। টলতে টলতে উঠে দেয়ালে হেলান দিলাম। কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছে। মারাত্মক চোট নয়, খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে গেছে। কেবল একটা জিনিস মনে আছে আমার – সামনে, গলিতে কোথাও একটা দরজা বন্ধ হয়েছিল।

কী ব্যাপার, কে গুলি করেছে ইত্যাদি নানান প্রশ্নে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে লোকজন, কিন্তু আমি নির্লিপ্ত। শুধু একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে আমার সমস্ত অনুভূতি: আমাকে যে গুলি করেছে খুঁজে বের করতে হবে তাকে।

বেনডিগো সাহায্য করার চেষ্টা করছিল, ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিলাম ওকে। কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর এগিয়ে গেলাম সামনে।

মোটে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে ক্ষণিকের তরে হেলান দিলাম দেয়ালে, চরম কিছুর জন্যে প্রস্তুত করলাম নিজেকে। তারপর হাতল ঘুরিয়ে ঢুকলাম ভেতরে।

লম্বা হলওয়ে, প্রায় চল্লিশ ফুট, ডানে দুটো এবং বাঁয়ে একটা দরজা। ডানের প্রথম দরজাটা একটা গুদামঘরের, মেঝেতে কিছু কাঠ পড়ে আছে। কোনও লোক নেই।

যথাসম্ভব আস্তে কপাট বন্ধ করে ডানের দ্বিতীয়টা খুললাম। কাপড়ের দোকান। একজন খদ্দেরের সাথে কথা বলছিল ক্লার্ক, আমাকে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল চেহারায়।

'আর কেউ এসেছিল এর মধ্যে?' জিজ্ঞেস করলাম।

দুজনেই একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে, তারপর মাথা নাড়ল। 'না,' বলল ক্লার্ক।

বাকি রইল বাঁয়ের দরজাটা। ঘুরলাম ও-দিকে, তারপর ঝট করে খুলে ভেতরে পা রাখলাম।

একটা ডেস্কের পেছনে একজন লোক বসে, এই দীর্ঘকায় যুবকের সাথেই তখন হোটেল ছেড়েছিল বেটি ওয়ারেন।

'আমাকে খুঁজছ?'

'এইমাত্র যে-লোকটা গলি থেকে এসেছে তাকে,' বললাম।

'সরি – কেউ আসেনি। আর কিছু?'

বাঁ-হাতে মুখের রক্ত মুছলাম। দপদপ করছে মাথার ভেতর। চোখ কুঁচকে তাকালাম চারপাশে।

আসবাব বলতে বড় রোলটপ ডেস্ক, দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল। হাতের বাঁয়ে একটা দরজা। বন্ধ।

'ওখানে কে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কেউ না।'

আমার উপস্থিতি পছন্দ করছে না লোকটা। আরও কিছু বলতে নিয়েছিল, কিন্তু আমি দরজাটা দেখিয়ে বললাম, 'খোলো!'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিল সে। 'না, বেরিয়ে যাও – না গেলে হাজতে পাঠাব। আমার সেই ক্ষমতা আছে।'

ডেস্কের কাছে গিয়ে ওর নাকের ডগায় ঝুঁকে পড়লাম। 'মিস্টার,' আমি বললাম মধুর গলায়, 'যা বলছি করো।'

খেপে গেল লোকটা, ওঠার প্রয়াস পেল। চেহারা থেকেই বোঝা যায় কারও হুকুমের চাকর নয়, বরং হুকুম করতে এবং সেটা পালিত হয়েছে দেখতেই অভ্যস্ত সে। বিশাল পেটা শরীর, রাগে তিড়িক তিড়িক লাফাচ্ছে কপালের দুপাশের রগ। যখন দুই হাতলে দুহাতের ভর রেখে উঠে দাঁড়াল, ওর কলার চেপে ধরলাম, তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে আনলাম সামনে, তারপর ধাক্কা মারলাম সজোরে।

হুড়মুড় করে চেয়ারসহ মেঝেতে উলটে পড়ল সে, আমি ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুলে ফেললাম দরজাটা। দুটো বুলেট ছুটে এল, পরপর, কিন্তু আমি আগেই একদিকে সরে দাঁড়ানোয় দুটোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

দরজা খুলতেই অন্ধের মত গুলি করেছিল লোকটা, নিশানা করেনি।

'ড্রপ দ্য গান!' বললাম আমি।

আমার কথা মনঃপূত হলো না ওর। নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে বললাম, 'আর মোটে দুটো গুলি আছে তোমার কাছে। আমার আছে পাঁচটা – একটাও মিস হবে না।'

'আমার পেছনে লেগেছ কেন – আমি তোমার জিনিস নেইনি –' ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

গুলি করার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু আমার হাতে ক্ষুদে কামানটা দেখে লোভ সংবরণ করল। অনেকক্ষণ ঠায় তাকিয়ে রইল পিস্তলটার দিকে, তারপর পিছিয়ে গিয়ে ফেলে দিল নিজেরটা।

'আমি তুলছি না,' বললাম, 'তোমার ইচ্ছে হলে তোলো।'

পেছনে শব্দ হতে পাঁই করে ঘুরলাম আধপাক। দীর্ঘকায় যুবকের দিকেও নজর রাখতে পারব।

'আমার সর্বস্ব লুট করেছ তোমরা। নিজেদের ভাল চাইলে মানে মানে ফেরত দাও।'

লম্বু উঠে দাঁড়াল মেঝে থেকে, তবে সাবধানে, জানে হেয়ারট্রিগারে নিশপিশ করছে আমার আঙুল। মাযল্ নাচিয়ে দ্বিতীয়জনকে ইশারা করলাম প্রথমজনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে।

'আমরা কিচ্ছু জানি না,' বলল লম্বু। 'কী বলছ আবোলতাবোল?'

'মিথ্যুক।' বললাম। 'আমার ধারণা যদি ভুল হয় পরে না-হয় ক্ষমা চাইব। তবে এ-লোককে আমি দেখেছি – মরুভূমিতে; ওখানেও গুলি করেছিল আমাকে।'

'ভুল করছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি। মোজাভেতে যখন ছিলে, নিশ্চয়ই জানো আমিও গুলি ছুঁড়তে জানি। এখন আমার জিনিসগুলো ফেরত দাও।'

'গদর্ভ!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল লম্বুর কণ্ঠ থেকে। 'পিস্তল ধরে আছো তাই – একবার বেরোও এখান থেকে, আইন তোমাকে ধরবে। আমাদের মারলে ফাঁসি হবে তোমার।'

'হোক – কিন্তু তার আগে আমিও সব কিছু ফাঁস করে দেব।'

চমকে উঠল দুজনেই। সহসা উপলব্ধি করলাম ইতিমধ্যেই ওরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে মনস্থ করে নাও থাকে, এই মুহূর্তে আমি নিজেই সে-ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি।

'সাবধান, ডেটন,' বলল বাঁটুল, 'বন্দুকে ওর হাত দারুণ।'

কুৎসিতভাবে হাসল ডেটন। 'তার চেয়ে বরং আমার পরামর্শ নাও, বন্ধু, এক্ষুণি পালাও এই শহর ছেড়ে।'

'আমার মাল ফেরত দাও আগে।'

বাঁটুলের দিকে তাকাল ডেটন। 'কী বলছে ও? ওলি, তুমি জানো কিছু?'

ওলি নিজের ঠোঁট চাটল। 'আমরা ভেবেছিলাম ও মারা গেছে – হ্যাঁ, নিয়ে এসেছি ঘোড়াগুলো।'

'এবং তিরিশ পাউন্ড সোনা,' বললাম আমি।

দোনোমনো করল ওলি। 'সোনার ব্যাপারে আ–'

'তিরিশ পাউন্ড মানে তো অনেক,' নিরুত্তাপ সুরে বলল ডেটন। 'ব্যাপারটা আমারও জানা দরকার, ওলি।'

'আমি জানি না,' বলল ওলি। 'আমি–'

পিস্তলের হ্যামার টানলাম। 'মগজটাকে একটু খেলাও, দোস্ত। নইলে–' ভীষণ হয়ে উঠল আমার চেহারা।

ওলির কপালে ঘাম। ভয় পেয়েছে। সম্ভবত সোনাটা সবার অগোচরে মেরে দেওয়ার তাল করেছিল, এবং এইক্ষেত্রে ওর সাথে আরও দু-চারজন থাকা বিচিত্র নয়। এখন অন্যদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তবু শেষ-চেষ্টা করল।

'ওসমানদের পাল্লায় পড়োনি তো – পড়লে আর কথা ফুটবে না মুখে।'

'কে?'

'নোয়েল ওসমান – গান ফাইটার।'

ওসমান শুনে চমকে উঠেছিলাম। ও বোধ হয় ভাবছে আমি ভয় পেয়েছি। চকিতে হার্ডির স্যালুনে সেই বৃষস্কন্ধ লোকটির চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। নোয়েল ওসমান নামটা আজই প্রথম শুনলাম, পরিচিত মনে হওয়ার কারণ অবয়বগত সাদৃশ্য। অ্যানজেলের সাথে ওর চেহারার মিল আছে।

স্মোকি মাউন্টিন বা কামবার্ল্যান্ড ওসমানদের মধ্যে নোয়েল বলে কেউ নেই।

'ক্লিঞ্চ মাউন্টিন!'

'মানে?' বোকার মত আমার দিকে তাকাল ওরা। ওসমান পরিবারের ইতিহাস যারা জানে না, এর অর্থ তারা ধরতে পারবে না। একমাত্র ক্লিঞ্চ মাউন্টিনের ওসমানদের পক্ষেই এ-ধরনের কাজে জড়ানো সম্ভব। ওদের প্রায় সবাই আউট-ল, তবে সাহসী।

'মিস্টার,' বললাম, 'ফালতু না বকে আমার মালগুলো কোথায় তাই বলো।'

'তা হলে যাও, ওর সাথে বোঝাপড়া করোগে,' আবার জুজু দেখাল বাঁটুল।

'দরকার হলে করব – এক ওসমান আরেক ওসমানের মুখোমুখি হবে।'

আমার কথা বোধগম্য হলো না। তাকাল ফ্যালফ্যাল করে। কাজেই বললাম খুলে। 'আমার নামও ওসমান, উইলিয়ম ওরিন ওসমান। সবাই ডাকে ওরিন বলে। নোয়েল কোথায় বলো, ও ওসমান নামের কলঙ্ক – ওকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।'

'তোমার ঘোড়া, সোনা সব গ্রীক জর্জের বাসায়,' বলল ওলি। 'কাহুয়েংগা পাসের কাছে। পারলে আনো গিয়ে।'

'তাই যাব।'

দরজার কাছে পিছিয়ে গিয়ে ডেটনের দিকে তাকালাম, 'আমার পেছনে লেগো না,' বললাম ওকে। 'তুমি লোক ভাল নও।'

ও হাসল, খুনীর হাসি। 'বেশি দূর যাওয়ার সৌভাগ্য তোমার হবে না – আমি ব্যবস্থা করছি।'

'তোমার অত সময় কোথায়,' বললাম, 'একজন বুড়ো মানুষের ঘাড় ভাঙতেই ব্যস্ত।'

ঝুলে পড়ল ডেটনের চোয়াল, যেন চড় মেরেছি। বলতে চাইল কিছু, কিন্তু তার আগেই বাইরে এসে দরজা টেনে দিলাম।

গলির মাথায় দাঁড়িয়েছিল বেনডিগো, উদ্বিগ্ন চেহারা।

'তোমার জন্যে ভয় হচ্ছিল,' বলল ও। 'কী করব বুঝতে পারছিলাম না।'

'গ্রীক জর্জের বাড়িটা চেনো?'

'কে না চেনে? ওর বাসাতেই আউট-ল তাবুরকিও ভ্যাসকুয়েজ ধরা পড়েছিল।'

'খুব কি দূরে?'

'বেশি না – দশ মাইল। পাহাড়ের গোড়ায়।'

'আমার মালপত্র ওখানে আছে।'

চট করে তাকাল বেনডিগো। 'তুমি যাবে? মাথা ঠিক আছে, সিনর? ওটা আউট-লদের আখড়া। স্যানতা মনিকা রেঞ্জের সব ক্যানিয়নই প্রায় তাই। শেরিফকে বলে আরও লোক জোগাড় করো।'

'লাগবে না – আমি একাই কাফি,' বলে আমার হোলস্টারে চাপড় মারলাম।

'আমিও আসছি, সিনর।'

অযাচিতভাবে কেউ সাহায্যের হাত বাড়াবে ভাবতে পারিনি, অভিভূত হলাম ওর কথায়। তবু অহেতুক আরেকজনকে বিপদে ফেলতে সায় দিল না মন। সরাসরি নিষেধ করাটা শোভন নয়, ওর আত্মসম্মানে ঘা লাগবে। সুতরাং কী ঘটতে পারে সেটা বললাম। 'তোমার ইচ্ছে হলে আসো; তবে ওখানে কিন্তু গোলাগুলি হবে।'

ঘোড়া নেওয়ার জন্যে আস্তাবলে গেলাম আমরা। আমার বিশ্বাস সত্বর না গেলে কাউকে পাব না, ওলি হুঁশিয়ার করে দেবে ওদের।

'ওদের একজনের নাম নোয়েল ওসমান,' বললাম। 'ওকে মারতে হলে আমি মারব – তুমি কিছু কোরো না।'

ঈষৎ সাদা হয়ে গেল ওর মুখ। 'আমি জানতাম না, অ্যামিগো, ও এতে জড়িত আছে। লোকটা ভয়ঙ্কর, বাইশটা খুন করেছে।'

'মানুষ খুন করার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই, বেন।'

স্যাডলে চেপে ফোর্ট স্ট্রীট হয়ে শহরের বাইরে রওনা হলাম আমরা। যাচ্ছি পশ্চিম-উত্তরের পাহাড় অভিমুখে। অসংখ্য কমলা বাগান পথের দুই পাশে, বৃক্ষসারির মাঝ দিয়ে চলে গেছে সেচ খাল। এতগুলো তো দূরের কথা, জীবনে এক সঙ্গে আধডজনের বেশি কমলা দেখার বরাত আমার হয়নি।

লস এঞ্জেলেসে রেল রাস্তা আছে। পেছন ফিরতে ডিপোতে একটা ট্রেন চোখে পড়ল। মেইন স্ট্রীট ডিপো থেকে সনোরা টাউনের দিকে চলে গেছে। এই অঞ্চলের দরিদ্র মেক্সিক্যান এবং আদি ক্যালিফোর্নিয়ানরা থাকে ওখানে। অধিকাংশ বাড়ি রোদে-পোড়া ইটের তৈরি। সাদা চুনকাম করা। প্লাযার চারপাশে সাইপ্রেস গাছ; এ-দিকটায় পিকো হাউস ও বেকার ব্লক, শহরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। আবাসিক এলাকায় রাস্তার দুধারে পিপুল গাছের সারি। তবে আমরা সেচ খাল পেরোনোর পর থেকে শুরু হলো শুষ্ক প্রান্তর। গত দুবছরের খরায় ফসলের ক্ষেত জ্বলে গেছে।

বেনডিগো পথ দেখাচ্ছে, পাকা রাস্তা পেরিয়ে লা নোপালেরার – ক্যাকটাস প্যাচের* –মধ্য দিয়ে ছোট্ট একটা সরাইখানায় উপস্থিত হলাম। সরাইয়ের মালিক মেক্সিক্যান। বেনডিগো নেমে ভেতরে গেল, আমি পথের দিকে নজর রাখলাম।

---

* ক্যাকটাস প্যাচ: বর্তমানে এই জায়গাতেই হলিউড অবস্থিত।

ঝিরঝিরে বাতাস, শান্ত নিরুত্তাপ দিন, অবসরযাপনের উপযুক্ত। কিন্তু আমাদের কপালে তা নেই – কাজ আছে।

পশ্চিমে র‍্যাঞ্চো রোডিও দ্য লাস অগ্যস*। পাহাড়ের প্রান্তে ক্ষীণ নীলচে ধোঁয়ার রেখা। গ্রীক জর্জের বাড়ি – আমাদের গন্তব্য। তাবুরকিও ভ্যাসকুয়েয পালানোর সময়ে আহত অবস্থায় ওই বাসা থেকেই ধরা পড়েছিল।

থমথমে চেহারায় সরাই থেকে বেরিয়ে এল বেনডিগো। 'সিনর, গ্রেইগোর বাসায় পাঁচজন লোক আছে – তবে তুমি যার কথা বললে ওদের মধ্যে সে নেই।'

পাষাণভার নেমে গেল বুক থেকে। আজ পর্যন্ত ওসমানদের কেউ আত্মকলহে লিপ্ত হয়নি – আমার হাতেই সেটা শুরু হোক তা আমি চাই না। ক্লিঞ্চ মাউন্টিন ওসমানরা ফন্দিবাজ লোক, বদমতলবেই ওয়াইলডারনেস ট্রেইল অথবা ন্যাটশেষ ট্রেসে ঘুরঘুর করে, কিন্তু ওরা সবাই সাহসী...সত্যিকার লড়ুয়ে।.

'চলো, যাই।'

এক সেকেন্ড আমাকে জরিপ করল বেনডিগো, তারপর স্যাডলে উঠল, ভয়লেশহীন চেহারা, পেছনে হাত বাড়িয়ে পিস্তলের হোলস্টারখানা সামনে টেনে আনল।

'দাদুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো,' আচমকা বলল। 'বুড়োর পছন্দ হবে তোমাকে।'

'আমারও তাই ইচ্ছে,' আন্তরিক গলায় বললাম।

বৃদ্ধের অনেক কথাই শুনিয়েছে বেনডিগো। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান, যদিও সুন্দর মুখের প্রতি একটু দুর্বল। তবে এইরকম এক-আধটু দুর্বলতা অনেকেরই থাকে।

দুলকি চালে বাসার পেছনে এসে ঘোড়া থেকে নামলাম।

দরজা খুলে চৌকাঠে হেলান দিল একটা লোক। কঠিন চেহারা, ঠোঁটে বিদ্রূপের ঝিলিক। 'আরে, দেখে যাও কে এসেছে! আমরা ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছো।'

'সীসে হজম করার অভ্যেস আমার আছে।'

'তাই?' হাসল লোকটা। 'ভাল – তবে আমরা এক ভুল দুবার করি না।'

ও যখন কথা বলছিল, আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম ওর দিকে। বেনডিগো দাঁড়িয়েছিল ঘোড়ার কাছে, একচুল নড়েনি।

দোরগোড়ায়-দাঁড়ানো লোকটা সোজা হলো, হাসল কালচে দাঁত বের করে, তারপর আচমকা হাত বাড়াল পিস্তলের জন্যে। নিঃসন্দেহে নিজেকে ও ক্ষিপ্র বলেই ভেবেছিল, কিন্তু আমি তার ধারেকাছে দিয়েও গেলাম না, বিদ্যুৎগতিতে ঘুসি মারলাম মুখে।

---

* বর্তমান বেভারলি হিলস্।

পিস্তল বের করার সুযোগ পেল না ও, চোয়ালে আঘাত হানল ঘুসি, মাথা ঠুকে গেল চৌকাঠের সাথে। মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারাল। ঠিক ওই মুহূর্তে পরপর দুটো গুলির শব্দ ভেসে এল পেছন থেকে। কপাটে পিঠ ঠেকালাম আমি, হাতে পিস্তল। চোখের কোণে দেখলাম বেনডিগোর পিস্তলের নলে ধোঁয়া। জানালা থেকে একজন রাইফেলধারী উলটে পড়ল মাটিতে। মনে হলো অক্কা পেয়েছে।

ভেতরে তিনজন লোক ঝট করে হাত বাড়াল নিজেদের রাইফেলের দিকে, টেবিলের পাশে একটা মেক্সিক্যান যুবতী দাঁড়িয়ে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। মেয়েটা সুন্দরী, স্বীকার করছি, তবে কালনাগিনী।

'তোমার চেহারা ওর মত!' নিখাদ বিস্ময় ফুটল ওর কণ্ঠে।

'একদম ওর মত!'

'নোয়েলের কথা বলছ তো,' বললাম, 'হ্যাঁ, ওসমানদের চেহারায় মিল আছে – যদিও ওকে আমি দেখিনি।'

'দেখবে, ও তোমার যম,' ফণা তুলল নাগিনী।

'কেন – দেনাপাওনা চুকলেই আমরা যে যার পথে চলে যাব।'

সত্যি, এটাই আমার অন্তরের ইচ্ছা – ভয় দেখানোর জন্যে বলিনি। আমি চাই না কোনও জ্ঞাতি ভাইয়ের গায়ে হাত ওঠাতে, নোয়েলও তা চাইবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমার জিনিসগুলো? সোনা?'

'ঘোড়া ওখানে আছে।' মাথা নাচিয়ে আস্তাবলের দিকে ইশারা করল একজন লালচুলো লোক। 'সোনার ব্যাপারে কিছু জানি না।'

'ম্যাম,' মেক্সিক্যান মেয়েটাকে বললাম, 'আগুনটা উসকে দিয়ে ওই শিকটা নিয়ে এসো। মনে হচ্ছে ওটা লাগবে।' ওদের পানে চেয়ে হাসলাম। 'নিউ মেক্সিকোতে কিছু দিন ছিলাম – অ্যাপাচিদের কায়দা-কানুন জানি।'

লাল-চুলোর চেহারায় ভাবান্তার হলো না, কিন্তু বাকি দুজনের কপালে চিকন ঘাম দেখা দিল।

দোরগোড়ায় যাকে ধোলাই দিয়েছিলাম, তার জ্ঞান ফিরেছে দেখে ঘাড়ে ধরে টেনে আনলাম ভেতরে।

মেক্সিক্যান মেয়েটা নীরবে এতক্ষণ লক্ষ করছিল সব কিছু, আমি নিজেই এ-বার আগুনটা খুঁচিয়ে দিতে ও ঘুরে নিজের শালখানা তুলে নিল। 'তোমরা থাকো,' অন্যদের উদ্দেশে বলল সে, 'আমি নোয়েলকে ডাকতে যাচ্ছি। সিনর ডেটনকেও নিয়ে আসব।'

ঘাড় উঁচু করে ও সোজা আমার চোখে চোখ রাখল। 'ও কিছু বলবে না! ভয় পেয়েছে!'

আমি মুখ টিপে হাসছি দেখে খুন চড়ে গেল নাগিনীর মাথায়। ধক্ করে জ্বলে উঠল কালো চোখদুটো, কিছু বলার জন্যে হাঁ করতেই আমি বাগড়া দিলাম, 'যাও, নোয়েলকে ডেকে আনো। ওকে বলবে, ওরিন ওসমান অপেক্ষা করছে।'

ডেটনের কাছে গিয়ে লাভ হবে না, ও জানে আমি এখানে আসছি। আমাদের দেখা হয়েছে...ওলি নামে এক লোক তখন ওর সাথে ছিল।'

চমকে উঠল লোকগুলো। মেয়েটা একছুটে বেরিয়ে গেল, যেন আশঙ্কা করছিল আমি বাধা দেব। কিন্তু আমার আদৌ তেমন কোনও বাসনা ছিল না, আমি চাই সমস্যা মিটাতে, ওরা সবাই এলেই বরং আমার লাভ।

'আমার ফ্রেন্ডদের ডেকে আনি, সিনর,' বলল বেনডিগো। 'ভ্যাকুয়েরোরা এদেরকে পেলে খুশিই হবে – আমাদের অনেক ঘোড়া চুরি করেছে।'

রেডের চেহারাও চুপসে গেছে এখন। 'যাও,' বললাম বেনডিগোকে, 'আর, হ্যাঁ, বেশি করে দড়ি আনতে বলো–'

লস এঞ্জেলেসের লোকজনের সে-কালে খুব ফাঁসিপ্রীতি ছিল। মওকা পেলেই হলো – আইনের ধার ধারত না। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সাতাত্তরজনের ফাঁসি হয়েছিল। এর মধ্যে চল্লিশটা ছিল আইনসিদ্ধ, অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ওদের, বাকিগুলো স্রেফ ঝোঁকের বশে। সরকারি আমলারা ছিলেন উদাসীন, ফলে প্রায় রোজই গোলাগুলি হত। রগচটা বলে দুর্নাম ছিল শহরবাসীদের। একটুতেই লিন্সিং পার্টি গঠিত হত।

আমাকে ওরা আমল না দিলে কী হবে, নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন। বাড়ির পেছন দিকে গুদাম ঘর, সেখানে আটকে রাখলাম ওদের।

আস্তাবলে আমার পাঁচটা ঘোড়া এবং স্যাডল গিয়ার পেলাম। থলেটাও আছে। হাতড়ানো হয়েছে, তবে মোটামুটি অক্ষত আছে সব কিছু। বাসায় আরেকজনের জিনিসের ভেতর উইনচেস্টারখানা মিলল। লোডেড, কক্ করলাম লেভার টেনে।

কিন্তু আমার মূল চাহিদা সোনা। সারা বাড়ি তল্লাশি চালিয়েও হদিস পেলাম না।

হঠাৎ অনেকগুলো খুরের শব্দ কানে এল, সম্ভাব্য লড়াইয়ের আশঙ্কায় ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে গেল শরীরের সমস্ত পেশী।

জানালা দিয়ে দেখলাম ওরা আসছে। নিঃশব্দে বাইরে গিয়ে ঝরনা সংলগ্ন উইলো ঝোপে গা ঢাকা দিলাম। মেক্সিক্যান মেয়েটা ওদের সঙ্গে রয়েছে। ছজন লোক, প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটে এল ওরা, বাসার কাছে এসে গতি মন্থর করে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তারপর খুব ধীর কদমে এগিয়ে আসতে লাগল।

উইলো ঝোপের ভেতর নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম। অহেতুক রক্তক্ষয় আমার কাম্য নয়। নোয়েল ওসমানকে না দেখে হতাশ হলাম কিছুটা।

সোনাগুলো কোথায় থাকতে পারে তাই ভাবছি। ওলি জানিয়েছিল এখানে আছে, এই বাসায়, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে।

ওই লোকগুলো যখন নেমে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হলো, আস্তাবলে গিয়ে স্ট্যালিয়নের পিঠে চেপে সরে পড়লাম ওখান থেকে। বাকি চারটে ঘোড়াও আছে

সঙ্গে। ওদিকে, ভেতরে আমাকে না পেয়ে তুমুল তর্ক শুরু হয়েছে। কিন্তু আমি নির্লিপ্ত, নিকটবর্তী ক্যানিয়নের উদ্দেশে এগিয়ে গেলাম।

বেন্ডিগো ফিরে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোলাগুলি করব না। ভুল লোক মারা পড়তে পারে – এমন লোক যে হয়তো আমার সোনার খোঁজ জানে।

মিনিট দুয়েক পর বাইরে এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। একটা লম্বা ক্যাকটাস ঝোপের ভেতরে স্যাডলে বসে নজর রাখলাম ওদের ওপর। রাইফেলটা সামনে আড়াআড়িভাবে রাখা। উপত্যকার ও-পাশে, রোডিও ডি লাস অগ্যাসের দিক থেকে একটা ধূলিঝড় এগিয়ে আসছে।

আশপাশে আমার ট্র্যাক সন্ধান করছে দস্যুরা। বহু ট্র্যাক আছে ওখানে, অল্প সময়ের মাঝে বেশ কিছু লোক ওই বাড়িতে এসেছে এবং চলে গেছে। সুতরাং ওদের খোঁজাই সার হবে – আমার ভয়ের কারণ নেই।

সোনাগুলো যেভাবেই হোক ফিরে পেতে হবে, অ্যারিযোনায় আমার বন্ধুরা নির্ভর করে আছে এর ওপর – আমার পথ চেয়ে আছে। ওটা কোথায় বেটি নিশ্চয়ই জানে। ওকে যতটুকু চিনেছি তাতে মনে হয়, কোনও কিছুই ওর শ্যেন দৃষ্টি এড়ায় না।

দূরের মেঘ কাছে চলে এসেছে। ওরাও বোধ করি দেখে থাকবে, তাড়াতাড়ি জিনে চেপে চম্পট দিল।

দুজন আমার পাশ দিয়ে লরেল ক্যানিয়নের দিকে চলে গেল। আউট-লদের কয়েকটা ঘাঁটি আছে ওখানে।

ওরা যখন অদৃশ্য হলো, আমি ঝোপ থেকে বেরিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে গেলাম। কেবল মেয়েটা রয়ে গিয়েছিল, আমাকে দেখে জ্বলে উঠল চোখ।

'সোনা কোথায় তুমি জানো?' মোলায়েম সুরে জিজ্ঞেস করলাম। 'বললে আমার সময় বাঁচত, তুমিও বিপদ এড়াতে পারতে।'

'তোমার কী হলো না হলো তাতে আমার কী আসে যায়!' মাথা ঝাঁকিয়ে একরাশ কালো চুল কাঁধে পিঠে ছড়িয়ে দিল ও। 'সিনর ওসমান আসলেই বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল।'

'দোয়া কর, যেন তাড়াতাড়ি আসে। আমার বন্ধুরাও আসছে।'

জবাব দিল না ও, ঢাকের আওয়াজের মত খুরের শব্দ আমরা দুজনেই এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

'ইচ্ছে করলে আমার সাথে চলে আসতে পারো,' বললাম। 'তোমার মত একজন সুন্দরী এ-রকম আজেবাজে লোকের সঙ্গে আছে ভাবতেই খারাপ লাগে।'

উত্তর দিতে নিয়েও ও সামলে নিল নিজেকে, দুটো ঠোঁট চেপে বসল পরস্পর।

বিশজন শক্ত-সমর্থ ভ্যাকুয়েরোসহ উঠোনে ঢুকল বেন্ডিগো। কোনও লড়াই হবে না দেখে মলিন হলো ওদের চেহারা।

'সিনর, আমাদের সঙ্গে চলো,' বলল বেন্ডিগো। 'দাদু তোমার জন্যে বসে আছেন।'

'বেন মারফি?'

'সি!' ও হাসল। 'এবং সিনোরিটা ওয়ারেন।'

আট

রোদে-পোড়া ইটের লম্বা দালান। বারান্দামুখী একসারি দরজা। প্রাচীন ছায়াসুশীতল জায়গা। বড় বড় বুড়ো ওক আর সাইক্যামোরের ঝাড়। দীর্ঘ পথশ্রমের পর বিশ্রামের আভাস পেয়ে আমার মন জুড়িয়ে গেল। স্যাডলে বসে চারপাশে তাকালাম সন্ধানী দৃষ্টিতে।

হাতছাড়া না হলে, বুড়ো বেনের পর এই বাড়ির মালিক হবে বেন্ডিগো। এ-রকম একটা বাড়ির জন্যে ওর স্পর্শকাতর হওয়া স্বাভাবিক। একধরনের উষ্ণ পারিবারিক আমেজের ছোঁয়া রয়েছে, গোলাঘরের শুকনো খড় আর বাগানের জেসমিন ফুলের তাজা মিষ্টি ঘ্রাণে জড়ানো পরিবেশ।

ইংরেজি 'এল' প্যাটার্নের দালান, দেয়ালে পাতাবাহার লতানো। পশ্চিম দুয়ারী, দূর-পাহাড়ের ওইপাশে সমুদ্রের ফিকে ছায়া। মাঝখানে তৃণভূমি, খরায় হলুদ হয়ে গেছে এখন। মাঝে-মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো ভুট্টা অথবা মটরশুঁটির খেত।

একটা দরজা খোলার শব্দে আড়চোখে দেখলাম বেটি ওয়ারেন দাঁড়িয়ে, চমৎকার পোশাকে আগের চাইতে মদির লাগছে।

'ভেতরে আসবে না? মি. মারফি অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।'

ও ঘুরল। 'হুয়ান, ভদ্রলোকের ঘোড়াটা একটু দেখবে?'

জিন থেকে নেমে কাপড় ও হ্যাটের ধুলো ঝাড়লাম, তারপর বারান্দায় উঠলাম উঠোন পেরিয়ে। শিরদাঁড়ায় শিরশিরে অনুভূতি হুঁশিয়ারি জানাল, কেউ একজন লক্ষ করছে আমাকে – বেটি বা হুয়ান নয়।

বেটি হাত প্রসারিত করল, ঠোঁটে মন-ভোলানো হাসি। তবে চোখদুটো আশ্চর্য রকমের স্থির, সতর্ক এবং কিছুটা উদ্বিগ্ন।

'থ্যাংক ইউ, ওসমান, আমার জন্যে অনেক করেছ তুমি। আমরা ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ।'

'থ্যাংকস।'

ওর চোখে বিস্ময় দেখে বললাম, 'ওই ধারণাই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে – নইলে ওরা হয়তো মৃত্যু নিশ্চিত করত।'

দীর্ঘক্ষণ আমার মুখের ওপর স্থির রইল ওর চোখ, যেন বোঝার চেষ্টা করছে

আমি কতটা চালাক, কিংবা কত ভয়ঙ্কর...

'আসলে আমরা সবাই ভুলের শিকার।'

'মোজাভেতে তিনজন লোক মারা গেছে, ওরা শুনলে কিন্তু ব্যথা পাবে,' মুখের ওপর বললাম।

ও জবাব দেওয়ার প্রয়াস পেতেই থামিয়ে দিলাম ওকে। 'আমি তোমার কাছে আসিনি – বেন মারফির সাথে দেখা করতে এসেছি।'

গমগম করে উঠল বুড়োর ভরাট গলা। 'তাই হবে, মি. ওসমান! এসো, ভেতরে এসো!'

একটা বিশাল ভারি দোলনা চেয়ারে বসেছিল সে, আমি ঢুকতে অভিবাদন জানাল। আমার কল্পনায়-দেখা ছবির সাথে বাস্তব চেহারার মিল নেই। অর্থাৎ, যতটা নিষ্ঠুরদর্শন বলে ভেবেছিলাম ততখানি নয়। লম্বায় আমার চেয়ে খাটোই হবে। তবে চওড়া কাঁধ বলে দেয় এককালে এই লোক অসীম শক্তিধর ছিল। হাড়ে তারই ইঙ্গিত। আমার মতই চওড়া কবজি। দশ ইঞ্চি ঘের। পেশীবহুল হাত। বিরাট পাঞ্জা। আঙুলের গাঁটগুলো ফোলা ফোলা, কিন্তু আশপাশ চ্যাপটা...সব কিছু মিলিয়ে হুবহু একজন মুষ্টিযোদ্ধার হাতের মত।

চওড়া দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল, চোখজোড়া কোটরগত; ঈষৎ কাঁচা-পাকা চুল। সত্তরোর্ধ্ব বয়েস, অথচ দেখে তা মনে হয় না। সারা শরীরে কেবল একটা খুঁতই দৃষ্টিগ্রাহ্যঃ পা দুখানি কম্বলে ঢাকা, অনুমান করা শক্ত নয় যে শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেছে ওগুলো।

ডান ভুরু এবং বাঁ-চোয়ালে দুটো কালো গভীর ক্ষতচিহ্ন অতীতের স্মৃতি বহন করছে। তবে সচরাচর এ-সব লোক সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে, বেন মারফির চেহারা সে-রকম ভয়াল কিছু নয় – একজন খাঁটি কর্মী পুরুষের মত অবয়ব, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যে হয়েছে ধীর, শান্ত, সমাহিত।

বৃদ্ধ, কিন্তু ওই বার্ধক্যেও আমি আগুনের আভা প্রত্যক্ষ করলাম।

'তা হলে তোমার নামই ওসমান,' বলল সে। 'বেটির মুখে তোমার সাহসের কথা শুনেছি।'

ভ্রূর কাটা দাগটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে টের পেয়ে বলল, 'স্যেবার – অনেককাল আগের ঘটনা।'

'হ্যাটেরাসে,' আমি বললাম, 'সবাই ভেবেছিল ওই আঘাতই তোমার মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট।'

দুজনেই চমকে উঠল। বেটি ঘাড় ফিরিয়ে অনুসন্ধানী চোখে তাকাল আমার দিকে, বুড়ো চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে সোজা হলো। 'তুমি কীভাবে জানলে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'খুব কম লোকই জানে।'

'ক্যারোলাইনা উপকূলে তুমি প্রায়ই হামলা চালাতে,' বললাম। 'ওই চোট আমার দাদুর দেয়া।'

এক মিনিট আমার পানে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে, তারপর ঘর

কাঁপিয়ে দুলে দুলে হাসল। 'ভাল যোদ্ধা ছিল তোমার দাদু – তলোয়ারে অমন হাত আমি আর দেখিনি।'

খুঁটিয়ে আমার মুখ জরিপ করল বেন মারফি। 'আপন দাদু?'

'না, দূর সম্পর্কের। ক্লিঞ্চ মাউন্টিন ওসমান – আমরা অবশ্যি যোগাযোগ রাখি না...তবে ওরা আর যাই হোক, জলদস্যু নয়।'

বেনের চোখে কাঠিন্য ফুটে উঠল। ওর যদি চলাফেরার শক্তি থাকত, কোনও লোক ওকে ঘাঁটানোর আগে ভাল করে ভাবত। কিন্তু আমার বিশ্বাস এইসব আলাপে মজা পাচ্ছে বেন, বহুকাল পর ওর চোখে চোখ রেখে কথা বলছে কেউ। বিত্ত এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে সকলের কাছ থেকে তোয়াজ পেয়ে জীবনটা নিশ্চয়ই এখন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে ওর কাছে।

'ও-সব বহুকাল আগে ছেড়ে দিয়েছি,' বলল বেন মারফি। 'এখন আমি র‍্যাঞ্চার এবং একজন সুনাগরিক।' ওর চোখে বিদ্রূপের ছটা। 'নাকি তুমি শোনোনি?'

'না, শুনেছি, এবং বিশ্বাসও করেছি...কিছুটা।'

আবার মুখ টিপে হাসল সে এবং বেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুকের পাটা আছে ছেলের। এ-রকম লোকই আমার চাই।'

তারপর আমার পানে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'আমার এখানে কাজ করবে?'

'আমি চাকরি খুঁজছি না। আমার ত্রিশ পাউন্ড সোনা ফেরত পেলেই ওটা নিয়ে অ্যারিযোনায় ফিরে যাব।' বলে তাকালাম বেটির দিকে।

ইঙ্গিতটা সহজেই ধরে ফেলল বুড়ো। বস্তুত কিছুই তার নজর এড়ায় না। চকিতে একবার কুহকিনীকে দেখে নিয়ে আমার দিকে ফিরল। 'ভুল করছ, বন্ধু – ও আমার পক্ষে রয়েছে।'

বাতাসে হাত খেলিয়ে একটা চেয়ার দেখাল বেন। 'বসো, আমরা বরং খেতে খেতে পঞ্চাশ বছর আগের গল্প করি। তোমার দাদু তোমাকে কতটা বলেছে?'

'মেয়েটার উদ্দেশে ঘুরল। 'বেটি, আমাদের জন্যে এক বোতল ওয়াইন নিয়ে এসো – ভাল জিনিস আনবে, পুরোনো স্মৃতি মনে করাতে সাহায্য করে এমন।'

নীরবে বসে রইলাম আমরা, বেটি ওয়ারেনের বিলীয়মান পদশব্দ কানে আসছে। মনে হলো ওয়াইন সেলার বাড়ির শেষ প্রান্তে কোথাও হবে, বেশ দূরে।

'ওসমান, মরুভূমিতে তুমি ওকে সাহায্য করেছ, সে-জন্যে ধন্যবাদ।'

এইবার আমার অবাক হওয়ার পালা। আমার ধারণা ছিল, ওর পুয়েবলো* ত্যাগের ব্যাপারে বুড়ো কিছুই জানে না। 'আমি পানি আনতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ওদের একজন আমাকে গুলি করে এবং ওকে ধরে নিয়ে আসে। লোকটা ভেবেছিল আমি মারা গেছি।'

---

* লস এঞ্জেলেসকে সে-আমলে এই নামেই ডাকত মানুষ।

'আসলে মরার ভান করেছিল? আমি যে জানি ও সেটা জানে না।' লম্বা একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে চোখ কুঁচকে তাকাল সে। 'ও তোমার সোনা এনেছে?'

'ঠিক জানি না, তবে আমার বিশ্বাস ওটা কোথায় আছে ও তা জানে। আমার ধারণা' – কথাটা এমনভাবে বললাম যেন অশ্লীল না শোনায় – 'ওর সোনাপ্রীতি আছে, গন্ধ পায়।'

বেটি ফিরে আসছে দেখে মুখে কুলুপ আঁটলাম আমরা। যে-বোতলটা ও নিয়ে এল তার নাম ম্যাডেইরা। স্থানীয় লোকদের ভাষায় রেইনওঅটর। ওরা কেন এ-রকম বলে বলতে পারব না, আকাশ থেকে অমন স্বাদু পানি বর্ষিত হতে আজতক দেখিনি আমি।

'জ্যামাইকা হলেই বেশি খুশি হতাম,' বলল বেন। 'কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াতে পাওয়া যায় না।'

বৃদ্ধের ব্যবহার অমায়িক, তবু ওর চেয়ে ওর মদকেই বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। অবশ্যি কৃষ্ণ-নয়নার তুলনায় বেন অনেক নির্ভরযোগ্য – অন্তত এখনও পর্যন্ত। একজন অচেনা কাউহ্যান্ড ও মাইনারকে এ-রকম জামাই আদর করা একটু অভাবনীয় বৈকী! এককালে এর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে পানি খেত। আজ বয়েস ও যৌবনের অমিতাচারের ভারে সে ন্যুব্জ, পঙ্গু। কথাটা ভাবতেই দুঃখ বোধ করলাম, এই নিরাপদ আশ্রয় থেকে ওর বিতাড়িত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে।

গ্রীক জর্জের বাথানে যাওয়ার পথে বেন্ডিগো আরও বহু কথা বলেছে। টার্নার, অর্থাৎ ব্যাঙ্কার, মর্টগেজ দলিলে বেনের সই নেওয়ার ব্যাপারে বেটিকে লেলিয়ে দিয়েছিল। ডেটন এবং তার বন্ধুদের কাছ থেকে নগদ অর্থ পাবে টার্নার, এবং ওরা দলিলের জোরে বাথান দখল করবে। এমনকী, দলিল ছাড়াও বেনকে কব্জা করতে পারবে ওরা; ওর জমার ঘর শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে।

খরায় ওর ফসল, রেঞ্জ সব গেছে, বসতবাড়ির মায়া পরিত্যাগ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কিন্তু, সে-ক্ষেত্রে, এই পঙ্গু বৃদ্ধের কী দশা হবে? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে? দুবেলা দুমুঠো অন্ন আসবে কোত্থেকে?

এখন তার কথায় সেই আসন্ন বিভীষিকার ছায়ামাত্র নেই, সুরার প্রভাবে সোনালি স্মৃতি রোমন্থন করছে, ক্যারোলাইনা উপকূলে আমার দাদুর সাথে লড়াইয়ের ঘটনাটা বলছে। তখনকার দিনে জলদস্যুতা ঠেকানোর মত কোনও যুদ্ধজাহাজ এ-দেশে ছিল না বললেই চলে। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কিছু লোক এগিয়ে এসেছিল এই কাজে। দাদুও সে-দলে ছিলেন। জাহাজের ডেকে বেন মারফির সাথে তাঁর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুজনেরই শরীর থেকে রক্তপাত হচ্ছিল, তারপর একসময়ে ওই আঘাতে বেন মারফি ধরাশায়ী হয়।

বৃদ্ধের চোখ সারাক্ষণ স্থির রয়েছে আমার ওপর। কখনও কখনও উদাস হয়ে উঠছে সে-চোখের দৃষ্টি। মনে হয় যেন গভীরভাবে আমার কণ্ঠস্বর শুনছে

যদিও খুব কমই বলার সুযোগ ঘটছিল আমার। একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। বুড়ো তলে তলে কোনও প্ল্যান এঁটেছে, ও নিজে ছাড়া এই প্ল্যানের খবর কেউ জানে না।

বিদায় চাইব, সহসা বেন মারফি বলল, 'আজকের রাতটা থেকে যাও, ওসমান। ঘর পড়েই আছে – অসুবিধে হবে না। সোনার খোঁজে কাল গেলেও চলবে।'

টেবিলে হাতের গ্লাস নামিয়ে রেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে। 'বেন্ডিগো বলছিল তুমি মাইনিং টাউনে গিয়ে ব্যবসা করতে চাও। ইচ্ছেটা কি এখনও আছে?'

'সব কিছু নির্ভর করছে সোনা ফিরে পাওয়ার ওপর।'

হাতের ইশারায় চারপাশের খোলা প্রান্তর দেখাল সে। 'ওরা এগুলো কেড়ে নিতে চাইছে, কিন্তু আমার অনেক খচ্চর আছে। কম দামে দিতে পারব।'

হঠাৎ নিজের ছড়িটা টেনে নিয়ে ওঠার প্রয়াস পেল, তারপর থেমে বেটিকে বলল, 'ওদেরকে বলো আমাকে নিয়ে যেতে, আর মি. ওসমানকে তার ঘরে নিয়ে যাও।' একটু থেমে যোগ করল, 'পিওর ঘরে নিয়ে যাবে।'

বিস্মিত দেখাল কৃষ্ণ-নয়নাকে, বাইরে গিয়ে দুজন ভ্যাকুয়েরোকে ডেকে আনল। চেয়ারসহ বেন মারফিকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গেল ওরা। আমি ওয়াইন শেষ করে গ্লাস নামিয়ে রাখলাম।

'আশ্চর্য!' চিন্তাচ্ছন্ন গলায় বলল বেটি। 'কোনও অচেনা লোকের সাথে এত কথা বলতে আগে কখনও দেখিনি ওকে।'

'পুরোনো দিনের কথা বলছিলাম, বোধ হয় তাই,' বললাম আমি।

ওর বিমূঢ়ভাব খানিকটা কাটল। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই হবে।'

বেটি ওয়ারেন সুন্দরী, কিন্তু এখন ওর মাঝে অদ্ভুত এক শীতলতা জেগে উঠেছে যা আগে লক্ষ করিনি।

'তাই বলে পিওর কামরায়!' আবার বলল ও। 'এক গভর্নরকে ছাড়া ওই ঘরে সে আর কাউকে ঢুকতে দেয় না।'

'পিও পিকো?'

'হ্যাঁ, দুজনের বেশ ভাব...এখনও আসেন কালেভদ্রে।' এর বেশি আর কিছু বলল না বেটি।

নৈশ-আহারে চারজন বসলাম আমরা। বুড়ো বেন, বেন্ডিগো, বেটি, এবং আমি। বেন বিশেষ কথা বলছে না। শুধু একবার মুখ খুলল, 'কিছু দিন আগে গোলযোগ হয়েছিল মোরাতে। কয়েকজন ওসমান জড়িত ছিল। ওদের মধ্যে একজন মেক্সিক্যান মেয়ে বিয়ে করেছে।'

'আমার ভাই,' বললাম।

রুচি সহকারে আহার করল সে, লক্ষ করলাম, তবে সুরা ছোঁয়নি। কেবল কয়েক কাপ কড়া ব্ল্যাক কফি পান করল। আমি নিজেও তাই করলাম। কাউ

ক্যাম্পে সাঁতার কাটা যায় এমন কফিতে অভ্যস্ত, মুখ তেতো হয়ে গেল।

প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত, খাওয়ার পর নিজের কামরায় চলে গেলাম।

ঘরের একপাশে বিশাল খাট। এত পুরু আরামদায়ক সুদৃশ্য বিছানা আগে কখনও দেখিনি। শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর কাঠের গামলা ও সোরাই রাখা। টেবিলের সামনে একটা চেয়ার। পাথরের মেঝেতে পুরু গালিচা। একটা মোটে জানালা ঘরে। ভেতর দিকে আরেকটা দরজা, নিশ্চয়ই বেন মারফির ঘরের সাথে সংযোগ রক্ষা করছে।

বিছানার প্রান্তে বসে পরিস্থিতি বিচার করতে শুরু করলাম। সব কিছু কেমন যেন ওলটপালট মনে হচ্ছে। আমার প্ল্যান ছিল সোনা উদ্ধার করে দ্রুত খনি শহরে ফিরে যাব, কিন্তু এই মুহূর্তে একজন প্রৌঢ় স্প্যানিশ জমিদারের আতিথ্য গ্রহণ করেছি। ওই বুড়ো একসময় জলদস্যু ছিল।

আমার সরঞ্জাম ফিরে পেলেও সোনার পাত্তা নেই এখনও। ওদিকে, গোটা অঞ্চল শত্রুতে ছেয়ে আছে – অথচ এর জন্যে আমি দায়ী নই। একটি মেয়েকে সাহায্য করতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার শত্রুতে পরিণত করেছি কিছু লোককে।

ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, উপলব্ধি করছি আসলে আমার মাথায় ঘিলু নামক পদার্থটির বড় অভাব। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে, জুতো-মোজা খুলে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়তে শুরু করলাম।

ঠিক ওইসময়ে আচমকা বেন মারফির ঘরের দরজা খুলে গেল, একজোড়া ক্রাচে ভর দিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল বুড়ো, দুচোখে শয়তানি হাসি।

ঘুরে চেয়ারে এসে বসল। 'বাবা, আমি তোমার সাহায্য চাই।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। পরনে রাইডিং ড্রেস। একদা পোশাকটি ওর গায়ে লাগত, এখন ঢলঢল করছে।

'ভোরের আগেই বিশ মাইল পাড়ি দিতে হবে,' বলল সে। 'জুতো পরে নাও।'

বুঝলাম আজ রাতে ঘুম হারাম হলো।

'বিশ মাইল? পারবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কষ্ট হবে, তবু যাব।'

কিছুই ঢুকছে না মগজে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। 'আমাকে কী দরকার?' বললাম। 'আরও লোক আছে তোমার – নাতি বেন্ডিগো আছে।' তারপর ওর মুখ-টেপা হাসি ফিরিয়ে দিয়ে যোগ করলাম, 'এবং বেটি আছে।'

তুড়ি মেরে প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল সে। 'বুড়ো মানুষের খেয়াল। দ্যাখো, বাবা, তোমার বয়েস কম – সুস্থ সবল। জীবনে অনেক মেয়ে পাবে তুমি, কিন্তু আমার জন্যে ও-ই বোধ হয় শেষ। বলছি না যে ও আমারই, কারণ ও তা নয়, তা ছাড়া ওরও সেরকম কোনও ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না।

'দেখে আবেগপ্রবণ মনে হলেও, ও আসলে পাথর, বাছা, পাথর। আমার কথা

শোনো, প্রাচীনকালের বাঈজিরা যেমন, মনের বালাই ছিল না, শুধু আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট থাকতে হত – বেটি ওয়ারেনও সেইরকম। এদের আবেগ-উত্তাপ নেই; ঠাণ্ডা, হিসেবী। আবেগপ্রবণ মহিলারা সরল হয়, অন্যের সমস্যার সাথে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে। কিন্তু বেটি সাবধানী – নিজের লাভ ছাড়া কিস্যু বোঝে না।'

'তা হলে ঝেড়ে ফেলছ না কেন?'

'ওই যে বললাম, আমার জীবনে ওই বোধ করি শেষ রমণী। আমরা প্রায় সবাই কোনও না কোনওভাবে ভালবাসার দাম দেই, আমি দিয়েছি সম্পত্তি বন্ধক রেখে।' কঠিন চোখজোড়ায় নেকড়ের ক্রূরতা জেগে উঠল। 'এখন তোমার সহায়তায় ওদের সমস্ত পাওনা কড়াগণ্ডায় শোধ করব।'

'ব্যাপার গোলমেলে মনে হচ্ছে?'

'সে-জন্যেই তো তোমাকে বেছে নিয়েছি, বাছা। তুমি সৎ।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। ছেলেবেলায় নানা গল্প শুনেছি ওর, এখন দেখছি সব সত্যি। লোকটা আসলেই একটা বুড়ো বজ্জাত, তবু ওর প্রতি হৃদয়ের টান অনুভব করলাম। দরদে উথলে উঠল মন।

'তোমার প্ল্যান কী?' জিজ্ঞেস করলাম মৃদু সুরে।

'পশ্চিমে, পাহাড়ের এক জায়গায় যাব।'

'তুমি অসুস্থ। আমাকে বলো কী করতে হবে, করে দিচ্ছি।'

নেকড়ের হাসি হাসল বুড়ো। চোখে বজ্জাতি। 'আমি নিজেই করব।' মিলিয়ে গেল হাসি। 'বাথানটা বাঁচাতে পারলেই আমি খুশি, কারও ক্ষতি করব না।'

এক মুহূর্ত ভাবলাম, কূলকিনারা পেলাম না। অপরের আঁত বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। হতে পারে আমি ততটা চালাক-চতুর নই, কিংবা আমার ভেতরে নেকড়ে বাস করে না...সে জন্যেই। অনায়াসে অস্ত্রের মোকাবেলা করতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, অন্যের কাছে নিজের মনোভাব গোপন করার ব্যাপারে একেবারে কাঁচা।

সুতরাং, ওর মতলব বোঝার চেষ্টা করে লাভ নেই। জানি ওকে সাহায্য করব, কেননা একজন প্রায়-অথর্ব বৃদ্ধ যদি বিশ মাইল পথ পাড়ি দেওয়ার মত সাহস সঞ্চয় করে থাকতে পারে, তাকে আমার সাহায্য করা উচিত। তা ছাড়া ওর সর্বস্ব যারা অপহরণ করতে চাইছে, এই বুড়ো নেকড়ে তাদের বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছে এটাই আমি দেখতে চাই।

'বেশ,' বললাম।

'ঘোড়া নিয়ে এসো,' বলল সে, 'তাড়াতাড়ি। বহুদূরে যেতে হবে।'

আমি যখন দরজার উদ্দেশে রওনা হলাম, একটা ক্রাচের সাহায্যে আমার হাত আঁকড়ে ধরল বেন। 'জানালা,' বলল, 'আমাদের দরজার ওপর চোখ রাখা হবে।'

নিঃশব্দে জানালা খুলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অদৃশ্য হলাম। তারারা মুখ

লুকিয়েছে মেঘের কোলে। একটা পেঁচা বৃক্ষশীর্ষে বসে ডাকল এবং চুপ করল। মার্জারের মত চুপিসারে আস্তাবলে গিয়ে জিন চাপিয়ে দুটো সেরা ঘোড়া নিয়ে এলাম।

জানালা পথে কোনওমতে বের করে আনলাম বুড়ো বেনকে, অবশ্যি সেও আমাকে সাহায্য করল খানিকটা। ওকে স্যাডলে চড়া ত গিয়ে অবাক হলাম রীতিমত। হালকা শরীর, কিন্তু কাঁধে বাহুতে প্রচুর শক্তি...অনুভব করলাম স্পষ্ট।

যাত্রার শুরুতে আমি পুরোভাগে রইলাম, পরে বেন দায়িত্ব নিল। পশ্চিমে, পাহাড়ের উদ্দেশে এগিয়ে চলল সে। পেছনে অনুসরণ করছি আমি, প্রতি মুহূর্তে বুক কাঁপছে এই বুঝি পড়ে গিয়ে ব্যথা পেল বুড়ো।

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে মুখে। সামনে কালো অটল আকাশচুম্বী পাহাড়। এক নাগাড়ে পশ্চিমে এগিয়ে যাচ্ছি, কারও মুখে রা নেই, আমার চোখ সতর্কভাবে ঘুরছে বৃদ্ধের ওপর। কিন্তু সে স্থির অবিচল, এই স্বাস্থ্যে ও এত শক্তি কোথায় পেল ভাবতেই বিস্ময় বোধ করলাম।

নিকষ কালো পর্বতমালা। এখানে গবাদি পশু ঘোড়ার বসতি। কিন্তু এখন ওরা ঘুমিয়ে, দেখা পেলাম না কারও। হঠাৎ দূরের একটি বাথানের বাতি চোখে পড়তে গতি মন্থর করে সাবধানে এগিয়ে চললাম, যাতে গ্রামের ঘুম-ভাঙানো কুকুরগুলোর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। সেইসময় পশ্চিমে বাথানগুলোর চারপাশে লোকজনের ভিড়ে এ-রকম ছোটখাট অসংখ্য গ্রাম গড়ে উঠেছিল।

একটা আবছা সরু ট্রেইল ধরে আচমকা পাহাড়ের দিকে বাঁক নিলাম আমরা। মানুষ, গবাদি পশু চলাচলের ফলে জায়গায় জায়গায় মাটির রঙ ফিকে হয়ে গেছে। চড়াই বেয়ে ওঠার সময় মনে হলো সমুদ্রের ঘ্রাণ পাচ্ছি; তারপর সহসা একটা খাঁজের মাথায় উঠতে বুঝলাম আমার অনুমান অভ্রান্ত। আমাদের ডানে অগাধ অসীম জলরাশি – প্রশান্ত মহাসাগর।

বেন থেমে সমুদ্র পানে তাকাল। অন্ধকারে ওর চোখ দেখতে না পেলেও অনুভব করলাম, ওর নাড়িতে এখনও সাগরের প্রতি সুগভীর টান আছে।

এই বোধটি আমি বেশ উপলব্ধি করতে পারি কারণ আমার মাঝেও সুদূরের তৃষ্ণা রয়েছে। আমি শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাস করার মানুষ নই। মুখে বাতাসের পরশ আমার ভাল লাগে; হাওয়ায় নুয়ে-পড়া ঘাস, প্রান্তরে মধ্যাহ্নের মেঘের ছায়া আকুল করে অন্তর।

মেঘ কেটে গেছে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্রের শরীরে সর্বদাই শিহরণ বয়ে যায়, বিশেষত বাতাস পক্ষে থাকলে। সাগরের ঢেউগুলোকে যেন রুপোর জমাট ভাঁজ বলে মনে হচ্ছে। রাতের স্নিগ্ধতা নিয়ে হিমেল হাওয়া বয়ে আসছে সমুদ্রের শরীর ছুঁয়ে। এখানে রুক্ষতা নেই বললে চলে। অদ্ভুত শ্যামল এবং স্নিগ্ধ চেহারা সর্বত্র। এইরকম নিশাকালে চাঁদ ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মন হুহু করে উঠল। এই সে-ই দেশ যার জন্যে আমার পূর্বপুরুষ, আমার প্রপিতামহ, অ্যালান ওসমান একদিন পৈতৃক ভিটে ত্যাগ করেছিলেন। আমার

বাবাও পশ্চিমের আকর্ষণে আজ বিশ বছর হলো বাড়ি ছাড়া। এই বিশটি বছরে তাঁর কোনও সংবাদ পাইনি আমরা। দূরআকাশে জ্বলজ্বল করছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। বাবা কি বেঁচে আছেন? কী হয়েছে তাঁর? খবর না দেওয়ার মত মানুষ তো তিনি নন!

বেনের কথায় হঠাৎ চমক ভাঙল। 'ম্যালিবু,' নীচে, ঈষৎ পেছনে একটা জমাট কালো কাঠামো দেখিয়ে বলছে, 'র‍্যাঞ্চো ম্যালিবু।'

এক পলকে নক্ষত্রের অবস্থান দেখে নিয়ে ফের এগিয়ে চলল বেন মারফি। খাড়া এবড়োখেবড়ো ট্রেইল। চড়াই-উতরাই বেয়ে নানা কৌশলে আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে বৃদ্ধ। ওর ইচ্ছে নয়, চিনে এই জায়গায় আমি আবার কখনও ফিরে আসি।

আচমকা ডানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে একটা গিরিপথে ঢুকল, রাশ টানল অল্প কিছু দূর গিয়ে।

'নামিয়ে দাও,' বলল হাঁফাতে হাঁফাতে।

দুহাতে উঁচু করে নামালাম ওকে। একটুক্ষণ ওভাবেই, আমার কাঁধে ভর রেখে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর পিছিয়ে গেল।

'ক্রাচ লাগবে না,' বলল বেন। 'এখানে ওগুলো আমার কোনও কাজে আসবে না।' কঠোর হয়ে উঠল ওর গলা। 'এখানেই থাকো...আমি আসছি।'

হাঁটতে পারে না ও, হামাগুড়ি দিয়ে জ্যোৎস্নাহীন জমাট অন্ধকারে হারিয়ে গেল। পাহাড়ের এই পাশে চাঁদের আলো প্রবেশ করে না। দুহাতের আড়ালে দেশলাই জ্বেলে সিগার ধরালাম আমি।

এ কোনও আজব জায়গায় আমাকে নিয়ে এসেছে ও? অন্ধকারে ওভাবে একাকী গেলই-বা কেন?

অনেকক্ষণ পর দূরে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ ভেসে এল। বুঝলাম বেশ উঁচু থেকে পড়েছে – পতনের আওয়াজ পেলাম বহুক্ষণ বাদে।

বেন মারফি নির্বোধ নয়। যা করছে প্রয়োজন আছে বলেই করছে। কাজটা কী সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে; কিন্তু এই ধরনের লোককে প্রশ্ন করা চলে না, বলার হলে ও নিজেই তা বলত। অন্ধকারে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বিপদ এলে অন্তত আগাম তার আঁচ পাব।

কত সময় কাটল বোঝার জন্যে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি তারার দিকে। আমার উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে। র‍্যাঞ্চ এখান থেকে বেশ দূর, একজন অসুস্থ বৃদ্ধের পক্ষে দ্রুত ফেরা অসম্ভব। ট্রেইলেই সকাল হয়ে যেতে পারে। তেমন ঘটলে উপায়? ওর ঘরে নাস্তা নিয়ে গিয়ে ওরা যদি ওকে দেখতে না পায় তখন কী হবে? এমনও তো হতে পারে যে পথেই ওর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল, সে-ক্ষেত্রে ওরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলাম। বুড়োর এত দেরি হচ্ছে কেন? ও কি অদূরে কোথাও দাঁড়িয়ে আমার এই ছটফটানি উপভোগ করছে? নাকি দূরে

কোথাও গেছে, আঘাত পেয়েছে পড়ে গিয়ে?' কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না, বুড়োর পাত্তা নেই, ধীর লয়ে বয়ে চলে মৌন রাত।

অবশেষে, সাবধানে আরেকটা সিগার ধরিয়ে বসে পড়লাম। মানুষের জীবন বড় বিচিত্র: চায় এক হয় আর এক। এই বুড়ো জলদস্যু, যার কথা কৈশোরে শুনেছি এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের পরিচয়, তার সাথে এভাবে এখানে আসাটাই তো রীতিমত বিস্ময়কর এক ঘটনা।

একটা গাছও নেই, শুধু কালো কালো শ্যাপারাল। শ্যাপারাল, অর্থাৎ মেক্সিকো অঞ্চলের বুনো ঝোপ। কোনও কোনওটি প্রায় মানুষ সমান, তবে অধিকাংশই কোমরের চেয়ে বেশি লম্বা নয়। ঝোপের গোড়ায় পশুর গর্ত, ট্রেইল। সিংহ, কয়োট, কিংবা বনবেড়ালের চলাফেরায় সৃষ্টি হয়েছে ট্রেইলের এক গোলকধাঁধা। এই ট্রেইল অনুসরণ করতে হলে কেবলমাত্র হামাগুড়ি দিয়েই তা সম্ভব। খাঁজের মাথায় ঝোপ বিক্ষিপ্ত – পাথরধসে মাটি ক্ষয়ে গেছে।

ম্লান হয়ে আসছে তারার জ্যোতি। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল আমার, বুটের গোড়ালি দিয়ে সিগারটা মাটিতে পিষে উঠে দাঁড়ালাম।

ঘোড়াদুটো আঁধার পানে তাকিয়ে; মাথা উঁচু, কান খাড়া, নাক ফুলিয়ে গন্ধ শুঁকছে বাতাসে। ওইদিকেই গেছে বেন মারফি।

এগিয়ে গিয়ে নিচু স্বরে ডাকলাম, 'বেন?'

সাড়া নেই।

জমাট অন্ধকার। ম্যাচের কাঠি জ্বেলেও ট্র্যাক চেনা যাবে কিনা সন্দেহ। তার ওপর ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বিপজ্জনক এলাকা, আউট-লদের নিয়মিত আনাগোনা। অন্যদিকে, আঁধারে খুঁজতে গেলে ওকে হারিয়ে ফেলার ভয় আছে। বেন কোথায় এবং কতদূরে গেছে কিছুই জানি না। ও যে-পথে রওনা হয়েছিল সেইদিকে গেলে যে পাবই এমন নিশ্চয়তা নেই। ওটা আমাকে ফাঁকি দেওয়ার একটা কৌশলও হয়ে থাকতে পারে।

মাথা ব্যথা করছে, পথশ্রমের ফলে খুলির জখমটা চিনচিন শুরু করেছে আবার। ক্ষত অবশ্যি সামান্য...করোটি ছুঁয়ে কয়েক গাছি চুল উড়িয়ে নিয়ে গেছে বুলেট। তবে জায়গাটা ফুলে গেছে। প্রায় একটা মুরগির ডিমের সমান।

অপেক্ষায় একটা লাভ হয়েছে: চিন্তাভাবনার সময় পেয়েছি। বেটি ওয়ারেনকে কে বা কারা অনুসরণ করছিল, এবং কেন তা এখনও ঢোকেনি আমার মাথায়। যদিও আপাতত মনে হচ্ছে, বেন মারফির সাথে ও গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে আগ্রহী। হঠাৎ কেন এই আগ্রহ?

এইসবের বিনিময়ে কী পাচ্ছে ও? কে ওকে এই জালিয়াতির মাঝে টেনে এনেছে। নিশ্চয়ই একটা কিছু লোভ দেখানো হয়েছিল ওকে। সেটা কী?...নোয়েল ওসমান আসছে না কেন?

আমার সোনাগুলোরই-বা হাল কী?

মাকড়সার জালের মত একটার পর একটা প্রশ্ন বিব্রত করছে আমাকে।

আবার তারার পানে তাকালাম। রাত শেষ হতে চলেছে। আমরা বেশি সময় পাব না হাতে। শেষ পর্যন্ত অধীর হয়ে ঢুকে পড়লাম অন্ধকারে।

নীরব নিথর পরিবেশ।

বুড়ো একা রয়েছে। নিশ্চিত বুঝতে পারছি, কিছু একটা বিপদ হয়েছে। এভাবে হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করা উচিত হচ্ছে না।

খুঁজতে বেরোলাম।

এই খাঁজটা শুয়োরের পিঠের মত। একদিকে পাহাড় নেমে গেছে সমুদ্রে। অন্যদিকে গভীর খাদ।* এ-ধরনের খাদে সাধারণত প্রচুর ঘাস জন্মায়, তাই এই এলাকার লোকজন একে পোর্টরেরো নামে ডাকে। এখানে পথ হারানোর ভয় নেই, স্বল্প পরিসরে নড়াচড়ার অবকাশ কম।

আর এক ঘণ্টা পরেই ভোর হবে। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে এগোচ্ছি ঝোপঝাড় ভেঙে, চারপাশে তাকিয়ে দেখছি বুড়ো কোথাও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে কি না। বারদুয়েক ডাকলাম মৃদু সুরে, জবাব দিল না কেউ।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে দুভাগ হয়ে গেল ট্রেইল। একটা সোজা সামনে চলে গেছে। অন্যটা উঠে গেছে আরও উঁচু একটা খাঁজের দিকে। খাড়া চড়াই, দেখেই আমার ঘাড়ের সবগুলো লোম দাঁড়িয়ে গেল।

ঠিক করলাম একটা ঝুঁকি নেব। দুদিকে খোঁজার মত সময় নেই। পাথর আছে, সুতরাং ডাঙা থেকে দেখা যাবে না আলো। আশঙ্কার মধ্যে, সাগরের দিকটা খোলা। ঈশ্বরকে ডাকলাম যেন কেউ না থাকে ওখানে। হাঁটু গেড়ে বসে ম্যাচ ধরালাম, তারপর দুহাতে তালুর মাঝখানে আড়াল করে পরখ করলাম মাটি।

যা ভেবেছিলাম, গাছে-বসা কাঠবেড়ালীর মত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বুড়ো ওই উচ্চতর খাঁজের ট্রেইল ধরেছে। অবশ্যি একে ট্রেইল বললে বাড়িয়ে বলা হবে। কয়েকশো ফুট লম্বা খাড়া পাথুরে ঢালের গায়ে সুতোর মত একটা রাস্তা। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কতটা গেছে, তবে বেশ অনেকটা পথ। রওনা হলাম ওই খাঁজ লক্ষ্য করে। কিছু দূর যাওয়ার পর চওড়া হয়ে তারপর আবার সরু হয়ে গেল ট্রেইলটা।

আমার ঘোড়া থেকে যখন প্রায় দুশো গজ চলে এলাম, থেমে ফের ডাকলাম বেনকে। এ-বার সামনে থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ ভেসে এল। ওটা কোনও পশু না মানুষ জানি না, তবু এগিয়ে গেলাম। তারপর সহসা দেখতে পেলাম ওকে। অদূরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে, জ্ঞান নেই।

পাথরের ঘষায় হাত ছড়ে গেছে। ওর পাশেই, ট্রেইলের ওপর পড়ে আছে বিরাট একটা থলে। অনেকক্ষণ হলো অস্ত গেছে চাঁদ, এইসময়ে আলোরই

---

* বর্তমান লেক শেরউড অঞ্চল

প্রয়োজন ছিল বেশি। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে কোলে তুলে নিলাম ওকে। তারপর উবু হয়ে থলেটা তুললাম। যথেষ্ট ভারি বলে মনে হলো। কোনওমতে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে তুলে দিলাম স্যাডলে।

ওঠানোর সময়ে জ্ঞান ফিরে এল বুড়োর। 'বসে থাকতে পারবে, নাকি বেঁধে দেব?'

'বাছা, তাড়াতাড়ি চলো, আমি ঠিকই থাকব।'

আমার কব্জি চেপে ধরল, মুঠিতে এখনও ব্যথা দেওয়ার মত শক্তি ধরে বুড়ো। 'বাছা,' বলল সে, 'বাথানে কারও ঘুম ভাঙার আগেই আমাকে বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে। আমার জন্যে ভেবো না। তুমি কেবল পৌঁছে দাও।'

যেমন কথা তেমনি কাজ। ঘোড়াগুলো তৈরি হয়েই ছিল, ঝড়ের বেগে ছুটে চললাম আমরা। ছোট্ট গ্রামটা পেরোনোর সময় পেছন থেকে ডাকল কেউ, আমরা কর্ণপাত না করে প্রান্তর পেরিয়ে বাথানের দিকে ছুটে চললাম। বেন মারফি প্রৌঢ়, অসুস্থ – কিন্তু মনোবল অটুট। অনড় বসে রইল স্যাডলে।

যখন র‍্যাঞ্চে পৌঁছুলাম ফিকে আলো ফুটেছে আকাশে, বাতি জ্বলছে কোনও কোনও ভ্যাকুয়েরোর কেবিনে, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ঢুকে পড়লাম আমরা। আগের মতই জানালা পথে আমার ঘরে নিয়ে এলাম ওকে, তারপর ওর নিজের বেডরুমে পৌঁছে দিলাম। শিয়রের কাছে একটা বড় দেয়াল আলমারিতে থলেটা তালা-চাবি মেরে রাখল সে।

বাইরে এসে দ্রুত জিন খসিয়ে ঘোড়াদুটোকে কোরালে তুলে রাখলাম আমি। কাছেপিঠে কেউ নেই, এই সুযোগে মালিশ করতে লাগলাম ওদের। একটুবাদে একজন ভ্যাকুয়েরো বেরিয়ে এল।

আমাকে ওই অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়াল সে। আমি একটা হাত তুলে বললাম, 'বুয়েন্স ডায়াস, অ্যামিগো।' তারপর ইংরেজিতে যোগ করলাম, 'তোমরা নাস্তা কখন খাও?'

'পকো টিয়েমপো,' ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলে ভেতরে অদৃশ্য হলো লোকটা। তার মানে এখনও দেরি আছে। নিবিষ্ট মনে আরও কিছুক্ষণ মালিশ করলাম আমার ঘোড়াগুলোকে, তারপর দানাপানি ধরলাম মুখের সামনে।

বাসায় ফিরে দেখলাম বেটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। চোখ কুঁচকে আমার পানে তাকিয়ে বলল, 'সকাল-সকাল উঠে পড়েছ?'

'এমন কিছু নয়,' ভদ্রভাবে জবাব দিলাম। 'পাহাড়ের লোকদের ভোরে ওঠারই অভ্যেস। বাড়িতে থাকতে এতক্ষণে আমাদের দুধ দোয়ানো হয়ে যেত।'

'তোমার বাড়ি পাহাড়ে আমি জানতাম না,' বলল বেটি। কিন্তু আমি অনুভব করলাম ও মিথ্যে কথা বলছে।

'মি. মারফিকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল।

'উঠেছে?'

আমার গা ঘেঁষে সরে এল কুহকিনী। ঠোঁটে মদির হাসি, অথচ চোখ আশ্চর্য

রকমের শীতল। 'ওরিন,' আমার হাতে হাত রেখে বলল, 'প্লিজ, আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেব না। আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছিলাম তখন, পারিনি। ওই লোকগুলো ভুল বুঝত। সম্ভব হলে একদিন বলব সব–'

'দরকার নেই,' বললাম আমি। 'একটা বুড়ো মানুষের র‍্যাঞ্চ যে কেড়ে নিতে চায় তার সাথে আমার কোনও লেনদেন নেই।'

মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল ও, রক্ত সরে গেল মুখ থেকে, কালো চোখজোড়া বিষিয়ে উঠল ঘৃণায়। 'ইউ আর আ স্টুপিড ফুল!'

হিসহিস করে উঠল কুহকিনী।

সরে গেল আমার কাছ থেকে, আমিও হাঁফ ছাড়লাম। এই কৃষ্ণ-নয়নার সাথে সম্পর্ক রাখার বাসনা আমার নেই, তবে বেশ বুঝতে পারছি আমার বিপদ সবে শুরু হলো।

আধ ঘণ্টা বাদে, যখন খিদেয় নিজের জুতো চিবিয়ে খেয়ে ফেলার উপক্রম হলো, নাস্তার ডাক পড়ল। ঠিক ওইসময়ে ঘোড়ার পদশব্দ পেলাম বাইরে।

জানালা দিয়ে একনজর দেখেই পিছিয়ে এসে পিস্তল তুলে নিলাম। কারও খাওয়ার টেবিলে পিস্তল ঝুলিয়ে যাওয়ার মত বর্বর আমি নই, কিন্তু এখন পরিস্থিতি বাধ্য করছে।

বাইরে ডেটন এবং ওলিকে আসতে দেখেছি। ওদের সঙ্গে নোয়েল ওসমান। জীবনে এই প্রথম আমার কোনও আত্মীয়কে দেখে খুশি হতে পারলাম না।

আরও কয়েকজন আছে সাথে। ওদের মধ্যে একজনের মুখ ভোঁতা, ধূর্ত চেহারা। কালো চোখদুটো সাপের মত। হোলস্টার একটু নামিয়ে উরুর সাথে বাঁধা – পিস্তলবাজদের অতি পছন্দের রীতি। লোকটার হাবভাবে মনে হলো নিজেকে সে কেউকেটা বলে মনে করে।

ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখলাম বেন মারফি ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। হাসি হাসি মুখ করে তাকাল। 'বিপদ, বাছা,' বলল সে। 'তুমি আমার পাশে থাকছ তো?'

'অবশ্যই,' জবাব দিলাম। 'আমাদের দুজনের শত্রুই এক।'

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল বেন্ডিগো, আড়চোখে তাকাল আমার দিকে। মনে হলো সন্দেহ দেখলাম ওর চোখে, বোধ হয় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না আমাকে।

অন্যদের দেখা গেল দরজায়।

'এসো! এসো!' বুড়োর প্রফুল্ল চেহারা দেখে ভড়কে গেল ওরা। নিঃসন্দেহে এই বাথান দখল করতেই এখানে ওদের আগমন, কিন্তু এখন ঠাওর করতে পারছে না কী বলবে। ওদের চোখে থতমতভাবে সেটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

আমরা সবাই টেবিলে বসলাম। এই মামলায় আমার স্থান কোথায় আমি ঠিক জানি না। কেবল একটা জিনিস বুঝতে পারছি, সোনা উদ্ধারের সুরাহা হবে

না এতে। কোথায় আছে ওটা সে-ব্যাপারে কোনও সূত্র নেই আমার হাতে, এবং বেটি ওয়ারেন জানলেও আমাকে বলবে না।

আমার জীবনটাই এ-রকম: পরের ঝামেলায় জড়িয়ে যাই। কেন এমন হয় তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। হতে পারে আমি খুব সরল তাই, কিংবা সেধে অন্যের উপকার করতে চাই, অথবা সহজেই পটানো যায় আমাকে। যাই হোক না কেন, এ-মুহূর্তে আমি যে ফেঁসে গেছি তাতে ভুল নেই।

বস্তুত যে-মুহূর্তে কৃষ্ণ-নয়নার নজর পড়েছিল এই অধমের ওপর তখন থেকেই এর শুরু। তারপর ওর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হতে না হতেই জড়িয়ে পড়লাম বৃদ্ধের সঙ্গে। তবে এ-পর্যন্ত যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে নিজেকে সামলানোর ক্ষমতা এখনও ওর আছে। গতরাতের কথা আলাদা। আমি উদ্ধার না করলে এতক্ষণ হয়তো শকুনের আহার হত সে। হয়তো বলছি কারণ এ-ধরনের দৃঢ়চেতা লোক সম্বন্ধে আগাম কিছু বলা অসম্ভব।

ডেটন লোকটা তার নিজের গণ্ডিতে করিৎকর্মা লোক। আপাত দৃষ্টিতে মার্জিত মনে হলেও স্বার্থহাসিলের জন্যে বাঁকা পথ ধরতে জানে। এমনিতে ও আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, তবে এখন আমার এক জ্ঞাতি ভাইকে এর মধ্যে টেনে এনে একটু বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে।

নোয়েল ওসমান ওর দুই কদম পেছনে দাঁড়িয়ে। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম।

'এ-সব কুসঙ্গ ছেড়ে দাও,' বললাম ওকে।

ওর মুখে ভাঁজ পড়ল। 'তুমি যে নেহাত ভালমানুষ সেটা দেখেই বোঝা যায়। তোমারও বুঝি উপদেশ বিতরণের অভ্যাস?'

আমার মতই চওড়া কাঁধ। শক্তিধর। বোধ করি আমার চেয়ে বিশ পাউন্ড ওজন বেশি হবে। বিশাল বুকের ছাতি। হাতের পেশীগুলো কিলবিল করে শার্ট ছিঁড়ে বেরোতে চাইছে। মুখখানা আরেকটু বড়। ভোঁতা চোয়াল। থ্যাবড়া নাক, কোনও একসময়ে ভেঙে গিয়েছিল। তবে চেহারায় ওসমান বংশের ধারা ঠিকই বজায় আছে।

'আমি আজ পর্যন্ত কোনও আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিনি,' বললাম, 'আশা করি তুমি তা করতে বাধ্য করবে না।'

'তুমি বরং চলে যাও,' বলল নোয়েল। উদ্ধত, কিন্তু এই সুদূর ক্যালিফোর্নিয়াতে স্বগোত্রের একজনকে পেয়ে সেই সঙ্গে কৌতূহলও জেগেছে কিছুটা।

'তা হলে হিগিন্সদের সাফ করেছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল।

'শেষজন খতম হয়েছে নীলের হাতে।'

'ওরা লড়য়ে ছিল। ম্যাকলীন রকে একবার দুজন কোণঠাসা করে ফেলেছিল আমাকে। গুলি খেয়েছিলাম আমি।'

'তুমি? আমার ছোট ভাই অ্যাঞ্জেলের কাছে শুনেছি ঘটনাটা। ও-ই উদ্ধার

করেছিল তোমাকে – পিঠে করে প্রায় দশ-বারো মাইল বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

ডেটন বিরক্ত হলো। 'আমরা এখানে কাজে এসেছি, নোয়েল।'

নোয়েল পাত্তা দিল না ওকে। 'রোয মেরি হিগিন্স কবর দেওয়ার জন্যে ওদের লাশ খুঁজতে এসেছিল। ওর সঙ্গে ট্রেল্যানিদের এক মেয়েও ছিল।'

'কিন্তু ওরা আসার আগেই অ্যাঞ্জেল মাটি দিয়েছিল, তারপর ফাতেহা পাঠ করে ওদের বাড়িতে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় কবরগুলো কোথায় আছে,' বললাম আমি।

একটু থেমে যোগ করলাম, 'কবর দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কার্পণ্য করি না।'

'হ্যাঁ, মোজাভেতে তাই করেছ।' নোয়েলের ঠোঁট বেঁকে গেল।

'সময় ছিল না,' ব্যাখ্যা দিলাম, 'তা ছাড়া মেয়েলোক ছিল আমার সাথে। সময় থাকলে, নিশ্চয়ই কবর দিতাম।'

'নোয়েল...' আমাদের কথাবার্তায় ডেটন রেগে উঠল।

'বুঝেছি,' বলল নোয়েল, 'তা কাজ সারছ না কেন!'

'তোমারও একটা দায়িত্ব আছে!' গরগর করে বলল ডেটন। 'কোনওরকম গোলমাল হলে...'

'জানি,' শান্ত সুরে জবাব দিল নোয়েল, 'আমাকে সামলাতে হবে। টাকা নিয়েছি এ-জন্যে। ঠিক আছে, তুমি তোমার ফয়সালা করো, তারপর প্রয়োজন হলে আমি তো আছিই।'

'না থাকলেই খুশি হব,' আমি ফোড়ন কাটলাম। 'এ-পর্যন্ত কোনও ওসমানের কবরে ফাতেহা পড়িনি – পড়ার ইচ্ছেও নেই।'

'তোমার বাইবেলটা কোথায় বলো,' হাসল নোয়েল, 'ফাতেহা-পাঠের কাজটা না-হয় আমিই সারবক্ষণ।'

'আগে খাওয়া সেরে নাও, তারপর কথা!' মড়াখেকো শেয়ালের মত উৎফুল্ল দেখাচ্ছে বেন মারফিকে।

'দুঃখিত,' কুৎসিত হাসি হাসল ডেটন, 'সময় নেই। তোমাদেরকে এক্ষুণি র‍্যাঞ্চ ছেড়ে দিতে হবে – আমি দখল নিতে এসেছি।'

টেবিলের ও-পাশে তাকাতে বেটির দিকে নজর পড়ল আমার। বেনের হাতদুটো বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছে। যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

'মারফি! তোমার হা...হাতের এ-অবস্থা হলো কীভাবে!'

নয়

থমথমে নীরবতা নামল ঘরে। সুচ পড়লেও বুঝি শোনা যাবে। সবাই যেন নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে ভুলে গেছে। বৃদ্ধ বেন মারফির, বিছানা আর চেয়ার ছাড়া যে কিনা অন্য কোথাও যায় না, দুহাতের তালু ক্ষতবিক্ষত – ব্যাপারটা একটু আশ্চর্যের বৈকি! ব্যান্ডেজ বাঁধেনি, বস্তুত তার দরকার নেই কোনও, তবে জখমগুলো টসটস করছে রসে।

সকলের মনে, শুধু আমাকে বাদ দিয়ে, একটাই প্রশ্ন: ওর হাতের হাল অমনটা হলো কী করে? ওদের এই দিশেহারা অবস্থা এখন পুরোমাত্রায় উপভোগ করছে বুড়ো শেয়াল। বহুদিন হলো এমন মজার খোরাক পায়নি সে।

ডেটন জরিপ করছে ওকে; চোখে সন্দেহ, অবিশ্বাস। অস্বস্তিতে ছটফট করছে ওলি। নোয়েল ওসমান, ও কেবল একবার বেনের হাত ও মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর মন দিল খাওয়ায়।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল বেন। 'কিছু না, বেটি, খামোকা চিন্তা কোরো না তুমি।'

ডেটনের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে উঠেছে ও। ডেটনের হিসেব অনুযায়ী ওর এখন কাকুতি-মিনতি করার কথা। অথচ তাতো করছেই না – উল্টো আরও তরতাজা মনে হচ্ছে, র‍্যাকুনের চোখের চাইতেও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওর পোড়-খাওয়া চোখদুটো।

আহারে মশগুল বেন, কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না কেউ। আমি নিজেও ক্ষুধার্ত, তবে ঘুমের প্রয়োজনই বেশি। গেল রাতে একফোঁটা হয়নি, সত্যি বলতে কী, গত কিছু দিনের ভেতর ঘুমের ফুরসত খুব কমই পেয়েছি। এতে চোখ তো বটেই, আমার লক্ষ্যভেদের ক্ষমতাও যাবে কমে।

নাস্তা সেরে চেয়ারে হেলান দিল বেন, তারপর আয়েস করে কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'জীবনে আমি আনন্দ করার মত বিশেষ কিছু পাইনি। আর যা পেয়েছি, তার জন্যে মূল্য দিয়েছি।

'তাই বেটি যখন আমার সাথে মাখামাখি শুরু করল, তখনই জানতাম একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। টার্নার ওকে আপন ভাগনী বলে পরিচয় দিয়েছিল, অথচ ওর কোনও ভাগনী আছে বলে শুনিনি কখনও। আমার সন্দেহ হলো।

'তারপর টার্নার যখন ওর ব্যাংকটা বাঁচানোর জন্যে সাহায্য চাইল, আমি না করতে পারলাম না। ইতিপূর্বে ওর বাবা বার-দুয়েক টাকা ধার দিয়েছিলেন আমাকে, সে-দিক দিয়েও ব্যাংকের কাছে আমি ঋণী – সাহায্য করা উচিত।

'ওদিকে, বেটি তখন একরকম বলতে গেলে সারাক্ষণ আমার কাছে কাছে

থাকছে। এগিয়ে দিচ্ছে এটা-ওটা, ঘুমিয়ে গেলে চাদর টেনে দিচ্ছি গায়ে। চঞ্চল প্রজাপতির মত স্কার্ট উড়িয়ে নেচে বেড়ায় আমার সামনে দিয়ে।

'ভাবছ, বুড়ো মানুষের জন্যে এ আর এমন কী, তাই না? আমার জন্যে ওটাই কিন্তু অনেক কিছু ছিল। আমার এই বয়সে কোনও মেয়ে যে প্রেমে পড়বে না তা বোঝার মত আক্কেল আমার আছে। পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হলে তাও-বা একটা কথা ছিল, কিন্তু এখন নয়; তবু ওর সান্নিধ্য ভাল লাগত।

'সন্দেহ নেই ও খুব সুন্দরী, এবং সেটা দেখাতেও জানে। তবে সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে, সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়।'

হাসি ফুটল বুড়োর মুখে। 'বেটি থাকবে না ভাবতেই কেমন যেন লাগছে।'

'আসল কথা কী তাই বলো,' খেঁকিয়ে উঠল ডেটন। 'আজই বাড়ি ছাড়তে হবে তোমাকে।'

ডেটনের ব্যবহারে মরা মানুষেরও রাগ হবে। আমার মেজাজ চড়তে শুরু করল।

একজোড়া পিস্তলের মত বুড়োর চোখ ঘুরল ওর দিকে। 'দুঃখিত, মি.ডেটন। আমি যাচ্ছি না। আমার সম্পত্তিও পাচ্ছ না তুমি। টার্নারের জন্যে যে-টাকার জামিন হয়েছি, এর দাম তার পঞ্চাশ গুণ। এখন তো ছার, কোনও দিনই পাবে না।'

এত আচমকা ওর পরিবর্তন ঘটল যে সবাই থ হয়ে গেল। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধরা যেমন করে, একটু আগেও তেমনিভাবে এক যুবতীর প্রশংসা করছিল – অথচ এখন বুড়োর কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি সব বদলে গেছে। বিপদের গন্ধ পেল ডেটন।

'মানে! কী বলতে চাও?' সামনে ঝুঁকল ডেটন। 'ইউ ওল্ড ফুল, টাকা শোধ দেয়ার সময় হয়ে গেছে তুমি খুব ভাল করেই জানো। আমি সময় বাড়াব না। খরায় তোমার বন্ধুদের অবস্থাও কাহিল। কেউ তোমাকে টাকা দেবে না! সুতরাং, পাঁয়তারা না করে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে দাও – এক্ষুণি!'

বেন মারফি যেন ইস্পাতে গড়া। মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'কেন, মি. ডেটন – আমি তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব। পাই-পাই শোধ দেব তোমার টাকা – সুদসহ!'

টেবিলের নীচে হাত দিয়ে, দুহাঁটুর মাঝখান থেকে একটা থলে বের করে এনে আমাদের সবার চোখের সামনে রাখল সে।

'এই যে, মি. ডেটন, সব আছে... সোনায়।'

টেবিলের ওপর ও যখন থলেটা নামিয়ে রাখল আমরা সবাই মোহরের ঝনঝন শুনতে পেলাম, কিন্তু ডেটনের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। থলেটা টেনে নিয়ে খুলে ফেলল এক ঝটকায়, কাপড়ের ওপর ছড়িয়ে পড়ল স্বর্ণমুদ্রাগুলো।

বুড়োর কথাই ঠিক, ওগুলো সোনা। ডেটন আর ওলি যে টাকার কারণে একলাখ একর জমি আত্মসাৎ করার তাল করেছিল, সেটা শোধ হয়েও বাঁচবে।

না, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ডেটনের। সেটাই স্বাভাবিক। ও জানে বেন

সর্বস্বান্ত। জানে, ওকে টাকা ধার দেওয়ার মত একজনও নেই কাছেপিঠে। স্বপ্নে বহু আগে থেকেই এই বাথানের মালিক বনে গেছে সে, এবং বিক্রির জন্যে পুবে কীভাবে ফলাও করে প্রচার করবে তাও হয়তো ঠিক করে ফেলেছিল। আজকাল অনেকেই করছে এমন।

কৃষ্ণ-নয়না কুহকিনী প্রথমে সোনা, তারপর ডেটনের দিকে তাকাল। বিষ ঝরছে ওর চোখ থেকে। 'তো, মি. ডেটন,' শীতল গলায় বলল বেটি, 'আমরা তা হলে কোথায় যাব এখন?'

বেনডিগোর অবস্থাও অন্যদের মতই, হতভম্ব; শুধু নোয়েল ওসমান নির্লিপ্ত নির্বিকার। বেন মারফির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'খাওয়াটা শেষ করে গেলে আপত্তি নেই তো?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়,' বলল বুড়ো শেয়াল। 'হাজার হলেও' – ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল ওর গলা থেকে – 'তোমরা আমার মেহমান!'

টেবিলের ওপর স্বর্ণমুদ্রাগুলো ছড়িয়ে আছে। বেনডিগো যেন চোখ সরাতে পারছে না ওখান থেকে। গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে নোয়েল ওসমান। কিন্তু অন্যদের মুখ তেতো হয়ে গেছে। এদের মধ্যে সেই ভোঁতামুখো একজন। বারকয়েক কথা বলার ব্যর্থ চেষ্টা করল ডেটন, কেননা ওর বলার মত কিছুই নেই।'

সবশেষে আবার হাল ধরল বেন। 'অনেক ভদ্রতা হয়েছে,' শুকনো অথচ ধারাল স্বরে কেটে কেটে বলল, 'এখন বেরিয়ে যাও! আর, ডেটন, ফের কখনও তোমাকে যদি আমার এলাকায় দেখি, চাবকে তোমার পিঠের ছাল তুলে নেবো!'

বেত্রাহত কুকুরের মত টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল ডেটন, চেহারায় পরাজয়ের গ্লানি সুস্পষ্ট। ওলি অনুসরণ করল ওকে। ভোঁতামুখো বন্দুকবাজ এবং নোয়েল একটু সময় নিল উঠতে।

বেটির দিকে তাকাল ডেটন। 'তুমি আসছ?'

'আমাকে বোকা পেয়েছ?' মেয়েটা সুন্দরী কিন্তু জিভে ভীষণ ধার। 'তুমি একটা মাকাল ফল তাই আগেও একবার ছেড়ে গিয়েছিলাম, তুমি জোর করে ধরে এনেছ। ফের যদি সে-চেষ্টা করো, আমি নিজেই তোমাকে খুন করব!'

বুড়ো বেন মুখ টিপে হাসল, ওভার-এক্সপোজড সাদা-কালো স্থিরচিত্রের মত হয়ে গেল ডেটন, তারপর সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে নোয়েল সোনাগুলো ভরল থলেতে। 'ডেটন,' পিছু ডাক দিল সে, 'ভুল করে তোমার জিনিস ফেলে যাচ্ছ!'

দোরগোড়ায় পৌঁছে থামল নোয়েল। ঝাঁকিয়ে থলেটা ওজন করল হাতে, তারপর ঘুরে বেনের দিকে তাকাল। 'এত সোনা কোথায় পেলে তাই ভাবছি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'সবই মিনটেড, কতগুলো বেশ প্রাচীন।'

মাথায় হ্যাট চাপাল সে। 'নাহ্, ধাঁধাটার সমাধান করতে হয় দেখছি।' বলে দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুহাতে টেবিলের প্রান্ত খামচে ধরেছিল বেন। ক্ষতস্থানের মুখ ফেটে গেছে, রক্ত লেগেছে সাদা কাপড়ে।

'খুন করো!' বলল সে। 'ওসমান...খুন করো ওকে!'

কঠিন চোখে ওর পানে তাকিয়ে আমি বললাম, 'কেন, আমার কোনও বিরোধ নেই ওর সাথে।'

'গর্দভ!' চেঁচিয়ে উঠল বেন মারফি। 'আমি বলছি, খুন করো!'

কেউ নড়ল না। রাগে কালো হয়ে গেছে বেনের চেহারা, চোখজোড়া জ্বলছে ভাটার মত। আমার আশঙ্কা হলো, বুড়োর স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে।

'এই বলে রাখলাম, ওই লোক আমাদের অনেকের মৃত্যুর কারণ হবে,' বলল সে।

'আমার না,' জবাব দিলাম। 'আমার কোনও লাভ-লোকসান নেই এতে!'

এমনভাবে তাকাল বুড়ো যেন জীবনে এই প্রথম দেখছে আমাকে। 'হ্যাঁ...তাই। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

থমথম করছে ঘর। তবে আমার অনুমান, আমাদের সবার মনে একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছেঃ বেটি ওয়ারেনের কী হবে? হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল কুহকিনী, কাউকে কিছু না বলে উঠে চলে গেল ঘর থেকে। অবশ্যি ও জানে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই লেনদেন থেকে যে-টাকা ওর পাওয়ার কথা তার কানাকড়িও সে পাবে না।

বেন মারফি নির্ভীক মানুষ। এ-কারণেই মাত্র দুদিনের পরিচয়ে ওর একজন ভক্তে পরিণত হয়েছিলাম আমি। সহসা এখন ওকে অত্যন্ত নীচ শঠ খিটখিটে মেজাজের বুড়ো বলে মনে হচ্ছে। নিজের বাথান সে রক্ষা করেছে বটে, কিন্তু নোয়েল ওসমানের ব্যাপারে ওকে সর্বদা তটস্থ থাকতে হবে। যত হালকাই শোনাক, নোয়েলের কথায় প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল।

নোয়েল ওসমান বুঝেছে, আসলে যে-কোনও লোকেরই তা-ই মনে হবে, যে ওই সোনা অন্য কোনও সূত্রে এসেছে। সবাই জানে বুড়োর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। টার্নারও তাই বুঝিয়েছিল ডেটনকে। বেনের আপন নাতি, বেনডিগো, সেও তাকে দেউলিয়া বলেই বিশ্বাস করে এসেছিল এতদিন। সকলে যখন এইরকম ভাবছে, ঠিক তখন এক থলে স্বর্ণমুদ্রাসহ উদয় হলো বেন এবং তার জামিনের টাকা পরিশোধ করল।

'কোত্থেকে এল ওই সোনা?'

এই পর্যায়ে হঠাৎ আমার নিজের দিকে চোখ পড়তেই সব রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল।

কাল মাঝরাতে আমার সাথে গিয়ে ওই সোনা এনেছে বুড়ো। তারই সামান্য কিছু দিয়ে ধার শোধ করেছে। গিরিপথে আমাকে বসিয়ে রেখে আসলে সে ওই সোনার কাছেই গিয়েছিল।

এই কি সব? নাকি আছে আরও?

উঠে পড়লাম নাস্তার টেবিল থেকে, ঘরে গিয়ে আমার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কু গাইছে মন...তাড়াতাড়ি পালাতে বলছে এই বাসা থেকে। আমিও তাই চাইছি – ভীষণভাবে।

আমার পেছন পেছন বারান্দায় এল পেদ্রো। 'চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'দাদু তোমাকে ডাকছেন। বললেন, খচ্চর দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তোমাকে।'

তা অবশ্যি দিয়েছিল, আমারও দরকার ওগুলো। 'চলো,' বলে ভেতরে গেলাম ওর সাথে।

এখনও টেবিলে বসে আছে সে। তবে আমি উঠে যাওয়ার পরপরই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সব কিছু। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। এত বড় একটা বিপদ পাড়ি দিয়েছে। সব কাজ সারা, তার ওপর মধ্যরাতের পথশ্রম। ওর সাথে আমার দেখা হওয়ার পর থেকে এই প্রথম জ্বরাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে ওকে।

'যখন কাউকে ডাকার ভরসা পাচ্ছিলাম না,' বেনডিগো বিদায় নেওয়ার পর বলল বেন, 'তুমি আমাকে সাহায্য করেছ। এর প্রতিদান কোনও দিনই দেওয়া সম্ভব নয়...তবে তোমাকে বিশটা খচ্চর উপহার দেব।'

'সে তো অনেক!'

শ্রাগ করল বুড়ো। 'প্রচুর আছে আমার – প্রায় ছয় হাজার গবাদি পশু এবং হাজারখানেক ঘোড়া। তোমার কাছে আমার ঋণের তুলনায় এটা কিছুই নয়। তা ছাড়া' – মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল ওর চোখ, বেন মারফির প্রকৃত রূপ ধরা পড়ল সেখানে – 'এতে আমার রেঞ্জের বোঝা হালকা হবে। গ্রীষ্মের আগে যদি বৃষ্টি না হয়, এমনিতেই অনেক মারা যাবে।'

খচ্চরগুলোর জন্যে একটা দানপত্র লিখে সই করে ঠেলে দিল আমার দিকে। 'বেনডিগো জানে। অসুবিধে হবে না।'

তারপর চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে ও সরাসরি তাকাল আমার পানে। 'সোনা দেখে তোমার আবার লোভ জাগেনি তো?'

'ওগুলো কি আদপেই তোমার কোনও উপকারে এসেছে – এই বাথানটা বাঁচানো ছাড়া? আমার তো মনে হয় না।'

নাক ঝাড়ল বুড়ো। 'বাথানটাই-বা কম কীসে?'

'তা ঠিক। কিন্তু কজনকে বিশ্বাস করতে পারো তুমি? বিপদের সময়ে বাইরের লোকের কাছে হাত পাততে হয়েছে।'

'ওটা বোধ হয় আমার একটা বোকামিই হয়েছে।'

'সে তোমার সমস্যা।' দানপত্রটা ভাঁজ করে শার্টের পকেটে রাখলাম। 'মেয়েটাকে কী করবে?'

'পাখিকে খাঁচায় আটকানো ঠিক না, বাবা। ওকে চলে যেতে হবে। ইচ্ছে করলে আমি রাখতে পারি এখানে, যা চাইবে তা-ই দিতে পারি, কিন্তু কদিন

পরেই বাঁধা পড়েছে বলে ঘৃণা করতে শুরু করবে আমাকে। সোনার খাঁচায় আটকালে কী হবে, পাখি পালানোর চেষ্টা করবেই – ওটাই যে তার ধর্ম।'

'একেবারে পথে বসিও না – আফটার অল, মেয়েছেলে মানুষ।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল বুড়ো। 'ওসমান, তুমি খুব সেন্টিমেন্টাল। জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। তবু, আবার রিকোয়েস্ট করছি আমার এখানে থেকে যাও। ওয়ার্কিং পার্টনার করে নেব।'

'না।'

'সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিচ্ছ, বাছা। খুব কম করে হলেও দশলাখ ডলার হবে। টাকার লোভ সামলানো কী এতই সোজা?'

অনেক সময় নিয়ে ওর চোখে চোখ রাখলাম আমি, দানপত্রটা যে-পকেটে রয়েছে তার বোতাম আটকে দিলাম 'মিস্টার,' বললাম রুক্ষ স্বরে, 'ইচ্ছে করলে কাল রাতেই তা করতে পারতাম। তোমাকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বেমালুম হজম করতে পারতাম সোনাগুলো – কাকপক্ষীও টের পেত না।'

'ইচ্ছে হয়নি, একবারও?'

'না... কেন, নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছ না সেটা?'

'হুম্! আমাকে রক্ষা করেছ।' পোড়-খাওয়া চোখদুটো যাচাই করছে আমাকে। 'সে-জন্যেই তোমাকে আমার দরকার, বাবা। আমার একজন সৎ লোক চাই।'

'বেনডিগো রইল?'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল বেন মারফি। 'ও সৎ, আমার বিশ্বাস চেষ্টারও ত্রুটি করবে না। কিন্তু দুর্বল...বড় বেশি ভদ্রলোক। ও চাইবে সোজাপথে লড়তে, এবং সে-জন্যেই হারবে। কিন্তু তুমি লড়বে ওদের নিয়মে, ঠিক যেমনটা ওরা তোমার সাথে করবে সেইভাবে – এবং জিতবেও।'

'গুড-বাই, বেন মারফি,' জবাব দিলাম আমি।

দরজার কাছে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে থেমে তাকালাম ওর দিকে। হাঁটুর ওপর সেই কম্বলখানা চাপানো, একটা হাত কম্বলের তলায়। এইরকম লোকের দিকে পেছন ফেরা উচিত হবে না, ভাবলাম মনে মনে।

'আশা করি কাল রাতে সব নিয়ে এসেছ,' বললাম। 'নোয়েল ওসমান কিন্তু মসৃণ পাথরের ওপর সাপ ট্র্যাক করতে পারে।'

'তুমিও পারো,' বলল বুড়ো।

উঠোনটা খালি আছে কিনা চট করে একবার দেখে নিয়ে আমি পা রাখলাম বাইরে।

দশ

কোরালের সামনে দাঁড়িয়েছিল বেটি ওয়ারেন। সচরাচর এত সুন্দরী মহিলা দেখা যায় না। আধ-খোলা ঠোঁট আর কালো চোখের কটাক্ষে যে-কোনও পুরুষই ঘায়েল হবে।

গাঢ় লাল পোশাক পরনে, জীর্ণ কোরালের পটভূমিতে অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মনে হলো, বিশেষ কোনও মতলবেই অমন সাজ। কৌতূহল জাগল আমার।

'তুমি বলেই হলো, আর কেউ পারতো না,' বলে আমার কাঁধে হাত রাখল ও। 'বেনকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ।'

বুঝলাম এটা ভূমিকা মাত্র, তাই বললাম, 'ম্যাম, আমার তাড়া আছে।'

'তুমি খুউব অদ্ভুত মানুষ, ওরিন। আরও আগে তোমার সাথে আমার দেখা হওয়া উচিত ছিল।'

'তাতে কি যেত আসত কিছু? আমরা দুজনেই যে যার পথে চলে যেতাম।'

'কী করবে এখন?'

'অ্যারিযোনায় যাব...খনিতে।'

'ওই মরুভূমি পেরিয়ে?' ভয়ে ওর গলা কেঁপে গেল। 'খোদা, আমাকে যেন আর যেতে না হয় ওখানে!'

'কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে।'

'কোনও মেয়ে?'

এর উত্তর দেব কীভাবে যখন আমি নিজেই নিশ্চিত নই? একটা মেয়ে এসেছিল আমার জীবনে। তারপর তার আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পুবে চলে গেছে, এবং যখন ফিরে আসার কথা ছিল আসেনি। ওর কোনও চিঠিও পাইনি আমি।

ড্রুসিলা...ড্রুসিলা কেরি।

'না, ম্যাম,' বললাম। 'আমি একলা মানুষ – একলা চলতেই ভালবাসি। এর বোধ হয় শেষ হবে না।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

'কিন্তু হতে পারত, ওরিন। হতে পারত।'

ওর ডাগর কালো চোখ, ভেজা ভেজা ঠোঁটের দিকে তাকালাম। এটা কি কোনও ফাঁদ? সে-ক্ষেত্রে ঠিক পথই বেছে নিয়েছে ও।

'বাইরে থেকে তোমাকে মেয়েমানুষ বলেই মনে হয়,' বললাম।

কুঁকড়ে গেল ও, যেন চড় মেরেছি আমি। 'মানে? কী বলতে চাও?'

'দ্যাখো, মেয়েদের আমি ঠিক বুঝি না। তবে মনে হয় তোমার সব কিছুই

ওপর-ওপর। ফূর্তি করা যায় তোমার সাথে – কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে না, কখন পিঠে ছুরি মেরে বসো!'

আরক্ত হলো ওর মুখ, রাগে। এমনভাবে তাকাল যেন আমাকে চড় মারবে। ঠোঁটজোড়া চেপে বসেছে পরস্পর। পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে। শক্তহাতে টেনে রাখছে মনের রাশ। জবাব দেওয়ার আগে মুহূর্তখানেক অপেক্ষা করল।

'ভুল। আসলে আমি মনের মত মানুষ পাইনি, তাই গুটিয়ে রাখতে হয়েছে নিজেকে...সাবধান থাকতে হয়েছে। তোমার জন্যে বদলে যেতে পারি–বদলে যাব।'

'বেশ,' আচমকা বললাম আমি, 'তা হলে এখন থেকেই শুরু করা যাক। আমার সাথে অ্যারিযোনায় যাবে। আমরা যখন প্রেসকটে পৌঁছুব তখনও যদি তোমার মনোভাব এ-ই থাকে –'

আবার আমার হাত চেপে ধরল ও। এত কাছে চলে এল যে ওর কাপড়ের সুবাসে আমার মাথা ঘুরে উঠল। 'ওহ্, ওরিন, নিয়ে চলো আমাকে! সত্যি বলছি! যা বলবে তুমি তাই করব! ভালবাসা দিয়ে তোমার মন ভরিয়ে দেব!'

ঠিক এইসময় দুইজন ভ্যাকুয়েরোর তত্ত্বাবধানে আমার খচ্চরসহ বেনডিগো ফিরে এল। বেছে বেছে সেরা জিনিসগুলো নিয়ে এসেছে। প্রতিটা খচ্চরই নাদুসনুদুস...ওগুলোর জোড়া খুঁজে বের করতে গেলে বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে আমাকে। সাধারণ ক্ষুদ্রকায় স্প্যানিশ খচ্চর নয়...মিসৌরির জিনিস, রীতিমত বিরাট, সীমান্তে এর কদর আছে।

'সিনর, ইচ্ছে করলে আমাদের এখানে রেখে যেতে পারো। পরে গাড়ির ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে।'

'তা হলে তো খুব ভালই হয়।'

অস্থিরভাবে কোরালের সামনে পায়চারি করছিল বেনডিগো, আমি স্ট্যালিয়নের লাগাম ধরে বেরিয়ে আসতেই বলল, 'হুঁশিয়ার। লা নোপালেরার কাছে কয়েকজন লোক মারা গেছে – অ্যামবুশ।'

'গ্রেসিয়াস।'

যাত্রার আগমুহূর্তে কাছে সরে এল বেনডিগো। আমি তখন লাগাম গুছিয়ে নিয়ে সবে হাত বাড়িয়েছি স্যাডল হর্নের দিকে।

'ভোঁতামুখোকে মনে আছে – সকালে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওর এক পার্টনার আছে...বন্ধু। ওই লোকও মরুভূমিতে ছিল, ও তোমার সোনার খোঁজ জানে, অ্যামিগো। ওদের কাছ থেকে শুনেছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে ভ্যাকুয়েরোদের দেখাল। 'কান খোলা রাখলে কোনও গোপনই আর গোপন থাকে না, সিনর।'

'নাম জানো?'

'ডায়ার...স্যানডেম্যান ডায়ার।'

নামটা পরিচিত...চকিতে মানসপটে অনেককাল আগের একটা গান ফাইটের দৃশ্য ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। নাকে যেন পোড়া বারুদ, ভেজা চামড়ার গন্ধ পেলাম।

স্মৃতির সাথে গন্ধের এমন নিবিড় যোগাযোগ কেন? বস্তুত গন্ধই যেন খোঁচা দিয়ে স্মৃতিকে জাগ্রত করে, আর কিছু নয়। অন্তত আমার বেলায় তাই ঘটে থাকে।

'চেনো?' প্রশ্ন করল পেদ্রো।

'সম্ভবত...ঠিক মনে পড়ছে না।'

'সাবধান, সিনর। ও নাকি খুব সাংঘাতিক লোক...প্রচুর বন্ধু। উত্তর থেকে কয়েক হপ্তা আগে এসেছে – চল্লিশজন লোক আছে সঙ্গে। তারপর থেকেই লুটতরাজ শুরু হয়েছে – প্রমাণ নেই, তবে সকলের বিশ্বাস ও-ই নাটের গুরু।

'নামকরা পিস্তলবাজ। ভেরি ডেঞ্জারাস। ভার্জিনিয়া সিটিতে আমাদের এক পরিচিত লোককে খুন করেছে।'

স্যাডলে চেপে আমার বিশাল দুই থাবার দিকে তাকালাম। শক্ত, সারাজীবন লোহালক্কড় ঘেঁটে ঘেঁটে কড়া পড়ে গেছে।

'তা হোক, অ্যামিগো। আমার সোনা যদি ওর কাছেই থেকে থাকে – চাইব।'

'মরার শখ হয়েছে?'

'মরতে কেউই চায় না, বেন।'

স্ট্যালিয়নের পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে বাথান থেকে পুয়েবলোর উদ্দেশে রওনা হলাম আমি।

এখন শুধু সোনাগুলো ফেরত পাওয়া বাকি। যার সাথে দেখা করতে হবে এ-জন্যে, তার নাম স্যানডেম্যান ডায়ার। নাকি...আমি সন্দেহবাতিকে ভুগছি না তো? এটা কি একটা ফাঁদ? তথ্যটা কি ইচ্ছে করেই দেয়া হলো যেন পা দিই আমি?

সন্ধ্যে ঘুরে গেছে। বাতির আলোয় হাসছে লস এঞ্জেলেসের রাস্তা, বাড়িঘর। পুরোনো মেঠো পথে শহরে ঢুকলাম, সেরা আস্তাবলে আমার ঘোড়াটা রেখে ফিরে গেলাম পিকো হাউসে নিজের কামরায়।

লবিতে বসে কাগজ পড়ছিল এক লোক। সে-দিনের সান্ধ্য দৈনিক স্টার। ওর মাথায় চ্যাপটা ব্রিমের সাদা হ্যাট। কাগজের ওপর দিয়ে লোকটা তাকিয়েছিল আমার দিকে, কাগজ এবং হ্যাটব্রিম এই দুইয়ের মাঝে কেবল ওর চোখদুটো দেখা যাচ্ছিল।

আমার সামান্য যা কিছু মালপত্র সব ঘরেই ছিল। ওগুলোর সঙ্গে

উদ্ধারকৃত রাইফেল ও স্যাডল গিয়ারটা যোগ করলাম। এখন সোনা ফিরে পেলেই হয়।

ক্লান্ত বোধ করছি। অবসাদে শরীর ভেঙে আসছে। মনে হচ্ছে যেন নেশা করেছি আমি। আজ রাতেই স্যানডেম্যান ডায়ারকে খুঁজে বের করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি ভীষণ ক্লান্ত। আজ রাতটা অন্তত বিশ্রাম নেব, বিছানায়।

গায়ের শার্টখানা খুলে, বেসিনে পানি ভর্তি করে হাত-মুখ ধুলাম ভাল করে। তারপর চুল আঁচড়ালাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাকালাম নিজের পানে। ছোট-বড় অসংখ্য পুরোনো ক্ষতচিহ্ন শরীরে। যুদ্ধে, ইন্ডিয়ানদের সাথে বিভিন্ন সময়ে লড়াইতে যে-সব আঘাত পেয়েছি তারই কিছু নমুনা। ওই কাটা দাগগুলো আজ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমি কতটা ভাগ্যবান।

আমি অমর, কখনও মরব না এই দাবি করছি না। জীবনে বহু লোককে মরতে দেখেছি। তাই জানি মৃত্যুর ওপর কোনও মানুষেরই হাত নেই। যে-কোনও মুহূর্তে, চলাফেরায় অথবা ঘুমন্ত অবস্থায়, আমরা মারা যেতে পারি...কাল...এমনকী আজ রাতেই আমার মৃত্যু হতে পারে।

তরুণরা বিশ্বাস করতে চায় না এটা। ওরা প্রত্যেকেই মনে করে: মৃত্যু, সে অন্যদের হবে, আমার না। আমি বেঁচে থাকব।

নিজের চারপাশে যত মৃত্যুই দেখে থাকুক না কেন এ-কথাটাই সে বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি করি না; জীবনে প্রথম যে-দিন শয়তানের পরিবর্তে একজন লোককে মারা যেতে দেখেছিলাম, সে-দিন থেকেই। এক-একজনের জন্যে বিধাতাপুরুষ এক-এক রকম নিয়ম করবেন এটা আমার বিশ্বাস হয় না। কাল যখন সোনার খোঁজে বেরোব, তখনও একটা চোরাগোপ্তা বুলেট বা ছুরি আমার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব না। আবার সাহসও বলছি না একে। বড়াই করা আমার স্বভাব না, আমাকে যেতে হবে তাই যাব। নিজের দায়িত্বে-কর্তব্যে কীভাবে অবহেলা করতে হয় আমি তা শিখিনি।

বিছানায় বসে ধূলিমলিন বুটের দিকে হাত বাড়ালাম আমি। এক হাত টোয়ে অন্য হাত গোড়ালিতে। এত শ্রান্ত বোধ করছি যে খুলতেও সায় দিচ্ছে না মন। হঠাৎ বাইরে একটা পদশব্দ শুনে আরও কুঁকড়ে গেলাম ভেতরে ভেতরে।

এক মুহূর্ত পর টোকা পড়ল আমার দরজায়। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?' পিস্তল আগেই চলে এসেছে হাতে।

'আপনার চিঠি, স্যার। কাল এসেছে – আপনার হাতেই দেব বলে রেখে দিয়েছিলাম।'

'দরজার নীচ দিয়ে ঠেলে দাও।'

একটু ইতস্তত করল ক্লার্ক, তারপর চিঠিটা দেখা দিল। খামের ওপর টানাটানা পুরুষালি হস্তাক্ষর। অচেনা।

বাদামি রঙের লেফাফা। ছিঁড়তেই আরেকটা খাম বেরোল, সাথে একটা

চিরকুট। প্রথমে চিরকুটখানা পড়লাম।

মি. ওসমান,
ডিয়ার স্যার:
ক্যানিয়নের ভেতরে আপনি যে-স্টেজটা ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলেন তাহার মধ্যে আপনার এই চিঠিখানাও ছিল, আমার ঠিকানায় লেখা। দরকারি মনে করে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিলাম।

–হার্ডি

মুচকি হাসলাম ওটা পড়ে। আমার ভাষাজ্ঞান সামান্য, তবু ওই কলাইনেই দু-দুটো গুরুচণ্ডালী চোখে পড়ল। দ্বিতীয় খামটা খুলে ভেতরের চিঠিখানা বের করতেই স্থির হয়ে গেল চোখ। ড্রুসিলা লিখেছে – আমাকে।

বিছানায় বসে পড়তে শুরু করলাম আস্তে আস্তে। লেখাপড়া বিশেষ করিনি, তাই জড়ানো হাতের লেখা পড়তে বেগ পাচ্ছি।

জ্বর হয়েছিল ওর...এখন অসুস্থ...আমি কি চাই ও ফিরে আসুক? তারপর ঠিক পরের লাইনেই ও ফিরে আসছে। প্রথম স্টেজই ধরবে। প্রেসকটে দেখা করবে আমার সাথে।

চিঠিটা ভাঁজ করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। তারপর কাপড়চোপড় খুলে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিয়ে পা মেললাম সাবধানে। আমার মাপের তুলনায় বিছানাটা ছোট। পুরু নরম গদির আরামে ধীরে ধীরে ঢিল দিলাম শরীরে।

ড্রুসিলা...আমার ড্রুসিলা...ও পশ্চিমে আসছে। প্রেসকটে মিলিত হবে আমার সঙ্গে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসলাম সহসা।

ড্রুসিলা আমার সাথে দেখা করবে প্রেসকটে, আর আমি কিনা সেখানে যাচ্ছি আরেকটা মেয়েকে নিয়ে!

আবার গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। ঘুমোনোর প্রয়াস পেলাম। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও...

হঠাৎ বড় বড় হয়ে খুলে গেল আমার চোখ। কখন জানি না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অস্পষ্ট একটা কিছুর শব্দে জেগে গেছি। উঠতে গিয়ে শেষ-মুহূর্তে সামলে নিলাম নিজেকে। আমার ঘরে চোর ঢুকেছে।

দরজা বন্ধ। জানালা খুলতে বেশ আওয়াজ হয়, তবু ঢুকে পড়েছে কেউ।

লঘু একটা শব্দ জানান দিল লোকটা যে-ই হোক, আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একটা চোখ ঈষৎ ফাঁক করতে ওর কালো অবয়ব দেখতে পেলাম। ছুরির ফলায় ক্ষীণ আলোর ছটা ধরা পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়লাম আচমকা, লোকটাকে নিয়ে মাটিতে আশ্রয় নিলাম।

ভয়ে, রাগে আমার বোধশক্তি লোপ পেয়েছে। ওর বুকের ওপর বসে চেপে

ধরলাম ছুরি-ধরা কব্জি, সজোরে মোচড় দিয়ে চাড় দিলাম উলটো দিকে, ছুরিটা হাত থেকে খসে পড়ল, অপর হাতে বেল্ট আঁকড়ে ধরে শূন্যে তুললাম ওকে, তারপর আধ-পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম জানালা লক্ষ্য করে।

কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ হলো। বেরিয়ে গেল লোকটা। একটা আকাশফাটানো আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম আমি, তারপর ধপ্ করে নীচের রাস্তায় পড়ে গেল।

এ-বার চোখে পড়ল দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ঠেলে বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম আমি।

ভাঙা জানালা পথে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস আসছে হু-হু করে। নীচে, রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। উত্তেজিত কলরব শুনতে পাচ্ছি...কিন্তু আমি ঠিক করলাম কান দেব না।

একটুবাদে হলওয়েতে কয়েকজোড়া ভারি বুটের আওয়াজ উঠল, পরমুহূর্তে ঘন ঘন কিল পড়তে শুরু করল আমার দরজায়।

মাথাটা একটু তুলে আমি বললাম, 'জাহান্নামে যাও! এখানে কি শান্তিতে ঘুমোতেও পারবে না একটা লোক?'

জবাব দেওয়ার জন্যে মুখ খুলছিল একজন, কিন্তু আমি বাদ সাধলাম। 'আবার উঠতে হলে কিন্তু তোমাকেও ফেলে দেব!'

ফিসফিস গুঞ্জন, তারপর সিঁড়ির দিকে মিলিযে গেল পায়ের আওয়াজ। আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

অনেক বেলায় ভাঙল ঘুম। ভাঙা জানালা দিয়ে রোদের স্রোত বইছে ঘরে। বিছানা ছাড়লাম আমি। পুরোপুরি তন্দ্রা কাটেনি এখনও, স্খলিত পায়ে বেসিনে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় পালটে নিলাম। যখন শার্ট পরা শেষ হলো, জানালা দিয়ে তাকালাম বাইরে। এমন কিছু চোখে পড়ল না রাস্তায় যা দেখে বোঝা যায় রাতে কেউ পড়ে গিয়েছিল ওখানে।

কেবলমাত্র একটি লক্ষ্যে আমার সমস্ত চেতনা এখন তাক করা। আজ স্যানডেম্যান ডায়ারের সাথে দেখা করব।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসতে মনে হলো সবাই যেন আমার প্রতীক্ষাই করছিল। অন্তত হোটেল ম্যানেজার তো বটেই। জানালা ভাঙার জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবি করল সে।

'জানালা? কই, আমি ভাঙিনি তো! ছুঁইনি পর্যন্ত হাত দিয়ে। কাচের দাম নিতে হলে ওখান দিয়ে যে-লোকটা পড়ে গিয়েছিল তার কাছে যাও।'

প্রতিবাদ করতে যাবে, কিন্তু আমি বললাম, 'দ্যাখো, বাপু, এই সাত-সকালে মেজাজটা খারাপ করে দিও না তো। ফল কিন্তু ভাল হবে না। আশা করি কাল রাতেই বুঝতে পেরেছ সেটা। বরং আমাকেই তোমার জানানো উচিত ছিল এখানকার জানালাগুলো বড়!'

সরে পড়ার তাল করছিল ও, আমি ধাওয়া করলাম। 'আমার পেছনে সময়

নষ্ট না করে খোঁজ নাও, চোর ব্যাটা ঘরে ঢোকার চাবি পেল কোথায়। নাকি চোরদের সঙ্গে আঁতাত আছে তোমার?'

বেশ জোরেই কথাগুলো বলেছিলাম। আশপাশ থেকে আরও শ্রোতা জুটল। এইবার ভয় পেল ম্যানেজার।

'স্-স্!' বলল সে। আমার মুখ বন্ধ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। 'বাদ দিন, স্যার। আমারই ভুল।' দ্রুত ওখান থেকে পালিয়ে বাঁচল সে।

এ-বার আমার চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের উদ্দেশে ঘুরে বললাম, 'তোমরা কেউ বলতে পারো ডায়ারকে কোথায় পাব? স্যানডেম্যান ডায়ার?'

মনে হলো কেউ কিছু জানে না। এইরকম আত্মকেন্দ্রিক লোকজন বড় একটা দেখা যায় না। জানালা ভাঙার ব্যাপারে প্রত্যেকের আগ্রহ ছিল, তারপর সবাই কেমন যেন বাসি বিসকিটের মত মিইয়ে গেল। আমি ওই নামটা উচ্চারণের মিনিট দুয়েকের ভেতর ফাঁকা হয়ে গেল লবি।

বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। ধূলিধূসরিত রাস্তা, দেয়ালে সোনালি রোদ। মোড়ে থেমে প্লাযার ও-পাশে সনোরা টাউনের দিকে তাকালাম। মনে হলো ডায়ারের মত লোক থাকবে না ও-রকম জায়গায়।

হাতের কাছেই রয়েছে ক্যালে ডি লস নেগ্রোস, নিগার অ্যালি নামেই যা বেশি পরিচিত, এবং তাও-এর জুয়াখানা।

উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ ঘুরলাম শহরের এখানে-সেখানে। রাস্তা-ঘাট, দোকানের জানালা, ঘোড়ার গাড়ি এইসব দেখছি। অধিকাংশ গাড়ি স্প্রিং স্ট্রীটের ওয়াশিংটন গার্ডেনস নামে এক জায়গায় যাচ্ছে।

রাস্তার মানুষগুলো নিজেরাই এক-একটা দর্শনীয় বস্তু। বিশেষ করে খাস ক্যালিফোর্নিয়ানদের পোশাকের বাহারই আলাদা। অনেকের পরনে সিল্ক, রঙিন ক্যালিকো বা ঝালর দেয়া বাকস্কিনের আঁটসাঁট শর্ট জ্যাকেট, লিনেনের সাদা শার্ট, গলায় কালো সিল্কের রুমাল, ভেলভেট অথবা বনাতের প্যান্ট। কেউ কেউ পরেছে সুন্দরভাবে ট্যান-করা সাদা বাকস্কিন। প্রায় সবার কোমরে শোভা পাচ্ছে সিল্কের কটিবন্ধ, সাধারণত উজ্জ্বল লাল রঙের। সেরাপি বা শালেরও নানান রকমভেদ। ইন্ডিয়ান কম্বল থেকে শুরু করে উৎকৃষ্ট বনাত – কিছুই বাদ যায়নি।

এ-রকম বিচিত্র-সুন্দর পোশাকের ভিড়ে খানিকটা বিব্রত বোধ করছি আমি। দীনহীন মনে হচ্ছে নিজেকে, এমনকী এই নতুন বারো ডলারি সুটেও। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওদের কাপড়ের দাম কম করে হলেও এক হাজারটি ডলার হবে। স্যাডল আর লাগামগুলোও দেখার মত। রুপোর ছড়াছড়ি। অথচ, আমি নিশ্চিত, ওদের দুই-তৃতীয়াংশ লোক নিজেদের বাসায় খালি মেঝেতে শোয়।

ঝাঁকড়া বাবরি চুল চোখে পড়ছে মাঝে-মধ্যে। কারও কারও কাঁধ অবধি। বেণী বেঁধেছে। কিশোরদের চুল ছাঁটা, অ্যাংলো ফ্যাশনে, তবে সবার নয়।

কৃষ্ণ-নয়না সিনোরিটাদের যাতায়াত যত্রতত্র। সুদর্শন যুবাপুরুষ দেখলেই মুচকি হেসে চোখ মটকায়। ওদের ভাবভঙ্গিতে অতিবড় তপস্বীরও ধ্যান ভঙ্গ

হয়ে যাবে। নিজের দিকে তাকালেই বুঝতে পারছি সেটা। মাত্র কদিন আগেও আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ এক ভবঘুরে – অথচ এখন আমার মুঠোয় দু-দুটো মেয়ে। ওদের আগমনের সাথে সাথে বিপদও যেন ধেয়ে আসছে পঙ্গপালের মত – চারদিক থেকে।

শহরে যাকেই স্যানডেম্যান ডায়ার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি, সে-ই হুঁশিয়ার করছে আমাকে। কিন্তু ওদের কোনও কথাই আমাকে স্পর্শ করছে না। কুহকিনীকে নিয়ে প্রেসকটে গিয়ে যখন দেখব ড্রুসিলা অপেক্ষা করছে, তখন কী হবে ভাবতেই জ্বর আসছে গায়ে। ড্রুসিলা, অর্থাৎ সেই লোহিতকেশী মেয়েটা। কলর্যাডোর পাহাড়ে সোনা খুঁজতে গিয়ে যার সাথে আমার পরিচয়।*

হঠাৎ স্প্রিং স্ট্রীট থেকে মেইন স্ট্রীটে বাঁক নিল এক অশ্বারোহী। আমি দেখলাম ও সেই ভোঁতামুখো পিস্তলবাজ, বেন মারফির বাথানে গিয়েছিল। পাশ কাটিয়ে ক্যালে ডি লস নেগ্রোসের দিকে চলে গেল। দেখতে পায়নি আমাকে। নিশ্চয়ই ডায়ারের কাছেই যাচ্ছে, ভাবলাম।

কিন্তু অনুসরণ করার জন্যে যেই আমি মোড় ঘুরতে নিয়েছি পেছনে একটা পরিচিত গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। 'ডায়ারের সঙ্গে লাগতে যেও না।'

নোয়েল ওসমান।

রাস্তায় মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা। দুটো বিরাটকায় মানুষ, এবং দুজনেই সশস্ত্র।

'তোমার বন্ধুকে বলো আমার সোনা ফেরত দিতে।'

আমি ওর ভাই, অথচ নোয়েল একটু হাসল না পর্যন্ত। 'বোকামি কোরো না! এখনও যে বেঁচে আছ সে-জন্যে শোকর করো খোদার কাছে।'

'আমি সোনার খোঁজে যাচ্ছি।'

মুখ কালো করল নোয়েল। 'দ্যাখো,' রুক্ষ স্বরে বলল, 'তুমি আমার ভাই, না হলে বাধা দিতাম না। চল্লিশজন লোক আছে ডায়ারের সাথে, তা ছাড়া ও নিজেই একটা সাক্ষাৎ ইবলিস।'

'তাই বুঝি আমাকে অন্ধকারে ছোরা মারতে লোক পাঠিয়েছিল?'

ভাঁজ পড়ল ওর কপালে। 'বিশ্বাস করো, ওরিন, ওই লোককে ডায়ার পাঠায়নি। তোমাকে এতটা হালকাভাবে নেবে না ও।'

হ্যাটটা ঠেলে ভালমত মাথায় বসিয়ে দিল সে। দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ। 'এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবু বলছি। তোমার মত এত দ্রুত গোলমালে জড়িয়ে পড়তে আমি আর কাউকে দেখিনি কখনও। আমার পরামর্শ শোনো, ওই স্ট্যালিয়নে চেপে তাড়াতাড়ি পালাও। এ-শহরে অন্তত জনাচারেক লোক আছে যারা চায় তুমি মারা যাও।'

---

* দ্রষ্টব্য: স্বর্ণতৃষা।

'ডায়ারকে গিয়ে বলো আমার সোনা রেডি রাখতে।'

'ড্যাম ইট, ওর পেছনে লাগলে তোমাকে আমার সাথে লড়তে হবে। আমি ওর দলে।'

'এর আগেও বলেছি, আজ পর্যন্ত আমি কোনও আত্মীয়ের গায়ে হাত তুলিনি, কিন্তু তুমি যদি এর ভেতর নাক গলাও স্যানডেম্যান ডায়ারের সাথে তোমাকেও কবরে পাঠাব।'

'আরে পাগল, ওরা চল্লিশজন!'

'আমার তো মনে হচ্ছে ডায়ারের আত্মবিশ্বাস নেই, তাই দলবল নিয়ে চলে। যাও, নোয়েল, ওদেরকে গিয়ে বলো আমার কবর খোঁড়ার সময় গর্তটা যেন বড় করেই খোঁড়ে, যাতে অনেকের জায়গা হয়।'

ও চলে গেল। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূরের পর্বতশ্রেণীর দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম। সত্যি, আমি বোধ হয় উন্মাদ। নইলে স্যাডলে চেপে পালিয়ে যাচ্ছি না কেন? ওই সোনার বেশিটাই আমার নিজের...এবং এর ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সোনা বিক্রির টাকা দিয়েই অ্যারিযোনায় একটা বাথান গড়ার পরিকল্পনা করেছি। আমার, এবং ড্রুসিলার, ভবিষ্যৎ ওই সোনা – আদৌ যদি ভবিষ্যৎ বলে কিছু থেকে থাকে।

আমার ওপর নির্ভর করে আর যাদের সর্বনাশ হয়েছে বস্তুত তাদের অবস্থা আরও খারাপ। ওদের অংশ কম, তবু এটা হারালে ওরা একেবারে পথে বসবে।

সামনে চরম বিপদ, কিন্তু আমার মাথায় কোনও প্ল্যান আসছে না। যেমনটি বলেছি, সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে জট ছাড়ানো আমার ধাতের বাইরে। বেশ বুঝতে পারছি আমি এখন সোজা ওদের সামনে গিয়ে হাজির হব, এবং তারপর যেটা স্বাভাবিক তাই করব। কেবল একটি কারণেই দুঃখ হচ্ছে, নোয়েল ওসমান থাকবে ওখানে।

আপন জাতভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এটা মনে করতেই ব্যথা বাজছে বুকে। ওর সঙ্গে লড়তে আমার খারাপ লাগবে। হোক না ক্লিঞ্চ মাউন্টিনের ওসমান, আমার রক্তের তো। নিজেদের ভেতর খুনোখুনি করতে চাই না আমি। কিন্তু উপায় কী? নিজের পথ ও আগেই বেছে নিয়েছে, এখন আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে হবে।

এগারো

মানুষের জীবনটাই তো এক ঝোড়ো পথের অভিযাত্রা। জানি আমার জন্যে বিপদ অপেক্ষা করছে ওখানে – হয়তো-বা মৃত্যু হতে পারে – তবু সটান ঘুরে ও-দিকেই রওনা হলাম। সম্ভবত এ-ই আমার নিয়তি। কিংবা এও হতে পারে যে

এর চেয়ে ভাল কোনও পন্থা আমার জানা নেই।

মোড়ে একটু থেমে আমার সিক্স-শূটার বের করলাম, সিলিন্ডারটা ঘোরালাম বারকয়েক। চমৎকার কাজ করছে। একজন পথচারী আড়চোখে তাকাল একবার, তারপর ঝটিতি পা চালিয়ে হাওয়া হলো।

বুদ্ধিমান লোক। বিপদ দেখে এগিয়ে গেছে। তবে ওর কোনও সোনা খোয়া যায়নি, এই যা তফাৎ।

খদ্দের গিজগিজ করছে তাওয়ের আড্ডায়। সিগার, সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘর। চারিদিকে জুয়াড়িদের ফিসফাস, গ্লাসের টুংটাং আওয়াজ। আমি বারে যাওয়ার আগেই ওদের চোখে পড়ে গেলাম। মোজাভেতে আমার পিছু নিয়েছিল এমন দুজনকে দেখলাম ওখানে।

সেই ভোঁতামুখো পিস্তলবাজ দাঁড়িয়েছিল বারে, ওর চোখে চ্যালেঞ্জের আভাস দেখে আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। 'ডায়ারকে বলো,' আমি বললাম, 'ওরিন ওসমান এসেছে, তার সাথে দেখা করতে চায়।'

'ও জানে তুমি এসেছ।'

দরজার কাছাকাছি একটা টেবিলে দুজন লোক হেঁটে গিয়েছিল, তারা বসে পড়ল সেখানে। আরও দুটো লোক একটা জুয়ার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খেলা দেখছে। টেবিলের এক খেলোয়াড় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নজর বোলাল চারপাশে, তারপর হাতের তাসগুলো নামিয়ে রেখে নিজের চিপস ভাঙিয়ে নিল। সহজভাবে উঠে দাঁড়াল সে, এবং বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। চালাক লোক...পরিবেশ গরম হওয়ার আগেই সরে পড়েছে। জেনেশুনে বিপদে পড়তে চায় না।

স্যানডেম্যান ডায়ারকে কোথায় খুঁজতে হবে শেষ-পর্যন্ত কারও সেটা আমাকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল না। আমি দেখামাত্র চিনতে পারলাম ওকে।

একটা ক্ষুদ্র অ্যালকৌভে বসে আছে। মাঝারি উচ্চতা। চওড়া কাঁধ। অনেকটা ত্রিভুজাকার মুখ। উঁচু হনু। প্রথম দর্শনে মনে হবে একধরনের অদ্ভুত শিশুসুলভ সারল্য ফুটে আছে ওর মুখে, হয়তো বা কোনও দুর্ঘটনার ফলে অসময়ে চলে এসেছে এই হিংস্র পৃথিবীতে, কিন্তু আদপে তা নয়। ওই আপাতসরল চেহারার নীচে রয়েছে আরেক মুখ – সে মুখ ভয়ঙ্করের।

হাসছে ও, সহজ স্বাভাবিক বন্ধুসলভ হাসি। চকিতে শিলোহ্‌তে চলে গেল আমার মন। অনুভব করলাম চিন্তিত হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ আছে: এ লোক যখন হাসে তখনই সত্যিকার অর্থে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

'এসো, ওসমান, অনেকদিন পর দেখা, তাই না?' আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

ধরার সময়েই জানতাম কী রকম লাগবে...ঠাণ্ডা, চটচটে। ইতিপূর্বে ওর সাথে আরও একবার করমর্দন করেছি, তাই আজ এর নতুন কোনও গুরুত্ব

নেই। হাত মিলানোর ব্যাপারে ডায়ারের খ্যাতি সব সময়। ওর ছোটখাটো অথচ নির্মম ছলচাতুরীর কথা ভুললাম না আমি; তবে ডায়ারকে জানি বলেই উপলব্ধি করলাম এখন সে-সব কিছুই করবে না ও।

স্যানডেম্যান ডায়ার – সেইসময় আমরা ওকে স্যানডি বলে ডাকতাম – বাচালপ্রকৃতির লোক। আপন কণ্ঠস্বর শুনতে ভালবাসে। কেবল যে বাচাল তাই নয়, নিজের জ্ঞান জাহির করতেও পছন্দ করে, এবং অন্যের চেয়ে বেশি জ্ঞানী বলে মনে করে নিজেকে। ওই স্মিত হাসি, ওই সহজ স্বচ্ছন্দ আটপৌরে ভাবভঙ্গি দিয়ে অন্যের প্রতি – বিশ্বসংসারের প্রতি ওর অন্তরের ঘৃণাকে লুকিয়ে রাখে।

নিঃসন্দেহে ও চৌকশ লোক, এবং ধূর্ত হিংস্র পশুর মত চতুর। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহে ঈশ্বর এই চতুরতা সঞ্চার করায় ফল হয়েছে মারাত্মক। ওর প্রাণে দয়ামায়া বলে কিছু নেই, নিষ্ঠুরতাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এবং এর সাথে যোগ হয়েছে চরম স্বার্থপরতা। আমার বিশ্বাস ওর মানস গঠনে এই দুটো উপাদানই সমপরিমাণে রয়েছে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ও কথা বলতে এবং নিজের জ্ঞানগম্যি প্রকাশ করতে পছন্দ করে। কিন্তু ভয়ের ব্যাপার আচমকা বন্ধও করে দিতে পারে সেটা...একটা বাক্য মাঝপথে থামিয়ে হাসতে হাসতে খুন করতে বা করাতে পারে।

আমি স্বচোখে দেখেছি এমন ঘটনা। শিলোহ্‌তে একই ইউনিটে ছিলাম আমরা। যে-বার প্রথম এ-রকম ঘটতে দেখলাম – একজন নিরস্ত্র বন্দীকে বিনা প্ররোচনায় খুন করেছিল ও – আমি ভেবেছিলাম গোলাগুলির আওয়াজে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যুদ্ধে নিষ্ঠুরতার বড় একটা স্থান নেই। আগুনের উত্তাপে বসে যারা যুদ্ধের কথা আলোচনা করে নিষ্ঠুরতার এক মনগড়া কাহিনি রচনা করে তারা, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও তা নয়। যুদ্ধে যখন কেউ কাউকে হত্যা করে তখন তার পেছনে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কারণ থাকে খুব সামান্যই। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হয় যখন কেউ তার বন্ধুহত্যার বদলা নিতে চায়।

যুদ্ধে একজন সৈনিক হত্যা করে কেননা এটাই তার দায়িত্ব, এবং তার বাঁচার প্রয়োজন আছে বলে – খুনের নেশায় নয়। নিষ্ঠুরতার জন্যে চাই সময়, অথচ যুদ্ধে এরই বড় অভাব। কিন্তু স্যানডি ডায়ার ছিল অন্য ধাতুতে গড়া।

দ্বিতীয়বার আমরা এক মেজরকে বন্দী করলাম। চমৎকার অমায়িক ভদ্রলোক। বয়েস পঁয়ত্রিশ। বস্তুত ও ছিল আমার বন্দী। এবং সে-জন্যেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। শুরুতে ওর সাথে ডায়ার বেশ ভাল ব্যবহার করছিল দেখে আমিও আর ততটা গুরুত্ব দেইনি। বন্দীসহ মোট সাতজন ছিলাম আমরা। কিন্তু একটুবাদেই ডায়ারের কথায় অশ্লীল ইঙ্গিত ধ্বনিত হতে আমি আপত্তি জানালাম। ও পাত্তা দিল না আমাকে।

'বিয়ে করেছ, মেজর?' খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করল ডায়ার।

'হ্যাঁ।'

'ছেলে-মেয়ে?'

'ছেলে – দুটো।'

'ওরাও কি আর্মিতে?'

'ওরা এখনও বাচ্চা, স্যার। একটা বারো, অন্যটির ছয়।'

'অ...' পলক তুলল ডায়ার, শিশুসুলভ সারল্য দৃষ্টিতে, তারপর মেজরের চোখে চোখ রেখে বলল, 'না, ভাবছিলাম, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তোমার বউ এ-পর্যন্ত কবার ধর্ষিত হয়েছে?'

কথাটা এত অভাবিত ছিল যে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। তীব্র প্রতিবাদ জানালাম তিন-চারজনে মিলে। মেজরের মুখ সাদা হয়ে গেল, এক কদম আগে বেড়ে হাত তুলল মারার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে ডায়ার সরে গেছে ওর আওতার বাইরে; বলল, 'মেজর...আফসোস, তোমার জানা হবে না কোনও দিন।'

দ্রুত পিস্তল বের করতে পারে এমন অনেকের কথাই আমি শুনেছিলাম, চোখে দেখিনি। পাহাড়ে অধিকাংশ সময় আমরা রাইফেল ব্যবহার করতাম, তা ছাড়া রিভলভার তখন মাত্র কুড়ি একুশ বছর হলো বাজারে নেমেছে, আমাদের খুব কম লোকেরই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তা। সে-সময় আগুন-দাম ছিল ওই পিস্তলের, গরীব পাহাড়িয়াদের কেনার সামর্থ্য ছিল না।

ডায়ার পিস্তল বের করেই সোজা মেজরের পেটে গুলি করল।

আমি ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলাম।

নিতম্ব দিয়ে মাটিতে আছাড় খেল সে, তারপর পাগলা কুকুরের মত খেপে উঠল। বলতে কী, আমার ধারণা ও আসলে চিরকালই মানসিক বিকারগ্রস্ত। পরে, ওই ঘটনা যখন প্রচার পেল, ওর এ-রকম আরও বহু কুকীর্তির কাহিনি শুনতে পেয়েছিলাম। তো ডায়ার উঠে আমাকে তেড়ে এল, আমি আবার আঘাত করলাম।

ঘটনাটা শেষ-পর্যন্ত কোর্ট-মার্শাল অবধি গড়ায় এবং বরখাস্ত করা হয় ডায়ারকে। পরবর্তীকালে জেনেছিলাম, কুয়ানট্রিল অথবা ব্লাডি বিল অ্যানডার্সন এই দুজনের কোনও এক দলে যোগ দিয়েছে ও।

তারপর আজ এই দেখা, টেবিলের ও-পাশে আমার মুখোমুখি বসে আছে। আমার মন বলছে, সে-ই মারের কথা ও আজও ভোলেনি। ওর স্বভাব কোণঠাসা র‍্যাটলের মত। অন্ধকারে ছোবল মারবে, আচমকা।

বিবেক বলে কিছু নেই, দলের আর সবাই ওর হুকুম তামিল করে অন্ধের মত।

ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে উঠেছে আমার শরীর, আতঙ্ক বোধ করছি। এই লোকের সাথে ফের কখনও দেখা হোক তা চাইনি, অথচ সেই কিনা ওর লেজেই পা দিয়েছি। তবে, অন্যদের তুলনায়, আমার একটা বাড়তি সুবিধে আছে: জানি, ও যখন নরম সুরে কথা বলতে শুরু করেছে, হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাকে।

আরও একটি কথা জানি। আমাদের বিচ্ছেদ হওয়ার আগে দুজনের একজন

মারা যাব। এর অন্যথা হবে না।

'আমার ধারণা ছিল তুমি পুবে চলে গেছ,' বললাম আমি। একটা চেয়ার টেনে এমন এক জায়গায় বসলাম যেখানে আমার অজান্তে কেউ আমাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারবে না। 'তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি।'

'আমিও ভাবিনি, ওসমান, তুমি দেখা করতে চাইবে।'

'কেন?' সহজ গলায় বললাম আমি। 'শুনলাম তোমার এক লোক নাকি দয়া করে আমার সোনাটা মরুভূমি থেকে নিয়ে এসেছে। ভালই করেছে – নইলে আমাকে আবার অনেক ঝক্কি পোহাতে হত।'

ও হাসল, নির্ভেজাল কৌতুকের হাসি। আমার বলার ধরনে আমোদ পেয়েছে।

'হ্যাঁ, আমিও সোনার ব্যাপারে কী যেন শুনেছিলাম,' বলল ও। 'কিন্তু সে তো মরুভূমিতে পাওয়া গেছে। জানতাম না ওটা তোমার।' হাসিমুখেই বাকিটুকু শেষ করল ডায়ার। 'তা আশা করি দেখলে চিনতে পারবে?'

এতক্ষণে বুঝলাম আমাকে ঠাট্টা করছে ও। ধরে নিয়েছে কাঁচা সোনা শনাক্ত করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু ওর ধারণা ভুল। বস্তুত আমি নিজেও অল্পই জানি, মাইনারদের কথাবার্তা থেকে এক-আধটু যা শুনেছি এ-ব্যাপারে। তবে সেটা ওকে না জানালেও চলবে।

'খুউব পারব,' বললাম। 'আসলে যে-কোনও জহুরিই পারবে। সোনার সাথে অন্যান্য খনিজ পদার্থও মিশে থাকে। সব জায়গায় এর মাত্রা সমান হয় না।'

কথাটা পছন্দ হলো না ওর। আমি সোনা চিনতে পারব সে-জন্যে নয়, তথ্যটা ওর জানা নেই বলে।

শান্ত নির্বিকার চেহারায় বসে আছি, কিন্তু আমার মাথা দ্রুত কাজ করছে। এই লোক অস্থিরচিত্ত, একটুতেই খেপে ওঠে, পিস্তলে ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্র। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতিগতি তাও কিছুটা বোঝা যায়; কিন্তু ডায়ার, যদিও একটা পর্যায় অবধি ধূর্ত এবং হিসেবী, মুহূর্তের খেয়ালে একটা চরম কিছু করে বসতে বাধ্য। এটা অনেকটা ভেজা ফিউজ লাগানো ডিনামাইটের ভরসায় বসে থাকার মত ব্যাপার। ফাটবে, তবে কখন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

ওর অনুচররা সবাই ডাকাত, সুযোগসন্ধানী। রাতারাতি ধনী হতে চায়। ওকে নেতা মানে কেননা ওর সাহস ও বুদ্ধি দুই-ই আছে। এবং ঘাঁটাতে ভয় পায়। দক্ষিণে ও টাকা কামাতে এসেছে – তা সে যে-পথেই আসুক না কেন ও পরোয়া করে না। এবং ওরাও এই অভিযানে ওর সঙ্গী হয়েছে।

ওই লোকদের প্রায় সবাই নিশ্চয়ই ঝানু পিস্তলবাজ। কেউ কেউ গৃহযুদ্ধ থেকে সদ্য ফিরেছে, অন্যরা স্রেফ আউট-ল।

একজন লোককে কাবু করার সেরা উপায় হচ্ছে তাকে বেকায়দা অবস্থায় রাখা। এই নরক থেকে আমাকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হলে ওর মনোযোগ অন্যত্র –

সরিয়ে রাখতে হবে। ঠিক, এর কোনও বিকল্প নেই।

'মনে আছে, সে-বার গ্রেব্যাকসের দলের সামনে পড়েছিলাম আমরা, আউল ক্রীকে?' বললাম আমি। আড়চোখে টেবিলের ওপর দিয়ে অন্যদের এক ঝলক দেখে নিয়ে চালিয়ে গেলাম কথা। 'ওই রকমটা আর কখনও দেখিনি। এই ডায়ার ছিল আমার বাঁয়ে। তখন সন্ধ্যে, আঁধার হয়ে আসছে, আমরা ছজন ক্রীকের ওপর দিকে উঠছিলাম। নিঝুম পরিবেশ। হাঁটার সময়ে এমনকী আমাদের কাপড়ের খসখস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল।

'ডায়ার, ওর কাছে ছিল একজোড়া পালিশ-করা .৩৬ ক্যালিবার রেমিংটন সিক্স-শূটার। এ ছাড়া আমাদের সকলের কাছেই রাইফেল ছিল।

'তো নিশ্চিন্ত মনে আমরা হাঁটছি, হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। ঠিক ওইসময়ে উল্টো ধার থেকে বেরিয়ে এল একদল বিদ্রোহী, বিশজনের মত।

'আমাদের মত ওরাও হকচকিয়ে গিয়েছিল। কেবল এই ডায়ার ছাড়া, অসম্ভব দ্রুত অ্যাকশন দেখাল। ঝট করে রাইফেলটা ফেলে দিয়েই রেমিংটন দুটো বের করল...অমন ফায়ারিং দেখা যায় না। যে-কারও মনে হত ও বুঝি স্মিথ-পার্সিভ্যাল ম্যাগাযিন পিস্তল ছুঁড়ছে। চল্লিশ রাউন্ড থাকে এক-একটা ম্যাগাযিনে।

'ও স্রেফ নির্বিচারে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, আর ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল...সত্যি, আমরা কেউ একটা বুলেটও ছুঁড়িনি – শুধু ডায়ার। তিনজনকে খতম করেছিল। আহত কতজন হয়েছিল বলতে পারব না।'

মানুষ কীভাবে যেন আগেভাগেই বিপদের গন্ধ পায়। আমি আসার পর থেকে তিন মিনিটও কেটেছে কিনা সন্দেহ, অথচ বেচাকেনা পড়ে গেছে। সেই জুয়াড়িকে দিয়েই এর শুরু। তারপর কমপক্ষে তিন গণ্ডা খদ্দের সটকে পড়েছে।

তবে স্যান্ডেম্যান ডায়ারের কথা আলাদা। নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পানীয়ের ফরমাশ দিল। পুরোনো দিনের গল্প জুড়লাম আমরা। তবু প্রতিটা মুহূর্তে উপলব্ধি করছি বাইরের লোক যত কমে যাবে স্যালুনে, ততই আমার বাঁচার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। অবশ্যি সাক্ষীদের থোড়াই কেয়ার করে ডায়ার। ওর মাথায় যখন খুনের নেশা চাপে, কার সাধ্যি ওকে থামায়...উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

তা ছাড়া ও ভয়ানক ক্ষিপ্র।

পিস্তলে আমার হাত কি আরও চালু? কী জানি? এভাবে কখনও দেখিনি ব্যাপারটা। তার ওপর এতে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ হবে তা নয়। গোলাগুলি শুরু হলে ও যদি আমাকে হারাতে নাও পারে, অন্যদের হাত থেকে রেহাই পাব না আমি। শপথ করলাম, প্রয়োজন হলে ওদের সমস্ত সীসে স্পঞ্জের মত হজম করব, তবু পালের গোদাটাকে নিয়ে যাব সঙ্গে। স্যান্ডেম্যান ডায়ারের মত লোক মারা গেলে ধরিত্রীর বোঝা বরং হালকাই হবে।

সারাটা বিকেল গল্প করে কাটিয়ে দিলাম আমরা। অবশেষে একসময় উপলব্ধি করলাম আমাকে এইবার বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে হবে।

মূল প্রসঙ্গ পাড়লাম শেষ অবধি। 'তা এতকাল পর তোমাকে দেখে ভালই লাগল,' বললাম আমি। 'অনেক কথা হলো। আমাকে এ-বার উঠতে হয় – অ্যারিযোনায় যাব। তুমি সোনাগুলো ফেরত দিলেই রওনা হতে পারি।'

ঈষৎ ভাবান্তর হলো ওর চেহারায়। চোখে পাপড়ি ফেলল বারদুয়েক। আমার বক্তব্যের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াস পেল। আমরা নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় ঢিল পড়েছে অন্যদের সতর্কতায়। ছড়িয়ে পড়েছে ওরা; পানাহারে, অলস গল্পগুজবে মশগুল। ধরে নিয়েছে কোনও ঝামেলা হবে না।

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!' ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত হাসল সে। 'আমিও চাই তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও।' ঘাড় ফিরিয়ে বারটেন্ডারের দিকে তাকাল ও। 'জো, সিন্দুক খুলে সোনার থলেটা নিয়ে এসো এখানে।'

নিমেষে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

আমি যখন থলেটা হাতে নেব...কিংবা ওটা নিয়ে দোরগোড়ায় পৌঁছুব তখনই ঘটনাটা ঘটবে।

নির্ঘাত শেষের পথটিই বেছে নেবে ও। লাশটা বাইরে ফেলে দিতে সুবিধে হবে। পিঠেও গুলি করতে পারে, তবে খুব সম্ভবত দরজা পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ দেবে আমাকে, পিস্তল বের করে পিছু ডাকবে, তারপর যে-মুহূর্তে আমি ঘুরব ও গুলি করবে।

দরজার দূরত্ব হিসেব করলাম মনে মনে...বেশ কয়েক কদম ফেলতে হবে। আমি ঘরের ফাঁকা জায়গায় চলে এলেই নিশানা করার চমৎকার মওকা পেয়ে যাবে ও।

সহসা, আরেকটি বিষয় ধরতে পারলাম। জানালা গলে বিকেলের পড়ন্ত রোদ লুটিয়ে পড়েছে আমাদের মাথার ওপর। আমি যখন ঘরের মাঝখানে অথবা আরেকটু ও-পাশে গিয়ে সামনে ফিরব, সূর্যের আলো পড়বে আমার চোখে।

প্রথম থেকেই এভাবে ছক সাজিয়েছিল ও তা বলছি না, তবে ডায়ারের ক্ষেত্রে সব কিছুই সম্ভব। পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনে আমি যখন ভাবছিলাম ওর উত্তেজনা, স্বল্প হলেও, থিতিয়ে আসবে, তখন ও হয়তো সূর্য ঠিক এই অবস্থানে আসার অপেক্ষাতেই ছিল।

কারণ স্যান্ডেম্যান ডায়ার জানে পিস্তলে আমার হাত পাকা।

উচ্চস্বরে বলেনি সে, কাছাকাছি যে-কজন আছে তারা ছাড়া ওর কথা শুনতে পায়নি কেউ। কামরার অপরদিকের অলস আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। জো সিন্দুকের ডালা বন্ধ করল, আমি শুনতে পেলাম। পিছিয়ে এসে সোনার থলেটা ডায়ারের সামনে টেবিলে রাখল সে, তারপর বারে ফিরে গেল।

এখন আর অযথা সময় অপচয়ের কোনও মানে হয় না। টেবিলের ওপর

দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমি বললাম, 'থ্যাংকস, সান্ডি,' এবং তুলে নিলাম থলেটা...বাঁ-হাতে।

ডায়ার হাসছে, ম্লান আলোয় দেখলাম নাচছে ওর চোখ। জানি, আমার বাঁ-হাতে তুলে নেওয়ার ব্যাপারটা ওর নজর এড়ায়নি। টেবিলের কিনারে-রাখা ডান হাতটাও চোখে পড়েছে।

উঠে দাঁড়ালাম আমি।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, ওর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। ওর তরফ থেকে একটি শব্দ, বা সামান্যতম ইশারায় ঝাঁঝরা করে দেবে আমাকে।

হঠাৎ, ঘুরেই হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম মারাত্মক ভুল করেছি আমি। ভেবেছিলাম ওর সাথে হাঁটতে হাঁটতে দরজা অবধি যাব। কিন্তু হাত এগিয়ে দিয়েই বুঝলাম ঠিক এই সময়টির জন্যেই অপেক্ষা করছিল ও। করমর্দনের সময়ে আমাকে খুন করতে পারলে ওর বিকৃত রুচি পরিতৃপ্ত হবে।

হাসি-হাসি মুখ করে উঠে দাঁড়াল সে, করমর্দনের জন্যে হাত এগিয়ে দিল, মাঝপথে এসে আচমকা নেমে গেল পিস্তলের দিকে।

আমার হাত সামনে বাড়ানো...পিস্তল থেকে বহুদূরে। তাই ওই অবস্থাতেই ওর বুকে ঘুসি মারার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও চট করে পিছিয়ে গেল, বাধা পেল চেয়ারের কানায়।

মুহূর্তের জন্যে বেসামাল হয়ে পড়ল ডায়ার। আমি বাঁ-হাতে মুখ ঢাকলাম, ঝাঁপিয়ে পড়লাম জানালার ওপর, কাচ ভেঙে বেরিয়ে এলাম গলিতে।

পড়ার সময়েই পিস্তলের বাঁটে চলে গিয়েছিল হাত, ডিগবাজি খেয়ে যখন উঠলাম পিস্তল খাপমুক্ত হয়েছে, হ্যামার টেনে দিয়েছি পেছনে।

ইতিমধ্যে ডায়ারও চলে এসেছে জানালার কাছে, সূর্যকিরণে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে। আগুন ঝরাল ওর পিস্তল। কিন্তু আমি উঠে দাঁড়াব আশা করে ওপর দিকে নিশানা করেছিল। প্রায় একই সময়ে ট্রিগারে টান দিলাম আমি, পরপর দুবার। বিকট শব্দে আমার কানে তালা লাগল। হয়েছে দুটো গুলি কিন্তু শোনাল একটার মত।

ও এমনভাবে খাবি খেল যেন কেউ ওকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তারপর আবার কেশে উঠল ওর পিস্তল, বাতাসে শিস্ কেটে বেরিয়ে গেল নির্জীব বুলেট।

ঝট করে উঠে দাঁড়ালাম আমি, দুই পা ফাঁক করে আরও দুটো গুলি করলাম ওর গায়ে। এই একটিমাত্র লোকের মৃত্যু আমি অন্তর থেকে কামনা করি।

ঘরের ভেতর কয়েক জোড়া ছুটন্ত পদশব্দ উঠল, পরক্ষণে বাজখাঁই গলায় ওদের ধমক লাগাল একজন।

'ওকে যেতে দাও!' বক্তা নোয়েল ওসমান।

উবু হয়ে মাটি থেকে সোনার থলেটা কুড়িয়ে নিলাম আমি। তারপর জানালা দিয়ে গলা বাড়ালাম। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে আছে ডায়ার। চোখ উল্টে

গেছে, মণি অসীমলোকে নিবদ্ধ। অন্যরা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, উপলব্ধি করছে এখন আর লড়াই করার কোনও অর্থ হয় না।

'আমি চলে যাচ্ছি। তুমি আসবে?' নোয়েলকে জিজ্ঞেস করলাম।

'জাহান্নামে যাও,' ও হেসে জবাব দিল।

বারো

মানুষ অনেক সময় নির্বোধের মত কাজ করে বসে; অথচ পরিণামে ওটাই বাঁচিয়ে দেয় তাকে।

আমি যখন সবগুলো ঘোড়া জড়ো করে শহরের বাইরে রওনা হয়েছিলাম, চলে যাচ্ছি বলে এতটুকু খেদ ছিল না মনে। শুধু একটা জিনিসই পীড়া দিচ্ছিল। এতদূর এসেও মহাসাগর দেখা হয়নি।

আমার ট্রেইল থেকে খুব একটা দূরে নয় ওটা। তাই লা নোপালেরা পেরিয়ে পশ্চিমে যাওয়ার সময় আচমকা মত পরিবর্তন করলাম। মারফির বাথানে রাত কাটানোর আদৌ কোনও ইচ্ছে নেই আমার, কাজেই স্যান্তা মনিকায় গিয়ে সমুদ্রটা একবার দেখলে ক্ষতি কী?

পাছে আবার কখনও এ-দিকে আসা না হয়, তাই হঠাৎ করেই এই সিদ্ধান্ত নিলাম। ওইরকম খেয়াল বহুক্ষেত্রে মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দেয়, যেমন সেই সন্ধ্যেয় আমাকে রক্ষা করল।

ঘুরে, আমি স্যান ভিনসেনতি স্প্রিংয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। পুরোনো এবং নতুন, স্যান্তা মনিকার দুটো শহরই এই ঝরনা থেকে পানি নেয়। অন্তত আমি তাই শুনেছি। অনেক দূরের যাত্রা; অবিরাম চলা সত্ত্বেও সমুদ্রের ডাক যখন কানে এল তখন প্রায় দুপুর রাত।

অদূরে পাহাড়ের খাড়া ঢালে একটা র‍্যাঞ্চ হাউস। সমুদ্র ওখান থেকে আধ-মাইলটাক হবে। কিন্তু আমি লাজুক প্রকৃতির মানুষ, সুতরাং পাশ কাটিয়ে গেলাম। তবে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল ওদের কুকুর।

আকাশে আজ তারার সাম্রাজ্য। সমুদ্রের তাজা নির্মল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। ট্রেইলের শেষ-প্রান্তে কয়েক সারি গাছ। বড় বড় প্রাচীন সাইক্যামোর এবং জংলা ঝোপ। বেশ কয়েকটা ক্যাম্পফায়ারের আলো চোখে পড়ল। উত্তরে বাঁক নিলাম আমি। কূল ধরে অগ্রসর হয়ে অন্য একটা ক্যানিয়নে ঢুকলাম। প্রায় সিকি মাইল যাওয়ার পর এক জায়গায় কতগুলো ঝোপ দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলাম সে-দিকে। কোনও জনমনিষ্যি নেই কাছেপিঠে। ঘোড়া থেকে নেমে শুয়ে পড়লাম আমি।

ভাগ্যিস কেউ পিছু নেয়নি। মহুয়া-মত্ত ভালুকের মত অনেক বেলা অবধি

ঘুমোলাম। মুখে কড়া রোদ পড়তে ঘুম ভাঙল।

কাছেই ঘেসো জমি, ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিলাম সেখানে। যখন বুঝলাম ওদের পেট ভরেছে, স্যাডলে চেপে সমুদ্র তীর ধরে শহরে ঢুকলাম।

ঘোড়াগুলো আস্তাবলে উঠিয়ে স্যান্তা মনিকা হোটেলের একটা কামরা ভাড়া করলাম আমি। হোটেল ম্যানেজারের নাম জনসন। ওকে অনুরোধ করলাম সোনাগুলো নিয়ে নগদ টাকা দিতে।

একবাক্যে রাজি হলো সে। আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে তো ভালমানুষ বলেই মনে হচ্ছে। সঙ্গে এত টাকা – আমি হলে কিন্তু সাবধানে চলাফেরা করতাম। এখানে চোরের বেজায় উৎপাত।'

'ধন্যবাদ,' বললাম।

শহরে একটা গোসলখানা আছে। পয়সার বিনিময়ে স্নান করে লোকজন। মনে হলো গোসল করলে ঝরঝরে বোধ করব। চৌবাচ্চার পাশেই এমন জায়গায় আমার স্যাডলব্যাগ আর গান বেল্ট রাখলাম যেখানে হাত বাড়ালেই নাগাল পাব। যে-সব স্নানার্থী আমার পরে এল পিস্তলটা দেখেই সরে পড়ল তারা। ওদের অধিকাংশই বৃদ্ধ, বাতের ব্যথা দূর করার জন্যে গরম পানিতে গোসল করে।

ভোজনপর্ব সেরে শহর ঘুরতে বেরোলাম। স্কুল, চার্চ, এবং রেলরাস্তা দেখলাম। বছরখানেক হলো ট্রেন যোগাযোগ চালু হয়েছে এখানে। কেউ কেউ বলছে পশ্চিম উপকূলে এটাই হবে বৃহত্তম বন্দর...অন্তত, স্যান ফ্র্যান্সিসকোর দক্ষিণে সবচেয়ে বড় তো বটেই।

ঘোড়াগুলো যথাস্থানে আছে কিনা পরখ করার উদ্দেশে আস্তাবলে গেলাম দুবার। লিভারি স্ট্যাবলের দরজায় দাঁড়িয়ে শহরটা জরিপ করলাম। দেখছি কেউ আমাকে অনুসরণ করেছে কি না।

সে-রাতে হোটেলের বিছানায় তোফা ঘুম হলো। এমনিতেই পরিশ্রান্ত, শুয়ে পড়লাম টানটান হয়ে। চাদরের নীচ দিয়ে আমার পা বেরিয়ে গেল, তা সত্ত্বেও এতটুকু হানি হলো না আরামের। বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করছি, কেউ জানে না আমি কোথায় রয়েছি। তবে সোনার থলে আর সিক্স-শূটারটা চাদরের তলায় কোলের কাছে রাখতে ভুললাম না। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই।

প্রায় সব মানুষকেই একটা পর্যায় পর্যন্ত বিশ্বাস করা চলে। তবে আমার মতে সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে তাদের সামনে লোভের বস্তু না রাখা। যেমন সেই কৃষ্ণ-নয়না কুহকিনী...ও লোভের কারবারী। কুহকিনী ধারেকাছে থাকার অর্থ, লোভলালসা এগুলোও আছে সেখানে।

দুপুর নাগাদ আমি মারফির বাথানে হাজির হলাম।

জানতাম, ওরা আমাকে এই অসময়ে আশা করবে না। গেল যাত্রায় লক্ষ করেছি ডিনারের সময় যখন সবাই ভেতরে খেতে যায় ওরা, এবং ঠিক তার পরে যে-সময়ে বিশ্রাম নেয়, মৃত্যুপুরীর মত নীরব হয়ে পড়ে জায়গাটা।

ওই শব্দটা মনে আসতেই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। মৃত্যু স্বয়ং আজকাল সর্বক্ষণ আমার সাথে সাথে ছায়ার মত ঘুরছে। কাজেই ওর কথা ভেবে আমার মনে সেটা আরও বেশি করে জাঁকিয়ে বসার সুযোগ দেয়া উচিত নয়।

কেউ যখন অনেক দেশ ঘোরে, যেমন আমি ঘুরেছি, তার মনে সেইসব জায়গার প্রতি মায়া জন্মে যায়। এবং সে যেখানেই যায় জায়গাটা চেনার জন্যে আশপাশ ভাল করে দেখে নেয়। তাই আমারও জানা ছিল কারও চোখে না পড়ে কীভাবে পৌঁছুতে হবে বাথানে। বাসার ভেতর থেকে কেউ বেরোনোর আগেই র‍্যাঞ্চের উঠোনে ঢুকে খচ্চরগুলোর গলায় দড়ি আমি পরাতে শুরু করলাম।

প্রথম যে-লোকটা বেরিয়ে এল তার মাথায় সাদা হ্যাট, এক চোখে কালো পট্টি।

'হাউডি,' বলল সে। 'তুমি-ই বোধ হয় ওরিন ওসমান।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'পুয়েবলোতে বেশ শোরগোল তুলেছ তুমি। সবাই ভাবছে হঠাৎ করে কোথায় লাপাত্তা হলে।'

'আমি ভবঘুরে মানুষ, ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

ও একদৃষ্টে আমার শক্তিমত্তা বোঝার চেষ্টা করছে। আমিও খচ্চরগুলো জড়ো করার সময়ে পেছন ফিরলাম না ওর দিকে, হাবভাবেও প্রকাশ পেতে দিলাম না যে আমি ও-রকম একটা কিছু ভাবছি। প্রতিমুহূর্তে নিজের সঙ্গে তর্ক করছি, ভেতরে গিয়ে বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব কি না।

কালো-পট্টি একটা হাত ভাঙা, একটু যেন খোঁড়াচ্ছেও। গাল কাটা, বোধ হয় কোনও ভাঙা কাচের টুকরো লেগে। দেখে মনে হচ্ছে কোনও জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল ওকে, তারপর বারান্দার ছাদ থেকে গড়িয়ে সদর রাস্তায় পড়েছে।

যখন কাজ সারা হলো, খচ্চরগুলো বাসার সামনে নিয়ে গিয়ে আমি কালো-পট্টির পানে তাকালাম।

'চলো,' বললাম ওকে, 'ভেতরে যাই – ওল্ড বেনের সাথে দেখা করে আসি।'

'আমার সাথে দেখা হয়েছে,' গোমড়া মুখে বলল সে। 'আমাকে ও চেনে।'

'যা বলছি করো,' আদেশ করলাম।

অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটল ওর চেহারায়, তবে নির্দেশ পালন করল। আমার আগে আগে ঢুকল বাসার ভেতরে। আমার সন্দিগ্ধ মনই হয়তো-বা এর জন্যে দায়ী, কিন্তু মনে হলো আমি এসেছি টের পেয়েই যেন কম্বল সামলাতে বেশিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বেন।

কৃষ্ণ-নয়না তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে রাইডিং ড্রেস। পেছনে একটি ইন্ডিয়ান মেয়ে ওর মোট বইছে।

'আমি তা হলে আসি, বেন। এরপর যদি আমাকে তোমার দরকার হয়

অ্যারিযোনায় এসো।'

ওর কঠিন পোড়-খাওয়া চোখদুটো জরিপ করছে আমাকে, কৌতুকের সাথে একধরনের শ্রদ্ধাবোধ মিশে আছে সেখানে। 'তুমি স্যান্ডেম্যান ডায়ারকে মেরেছ,' বলল সে, 'অথচ কেউ ভাবতেই পারেনি এটা সম্ভব।'

'প্রতিটা লোকই জন্মের সময় মৃত্যুকে সাথে নিয়ে আসে,' বললাম আমি। 'আসলে এটা নিছক সময়ের ব্যাপার।'

বেটি দাঁড়িয়েছিল ওখানে, আমি লক্ষ করলাম ওর চোখ স্বাভাবিকের তুলনায় বড় দেখাচ্ছে। গালদুটো বিবর্ণ। একটু অবাক হলাম, সর্বদা সেজেগুজে থাকা ওর অভ্যেস, তুচ্ছ কারণে এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়।

'ঠিক আছে, বাছা!' বলল বেন। 'তোমার যাত্রা শুভ হোক। আমার জন্যে অনেক করেছ তুমি। ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে আর খাটো করব না – কিন্তু এ-রকম নিঃস্বার্থভাবে কেউ সাহায্য করবে না। আমি কিছুই দিতে পারলাম না তোমাকে।'

'কেন লজ্জা দিচ্ছ?' হাসলাম আমি। 'ওই খচ্চরগুলো কিন্তু অন্য কথা বলছে।'

বেটির দিকে চোখের কোণে তাকিয়ে বললাম, 'রেডি?'

'তুমি এগোও...আমি বেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছি।'

'আচ্ছা,' বলে আমি দরজার দিকে ঘুরলাম।

অসম্ভব অধৈর্য হয়ে উঠেছিল বুড়ো। আমাকে খুন করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। গত কয়েক হপ্তা ধরে বিপদের আশঙ্কায় সারাক্ষণ সজাগ ছিল আমার সমস্ত স্নায়ু। এই একটিমাত্র সময় যখন বেখেয়াল হয়েছিলাম। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো বুড়ো।

মনে হলো শিস্ কেটে একটা কিছু বেরিয়ে গেল আমার কানের পাশ দিয়ে, বদ্ধ ঘরে বিকট শোনাল পিস্তলের আওয়াজ, কপাটের কব্জায় ধাতব পদার্থের সংঘর্ষ হলো। বলতে লজ্জা নেই দরজা দিয়ে ঝেড়ে বাইরে দৌড় দিলাম আমি যেন আমার পেছনের কাপড়ে আগুন লেগেছে।

আবার গুলি করল বুড়ো। একটু আগেই আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে বাতাস কাটল বুলেটটা। পরক্ষণে অকথ্য ভাষায় গালাগালির ঝড় বইল। আমার জীবনে এমন জঘন্য গালি কখনও শুনিনি।

বাড়ির ও-পাশ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল কালো-পট্টি, হাতে রাইফেল। কিন্তু যখন বারান্দার কাছে পৌঁছুল, আমার সিক্স-শূটার তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'রাইফেলটা ফেলবে, নাকি তোমাকে শকুন দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব?'

যুক্তিবান মানুষ, আমার কথার গুরুত্ব বুঝল। রাইফেলটা এমনভাবে ফেলে দিল যেন ওটা তাতানো লোহা।

'লস এঞ্জেলেস এখান থেকে বেশ দূর,' বললাম ওকে। 'হেঁটে আজকের

মধ্যেই যদি পৌঁছুতে চাও, এখুনি রওনা হয়ে যাও।'

প্রায় কাছাকাছি সময়ে নির্লিপ্ত চেহারায় বেটি বেরিয়ে এল যেন কিছুই ঘটেনি। আমি স্যাডলে চড়তে সাহায্য করলাম ওকে। ঘোড়াগুলোকে দরজা এবং আমার মাঝখানে রেখেছি। ভেতরের ওই বজ্জাত বুড়ো ভীষণ চালু, সব সময় মনে রাখবে তার লুণ্ঠিত সোনার হদিস যদি কেউ জানে তো সে ওরিন উইলিয়ম ওসমান নামে টেনেসির এক লোক।

বাথান ছেড়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। পেছন থেকে ভেসে আসছে বুড়োর হাঁকডাক। কালো-পট্টি বা আর কারও খোঁজ করছে, কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ আসবে না – গোলাগুলিকে ওদের দারুণ ভয়।

ট্রেইলে ওঠার পর আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠল মন। কুহকিনীর সান্নিধ্য উপভোগ করছি পুরোপুরি। পাশাপাশি গল্প করতে করতে যাচ্ছি আমরা। খচ্চরের পাল আমাদের সামনে রয়েছে।

এমন নয় যে আমি মেয়ে পটাতে পটু। পাহাড়ে, যেখানে আমার বাড়ি, বিশেষ আড্ডা দিতাম না আমি, নাচের সময় জোড়া মিলত না কারণ আমি খুব লম্বা; তবে মাঝরাতে আমার বন্ধুরা যখন বান্ধবীদের নিয়ে ঘুরতে বেরোত, সাধারণত ওদের কাছে-কাছেই থাকতাম।

তবে বেটির ব্যাপার আলাদা, ওর সাথে কথা বলা সোজা। জানে পুরুষের পেটের কথা কীভাবে টেনে বের করতে হয়। অল্পক্ষণের ভেতর আমার কাছ থেকে আমাদের পাহাড়ের বাড়ি, মা, ও'নীল, অ্যানজেল, আর হিগিন্সদের সঙ্গে আমাদের বিবাদের কথা একটু-একটু করে জেনে নিল। এমনকী ট্রেল্যনি মেয়েদের প্রসঙ্গও বাদ গেল না।

ওই ট্রেল্যনি মেয়েরা সর্বদা আমাদের আশপাশে ঘুরঘুর করত। বেপরোয়া বন্য বলে খানিকটা দুর্নাম ছিল ওদের। ছেলেরা প্রায় সবাই পাগল ছিল ওদের জন্যে। মোট আটজন ট্রেল্যনি মেয়ে ছিল, প্রত্যেকেই সুন্দরী; এবং সবাই যখন ঝগড়া-বিবাদে ব্যস্ত, কারও সঙ্গে কলহ ছিল না ওদের।

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে ব্যাক ট্রেইলের প্রতি নজর রাখছি আমি। বন্ধুর এলাকায় যে-লোকের চলাফেরা তাকে পেছনের পথ জরিপ করতে হয়। নইলে কোনও দিন যদি ওই পথে ফিরতে হয় তাকে, দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উল্টো দিক থেকে একই ট্রেইল সম্পূর্ণ বিপরীত দেখায়।

প্রতিটা গাছ, পাহাড়-পর্বতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এবং এদের প্রত্যেকেরই আবার নানান চেহারা: এক-এক জায়গা থেকে এক-এক রকম মনে হয়। তাই কাউকে যদি কোনও জায়গার চরিত্র ভালমত চিনতে হয় পেছনে না তাকিয়ে উপায় নেই তার। এবং এতে পথিকের আয়ুও যায় অনেক বেড়ে। যেমন এখন।

পেছনে ধুলো উড়ছে। খুব বেশি নয়...তবু ধুলো। অনুমান করলাম চার-পাঁচজন অশ্বারোহী হবে। ধীর কদমে আসছে, চায় না ধুলো দেখে আর কেউ

টের পাক ওদের উপস্থিতি।

একবারও পেছনে তাকায়নি বেটি ওয়ারেন। চিন্তামগ্ন।

'উচিত শিক্ষা হবে ওর,' বলল বেটি। 'ও তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

'কে?'

'বেন মারফি। ও জানে একমাত্র তুমিই ওর সোনার হদিস জানো। নিশ্চয়ই আরও অনেক আছে ওখানে, তা না হলে তোমাকে মেরে ফেলতে চাইত না।'

'কী জানি – থাকতে পারে।'

'কাল ট্রেইলে লোক রেখেছিল সে। ওরা সারাদিন তোমার জন্যে ওত পেতে বসেছিল।'

'স্বাভাবিক। ওর বয়েস হয়েছে – এখন সব হারানোর ঝুঁকি নিতে পারে না।'

'ও যখন জানবে, একতিল সোনাও নেই তখন ওর মুখের অবস্থা কী হবে আমার দেখতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।'

এইবার খুঁটিয়ে দেখলাম ওকে। এতক্ষণ কথায় ভুলিয়ে রেখে আমাকে বাগে আনতে চাইছিল। কামনা করলাম সেই বাইবেলটা যেন আমার স্যাডলব্যাগে এখনও থেকে থাকে। আজ রাতে শোয়ার সময় বালিশের তলায় রাখতে হবে ওটা।

'আরও না থেকেই যায় না,' বলল ও। 'পানামার উপকূলে বেন একবার একটা জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। পেরু থেকে সোনা আসছিল ওই জাহাজে করে। ওগুলো কীভাবে পাড়ে এনে এক ক্যানিয়নের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে সব বলেছে ও। কাজটা শেষ করতে পুরো এক হপ্তা লেগেছিল ওদের...অবশ্যই রাতের বেলায় করেছিল সব কিছু।'

'তা হলে এখনও থাকার কথা,' বললাম আমি।

'ওগুলো নিয়ে আমরা যে-দিকে দুচোখ যায় চলে যেতে পারব,' বলল বেটি। 'নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস...যেখানে খুশি। তুমিও পৃথিবীর সেরা বাথানটা কিনতে পারবে – ভাল ভাল ঘোড়া, গরু, মহিষ থাকবে সেখানে।'

'নিশ্চয়ই পারব।'

'তুমি জানো ওটা কোথায়...তোমার খচ্চরগুলোই বইতে পারবে।'

'ও বেচারা একে বুড়ো মানুষ, তায় পঙ্গু। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, ওই সোনা ওর প্রয়োজন হতে পারে। ওর না লাগলেও, হয়তো বেন্ডিগোর লাগবে।'

বেটি ঝট করে স্যাডলের ওপর ঘুরে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন কোনও বদ্ধ উন্মাদকে দেখছে।

'মানে? তুমি ওখানে যাচ্ছ না!'

'না, ম্যাম। ওই বুড়ো মারা যাওয়ার পর যদি কখনও এ-দিকে আসি, এবং বুঝতে পারি ওগুলো সে নেয়নি – তখন চিন্তাভাবনা করে দেখব।'

'কেন, ও তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল! অথচ ওর জন্যে তুমি কী না করেছ!'

'ওটাই যে ওর স্বভাব, বেটি। প্রথম থেকেই আমি কিছুটা আঁচ করেছিলাম। জীবনে কোনও বন্ধু পায়নি ও...যারাই কাছে এসেছে, একটা কিছু পাওয়ার আশায় এসেছে।'

বেটি চোখ কোঁচকাল। দৃষ্টিতে নীচতা। 'কথাগুলো কি আমাকে বলছ?'

'ঠিক তা নয়। কিন্তু বাস্তবে এটাই ঘটেছে ওর ক্ষেত্রে। তা ছাড়া আমার কাছে ওর কোনও ঋণ নেই। খচ্চরগুলো দেখো – কেমন চমৎকার উপহার।'

'খচ্চর! অথচ তুমি কিনা ইচ্ছা করলেই সমস্ত সোনা পেতে পারো?'

চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল ওর। এক ঝটকায় খুলে ফেলল হ্যাট। পরমুহূর্তে লক্ষ করলাম সামনে একটা টিলার ওপর থেকে দুটো উইনচেস্টারের নল আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পেছনে দ্রুত এগিয়ে আসছে ঘোড়ার পদশব্দ। আমি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতেই খপ করে ওটা চেপে ধরল বেটি।

'কই, এসো তোমরা। ওর মুখ খোলাও।'

আমার পিস্তলটা নিয়ে সরে গেল ও। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকালাম আমি। ওরা ঘিরে ফেলেছে। মনে মনে আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে, এখন আমি একটু সহযোগিতা করলেই কার্যকর করতে পারে সেটা।

ছয়জন ঘোড়সওয়ার। আমার উইনচেস্টার স্ক্যাবার্ডে তোলা। কোনও কাজেই আসছে না যখন, ওটা প্রেসকটে থাকলেও ক্ষতি ছিল না।

'নিয়ে যাও ওকে!' বেটির কালো চোখজোড়া ডাকিনীর মত জ্বলছে ধক্‌ধক্ করে। মনে হলো ও নিজেই আমাকে খুন করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। কেবল সোনার হদিস জানার অপেক্ষা।

বেশ উপলব্ধি করছি আমার সামনে রেহাই পাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই।

তেরো

বাথান থেকে বেরিয়ে আমি উত্তরে পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে রওনা হয়েছিলাম। অ্যারিযোনার মাইনগুলোতে বিক্রয়োপযোগী পণ্য এখনও আমার কেনা হয়নি। তাই ঠিক করেছিলাম পর্বতমালা পেরিয়ে স্যান ফ্র্যান্সিস্কো র‍্যাঞ্চে যাব। নিউহল নামে এক লোক শহর পত্তন করছে ওখানে। লোকের ধারণা স্যান ফ্র্যান্সিস্কোর দক্ষিণে যতগুলো ভাল হোটেল আছে তার মধ্যে ওখানকারটাই সেরা। রেলরাস্তা, স্টেজ রুট এগুলোও আছে শহরে।

শোনা যায়, লস এঞ্জেলেসের চেয়ে জিনিসপত্র অনেক সস্তা। মুদির নাম

ফিল্ডস্। লোকজনকে যেন মাল কিনতে সুদূর লস এঞ্জেলেসে যেতে না হয় সে-জন্যে আপ্রাণ খাটছে ও।

উত্তর-পশ্চিমে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর যখন পাহাড়ে ঢুকে সোজা উত্তরে রওনা দেব, ঠিক তখনই ওদের খপ্পরে পড়েছি আমি। সন্দেহ নেই, এভাবেই ফন্দি এঁটেছিল কৃষ্ণ-নয়না। আমি যদি বুড়োর সোনার কাছে যেতাম, ওরা অনুসরণ করত এবং আমার কাছ থেকে কেড়ে নিত ওটা। কিন্তু যেহেতু যাইনি, এখন জোর করে তথ্যটা আদায়ের চেষ্টা করবে।

যদি রাইফেল বের করতে চাই, স্ক্যাবার্ডে হাত পৌঁছুনোর আগেই মারা পড়ব। এতটুকু দয়া দেখাবে না ওরা।

আমাকে ক্ষুদ্র একটা উপত্যকায় বন্দী করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পোটরেরোর ঠিক ওপরেই আছে সেই গুপ্তধন।

ছোট্ট উপত্যকা। কিছু প্রাচীন ওক গাছ রয়েছে। ওগুলোরই একটার ছায়ায় থেমেছি আমরা। শান্ত ওম-জড়ানো বিকেল। গাছ-পালায় পাখির কাকলি কানে আসছে।

ধীরে ধীরে বৃত্তটা ছোট করে আনছে ওরা। আমার দুটো হাতই পমেলে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় খুঁজছি, কিন্তু মাথা কাজ করছে না।

'সে-রাতে বুড়োকে ও-ই নিয়ে গিয়েছিল,' বলল বেটি। 'কাজেই সোনাটা কোথায় আছে ও জানে।'

'আমাকে জায়গা চেনায়নি। ওকে বোকা পেয়েছ?'

সবাই চুপ করে রইল। একটুবাদে মুখ খুলল একজন। 'আচ্ছা,' বলল সে, 'আমরা মাথাটা একটু খাটালেই তো পারি। বেনের পক্ষে কতটা ক্রল করা সম্ভব? ওরা বেশি সময় পায়নি, ওইটুকুর মধ্যে যাওয়া এবং আসা দুটোই করতে হয়েছে। সুতরাং বেন যদি একাই গিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই বেশি দূরে যায়নি। বৃষ্টিও হয়নি এর মাঝে, সুতরাং খুঁজলে ট্র্যাক পাব আমরা।'

ভোঁতামুখো তার হাতের রাইফেলটা নাচাল। 'আমাদেরকে ওখানে নিয়ে যাবে তুমি। বুঝেছ?'

নেব? কী আর এমন হবে? ওই সোনা আমার না। ওটা পেয়ে গেলে ওদের কাছে আমার প্রয়োজন ফুরোবে। তখন আমাকে ছেড়ে দিলেও দিতে পারে...যদিও মেরে ফেলার আশঙ্কাই বেশি কারণ তা হলে আর আমার ভয়ে ওদেরকে সিঁটিয়ে থাকতে হবে না।

'যদ্দূর জানি ও সবটাই নিয়ে গেছে। নইলে তোমরা কি মনে করো এমন সুযোগ আমি ছেড়ে দিতাম?'

'ও যদি সবই নিয়ে থাকবে,' বলল বেটি, 'তা হলে আর তোমার ব্যাপারে মাথা ঘামাত না। জাহাজ থেকে সোনা বয়ে আনতে কয়েক রাত লেগেছিল ওদের। এক রাতে সেটা খালি করে ফেলা সম্ভব না।'

'সাথে খাবার নিতে হবে,' বললাম আমি। 'জায়গাটা বেশ দূর। আমি কিছুই

নেইনি। ভেবেছিলাম নিউহলের বাথান থেকে কিনব।'

'ভাঁওতা দিচ্ছে,' বলল বেটি। 'আমি খানিকটা পথ ট্র্যাক করেছিলাম ওদের।'

আবার ভাল করে জরিপ করলাম ওকে। এই কুহকিনী এমন কিছু জিনিস জানে একটা শহুরে মেয়ের পক্ষে যা বেমানান। বলছে আমাদের ট্র্যাক করেছিল, আমারও যেন মনে হলো কথাটা সত্যি। এবং সে-ক্ষেত্রে ও একজন দক্ষ ট্র্যাকার হলে আমি খুব অবাক হব না।

'কাছেই কোথাও হবে,' বলল ও। 'এ-পথে কয়েক মাইল পর্যন্ত আমি ট্র্যাক করেছিলাম। এর বেশি খুব একটা যেতে পারেনি।'

ওরা ঘিরে আছে আমাকে। নড়াচড়া করলেই মৃত্যু অনিবার্য। আর তা যদি নাও ঘটে, মারাত্মকভাবে আহত হব। অদূরে আমার খচ্চরের পাল আর বাড়তি ঘোড়াগুলো ঘাস খাচ্ছে।

'আমার ধারণা দু-এক মাইলের ভেতর কোথাও হবে,' বলল কুহকিনী। 'আমি সঙ্গে না থাকলে ও ঠিকই যেত।'

লম্বা, কঠিন চেহারার এক লোকের দিকে ঘুরল ও। 'ক্লাইমার, তুমি আর ইয়াকুই মিলে ওকে একটু দাওয়াই দাও। তা হলেই সব বেরিয়ে যাবে।'

ইয়াকুই লোকটাকে একটা চলমান ক্ষুদে পাহাড় বললে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না। চেহারায় মনে হয় দোআঁশলা। দেখলেই বোঝা যায়, তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে কীভাবে একজন লোককে মারতে হয় ও তা জানে। জনশ্রুতি, ইয়াকুইরা এ-ব্যাপারে অ্যাপাচিদের মতই দক্ষ।

দৌড়ে যে পালাব তারও উপায় নেই। গাছপালা সব ছড়ানো-ছিটানো, অদূরের টিলাটাও প্রায় খাড়া।

জীবনে বহুবার কোণঠাসা অবস্থায় পড়েছি, এবং একভাবে না একভাবে বেরিয়েও এসেছি সেগুলো থেকে। কেন জানি মনে হচ্ছে, এ-বারেও খুব সহজেই রক্ষা পেয়ে যাব। চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ দিন। পড়ন্ত রোদে পত্রপল্লবের ছায়া পড়েছে আশপাশের মাটিতে। আকাশে সাঁতার কাটছে কয়েক খণ্ড অলস মেঘ। হিংস্রতার লেশমাত্র নেই কাছেপিঠে...কেবল আমার দিকে তাক-করা রাইফেলের ওই নীরব বৃত্তটি চাঁদের কলঙ্কের মত বিরাজ করছে।

ঘটনাটা এ-রকম হওয়া উচিত হচ্ছে না, আপনমনে বললাম। এটা ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। কোলাহল, বন্দুকের গর্জন, লড়াই এইসব থাকা দরকার; রক্ত, বাতাসে বারুদের গন্ধ এগুলো চাই।

সে-সব কিছুই নেই, অথচ দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমার, পালানোর সমস্ত পথ বন্ধ।

'ঘোড়া থেকে নামো,' বলল ক্লাইমার। ও হাসছে, দেখলাম দুটো দাঁত নেই। 'আমরা এখন তোমার বাড় দেখব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইয়াকুইকে দেখাল। 'ওকে জীবন্ত লোকের ছাল ছাড়াতে

দেখেছি আমি। লোকটা কথা শুনছিল না...তারপর যখন শুনল, তখন দেরি হয়ে গেছে।'

ভাবছি ঝেড়ে দৌড় দিলে কেমন হয়, কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হবে না উপলব্ধি করে চিন্তাটা বাতিল করলাম। ওদের লক্ষ্য ফসকাবে না।

ঘোড়া থেকে নামলাম আমি। একটা বিশাল ওক গাছের কাছে আমাকে নিয়ে গেল ওরা। ঘাম দেখা দিয়েছে আমার কপালে, ভয় করছে ভীষণ, কিন্তু সেটা টের পেতে দিলাম না ওদের। দৃষ্টি সজাগ, প্রতিটা মুহূর্তে পালানোর রাস্তা খুঁজছি।

হঠাৎ মন স্থির করলাম। আমাকে যখন মেরেই ফেলবে ওরা তখন দু-এক মিনিট আগে-পরে হলে ক্ষতি কী? একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমাকে গাছের সাথে বাঁধতে দেব না। অন্তত জ্ঞানত নয়।

বাধা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। একবার যদি চকিতে ঘুরতে পারি, হয়তো একটা রাইফেল কেড়ে নিতে পারব, এবং তখন বিদায় নেওয়ার সময় ওদের একজনকেও নিয়ে যাব সঙ্গে।

'আরে,' বলল একজন, 'ওটা আবার কে?'

একজন ঘোড়সওয়ার, ধীর স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে আসছে। দীর্ঘ একহারা গড়ন, ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে স্যাডলে – এইদিকেই আসছে সে।

'হেল,' বলল আরেকজন, 'এ দেখছি নোয়েল ওসমান!'

'কাজ সারো,' তাড়া দিল বেটি। 'ও এলে আমাদের কী!'

সোজা আমাদের মাঝে এসে পড়ল ও। বেটির মুখ ঝামটা সত্ত্বেও সুবোধ বালকের মত দাঁড়িয়ে রইল সবাই, চোখ নোয়েলের ওপর।

'হাউডি, বয়েজ!' যা বোঝার একপলকেই বুঝে নিয়েছিল নোয়েল। বলল, 'তোমরাও বুঝি সোনা খুঁজছ, তা হলে দেখছি আমাকে ভাগ বসাতে হয়।'

'চুলোয় যাও!' রাগত সুরে বলল বেটি। 'কী হলো, ক্লাইমার, এখনও দাঁড়িয়ে রইলে হাঁদার মত!'

নোয়েল [illegible] আমার পানে তাকিয়ে, তারপর কোটের নীচ থেকে পিস্তল বের করে ছুঁড়ে দিল।

আমি হাত বাড়িয়ে লুফে নিলাম ওটা। দুটো পিস্তল ওদের দিকে তাক করলাম আমা[illegible]র এবং আমার।

ঘটনাটা ঘটেছে চোখের পলকে। ওরা হতভম্ব হয়ে গেল। নোয়েলের কাছ থেকে এইরকম কিছু আশা করেনি, ওকে নিজেদের একজন বলেই জানত। কিন্তু একটি সত্য ওরা ভুলে গিয়েছিল, পানির চেয়ে রক্ত ঘন: নোয়েলের দেহে ওসমান রক্ত বইছে।

মৃগী রোগীর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বেটি ওয়ারেন। এখন একটা কুগারের সঙ্গে লড়তে পারবে ও। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রথমে নোয়েল, তারপর আমার পানে তাকাল।

'ভাগো!' নোয়েল বলল ওদের। 'ও আমার ভাই। আমি থাকতে ওর হাত দিতে পারবে না।'

'যদি না যাই?' রুখে উঠল ক্লাইমার।

'আমরা মারা যাব,' বললাম আমি, 'কিন্তু তোমরাও অক্ষত থাকবে না। শুধু শুধু লড়ে কী লাভ বলো?'

'চলো হে,' বলে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল একজন; একটুবাদে অন্যরা অনুসরণ করল ওর পথ। কেবল বেটি ওয়ারেনকে রেখে গেল আমাদের জিম্মায়।

'নোয়েল,' আমি বললাম, 'আমি অ্যারিযোনায় যাচ্ছি। আমার একার পক্ষে এত কিছু সামলানো মুশকিল হবে।'

'আমি আসছি,' বলল নোয়েল।

বেটির দিকে তাকাল ও। 'অ্যাবিগেইল, আসবে তুমি?'

'তোমার ইয়ে করি!' বলে ঘোড়া নিয়ে চলে গেল বেটি।

আমি ভাবতেও পারিনি ভদ্রঘরের কোনও মেয়ে ওভাবে কথা বলতে পারে।

নোয়েল আর আমি রওনা হয়ে গেলাম স্যান ফ্র্যান্সিস্কো র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে। ফিল্ডসের দোকান থেকে মাল কিনব আমি। মাইল কয়েক যাওয়ার পর ওকে বললাম, 'নোয়েল, তখন বেটিকে তুমি অ্যাবিগেইল বলে ডাকলে কেন?'

অবাক চোখে তাকাল নোয়েল। 'কেন, তুমি জানো না? ও তো আমাদের ট্রেল্যনিদের মেয়ে?'

এতক্ষণে রহস্যের জট খুলল। বুঝলাম কেন সব ব্যাপারে ওকে চৌকশ বলে মনে হচ্ছিল আমার। আচ্ছা, ও-ই তা হলে অ্যাবিগেইল ট্রেল্যনি। কৈশোরে একবার এক অন্ধকার ঝোপের ভেতর আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। কিন্তু আমি ওর ডেঁপোমিকে প্রশ্রয় দেইনি। তাই আজ এত বছর পর সেই অপমানের শোধ তোলার চেষ্টা করছিল।

অদূরে দেখা যাচ্ছে স্যান ফ্র্যান্সিস্কো র‍্যাঞ্চ। হঠাৎ দমকা বাতাসে কতগুলো গাছের পাতা উড়ে এল। ড্রুসিলা প্রেসকটে অপেক্ষা করবে পড়িত মনে পড়ল আমার।

***